উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম (HBG)

জেনেরিক ইলেকটিভ কোর্স

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : নির্বাচিত পাঠ

NEC-BG-04

মডিউল : ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

প্রথম মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission & NEP-2020.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতক পাঠক্রম
জেনেরিক ইলেকটিভ কোর্স
আধুনিক বাংলা সাহিত্য : নির্বাচিত পাঠ
NEC-BG-04
মডিউল : ১, ২, ৩, ৪ Module : 1, 2, 3, 4

কোর কোর্স ৪ **Core Course : 4**	লেখক **Course Writer**	সম্পাদনা **Course Editor**
মডিউল : ১—Module : 1	ড. মৃদুল ঘোষ এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা কোচবিহার কলেজ	অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল : ২—Module : 2	ড. অসীম হালদার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ ঢোলা মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণ ২৪পরগনা	
মডিউল : ৩—Module : 3	ড. শিপ্রা দে এসোসিয়েট প্রফেসর, ব্যাংলা বিভাগ উইমেন ক্রীশ্চান কলেজ, কলিকাতা	
মডিউল : ৪—Module : 4	ড. দিব্যতনু দাশগুপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ হুগলী মহসিন কলেজ	

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি

ড. শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

বাণীমঞ্জরী দাস, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বেথুন কলেজ, কলিকাতা

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপিকা, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদরপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড. প্রতুলকুমার পণ্ডিত, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও
অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ
মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম
(HBG)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য : নির্বাচিত পাঠ
NEC-BG-04

মডিউল-১ : উপন্যাস : শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব)/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক-১ ❑ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য কীর্তি 9–19

একক-২ ❑ বাংলা উপন্যাস ও শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব) 20–29

একক-৩ ❑ শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের বিষয় ও শৈলী 30–51

একক-৪ ❑ শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব) : সামগ্রিক পর্যালোচনা 52–74

একক-৫ ❑ ছোটোগল্প : দেনাপাওনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 75–90

মডিউল-২ : নির্বাচিত কবিতা পাঠ

একক-৬ ❑ বঙ্গভূমির প্রতি : মধুসূদন দত্ত 93–102

একক-৭ ❑ ওরা কাজ করে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 103–112

একক-৮ ❑ বিদ্রোহী : নজরুল ইসলাম 113–126

একক-৯ ❑ আবার আসিব ফিরে : জীবনানন্দ দাশ 127–137

একক-১০ ❑ ফুল ফুটুক না ফুটুক : সুভাষ মুখোপাধ্যায় 138–146

একক-১১ ❑ যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো : শক্তি চট্টোপাধ্যায় 147–154

মডিউল-৩ : কালের যাত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক-১২ ❑ বাংলা নাটকের ধারায় রবীন্দ্রনাট্য 157–162

একক-১৩ ❑ রূপক সাংকেতিক নাটক ও রবীন্দ্রনাথ 163–166

একক-১৪ ❑ কালের যাত্রার বিষয়বস্তু ও চরিত্র 167–171

একক-১৫ ❑ নাটকের সংলাপ 172–178

মডিউল-৩ : বর্তমান ভারত—বিবেকানন্দ (নির্বাচিত অংশ)

একক-১৬ ❑ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 'বর্তমান ভারত' 181–202

একক-১৭ ❑ 'বর্তমান ভারত' : মূল পাঠ ও পর্যালোচনা 203–216

একক-১৮ ❑ গঠনশৈলী ও ভাষারীতি 217–224

জেনেরিক ইলেকটিভ কোর্স : ০৪

মডিউল : ১

উপন্যাস : শ্রীকান্ত : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক-১ ❑ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য কীর্তি

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ লেখক শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন

১.৪ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি

১.৫ শরৎ-উপন্যাসের বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে—

- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন।
- লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামগ্রিক রচনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা জন্মাবে তাঁদের।
- বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় জানা যাবে।
- ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাইজির মতো মানুষেরা যে বিংশ শতাব্দীর সমাজ প্রেক্ষাপটে কতখানি প্রাসঙ্গিক ছিল সেকথা লেখকের লেখনীতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। ইন্দ্রনাথের সাহসিকতা, শ্রীকান্তের মহৎ মানবপ্রেমী হৃদয়, রাজলক্ষ্মী, অন্নদা দিদির ত্যাগের মানসিকতায় লেখক কীভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় জানা সম্ভব হবে।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কথাসাহিত্যের দুই ধারার বৃহত্তর শাখা উপন্যাস। অপরটি ছোটগল্প। বাংলা সার্থক উপন্যাস রচিত হয়েছিল লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা উপন্যাসের ধারাকে বিবিধ বিষয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। আপামর বাঙালি পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন যে কথাশিল্পী, তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৫.০৯.১৮৭৬—১৬.০১.১৯৩৮)। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল পাঠক শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসের সঙ্গে মনের বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন। কারণ সমকালীন সমাজের নিম্ন-মধ্যবিত্ত, অন্ত্যজ মানুষদের জীবনের কথা

তিনি অকপটে বলেছিলেন। মাত্র ৬১ বছরের জীবৎকালে ত্রিশটি উপন্যাস, চারটি গল্পগ্রন্থ ও তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে রয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের এক সর্বজনপ্রিয় লেখকের জীবন এবং তাঁর সাহিত্যসম্ভারের বিশেষত্ব সম্পর্কে জেনে নেব। পাঠ্য 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের সৃজনপ্রতিভা, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বর্ণনা, আত্মজীবনের নানা ঘটনা কীভাবে আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসের গঠনকৌশল, ভাষাভঙ্গী, বিভিন্ন প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারব এই পাঠে।

১.৩ লেখক শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কাঁচড়াপাড়ার নিকট মামুদপুরে। দেবানন্দপুর ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর পিতার মাতুলালয়। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। তাঁর মাতা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরের রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। গঙ্গোপাধ্যায়রা পরবর্তীকালে ভাগলপুরে বাস করতে শুরু করেছিলেন। পাঁচ ভাই আর বোনের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর দুই ছোটভাই প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র। তাঁর বড় দিদি অনিলা দেবী ও ছোট বোন সুশীলা দেবী। অনিলা দেবী ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে সবার বড় এবং সুশীলা দেবী ছিলেন সবার ছোট। ছোটবেলায় শরৎচন্দ্রের ডাকনাম ছিল ন্যাঁড়া।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল এন্ট্রান্স পাস করে কিছুদিন এফ.এ. পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত ভবঘুরে, সংসার-বিরাগী, উদাসীন প্রকৃতির এবং সাহিত্যপিপাসু মানুষ। তাঁর অস্থিরমতির কারণে কোনো চাকরিতে বেশিদিন স্থায়ী হননি। পরিবারের অভাব অনটনের জন্য তিনি বেশির ভাগ সময় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তাই শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলায় অনেকগুলো বছর কেটেছিল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে। বাবা গল্প-উপন্যাস লিখতেন; কিন্তু ঐ অস্থিরচিত্তের জন্য কোনো লেখা সম্পূর্ণ করতেন না। শৈশব-কৈশোরে পিতার অসম্পূর্ণ রচনার খাতা পড়ে শরৎচন্দ্রের মনে সাহিত্য সৃজনের অঙ্কুর জন্মায়।

শৈশব থেকে দুরন্ত ও মেধাবী শরৎচন্দ্র পাঁচ বছর বয়সে দেবানন্দপুর গ্রামে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় দু-তিন বছর পড়েছিলেন। ভাগলপুরে এসে দাদুর ইচ্ছেতে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। ছাত্রবৃত্তি পাস করে তিনি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরের জেলা স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পিতার চাকরি চলে যাওয়ায় পুনরায় দেবানন্দপুরে ফিরে ১৮৮৯ সালে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে দশম শ্রেণি বা সেকালের ফার্স্ট ক্লাসে পড়ার সময় টাকার অভাবে পরীক্ষা দিতে

পারেননি। এরই মাঝে শরৎচন্দ্র পাঠশালার সহপাঠী কাশীনাথের বিষয়ে ‘কাশীনাথ’ নামে একটি গল্প লেখেন। এছাড়া ‘ব্রহ্মদৈত্য’ নামে আরও একটি গল্প লিখেছিলেন। দ্বিতীয়টি পাওয়া যায়নি। এরপর আবার ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্রের মামার বন্ধু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। সেই স্কুল থেকে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু টাকার অভাবে প্রথমে কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। শেষপর্যন্ত শরৎচন্দ্রের ছোট দাদু অঘোরনাথের দুই ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথকে বাড়িতে পড়িয়ে মাস মাইনের টাকায় কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। বহু কষ্টে দু’বছর পড়াশুনা করে কুড়ি টাকা পরীক্ষার ফি জোগাড় করতে না পেরে এফ.এ. পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ১৮৯৫ এ মায়ের মৃত্যুর পর বাবাকে মাতুলালয় ছেড়ে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লিতে বাস করতে হয়েছিল। তখন শরৎচন্দ্র কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরের আদমপুর ক্লাবে অভিনয় ও খেলাধূলা করে সময় কাটাতে থাকেন। সেখানে রাজেন মজুমদার নামে এক পরোপকারী, নির্ভীক, মহাপ্রাণ, আদর্শবান যুবকের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি পরহিতব্রতে আগ্রহী হয়েছিলেন। (‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে শরৎচন্দ্র একেই ইন্দ্রনাথরূপে চিত্রিত করেছেন।)

ভাগলপুরে পড়বার সময়ে বিভূতিভূষণ ভট্টের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। বিভূতিভূষণের পিতা ছিলেন ভাগলপুর কোর্টে সাব-জজ। সাহিত্যপ্রীতির কারণে তাঁদের বাড়িতে নিয়মিত ‘ভারতী’ পত্রিকা ও গল্প-উপন্যাসের বই কেনা হত। শরৎচন্দ্র সেগুলি অনায়াসে পড়তে পারতেন এবং লিখতেন। এই সময় মামা সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ (দাদুর তৃতীয় ভাইয়ের ছেলে), এঁদের বন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার এবং বিভূতিভূষণের ছোট বোন নিরুপমা দেবী সহ অনেকে মিলে একটি সাহিত্যসভা গঠন করেছিলেন। সপ্তাহে একদিন করে সাহিত্যসভার অধিবেশন হত। সেদিন সভার সভ্যরা নিজেদের লেখা পড়তেন। সাহিত্যসভার হাতে-লেখা মুখপত্রের নাম ছিল ‘ছায়া’। শরৎচন্দ্র এই সময়ে ‘বড়দিদি’, ‘দেবদাস’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘শুভদা’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং ‘অনুপমার প্রেম’, ‘আলো ও ছায়া’, ‘বোঝা’, ‘হরিচরণ’ প্রভৃতি গল্পগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের পিতার বদলির কারণে সাহিত্যের আড্ডা ভেঙে যায় এবং হাতে-লেখা মুখপত্রটি বন্ধ হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্র তখন বনেলী রাজ এস্টেটের চাকরি করছিলেন। একদিন পিতার উপর অভিমান করে সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। মজঃফরপুরে থাকার সময় পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভাগলপুরে আসেন। পিতৃশ্রাদ্ধ শেষে ছোট ভাইবোনদের মামার কাছে রেখে ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতায় আসেন। সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের উকিল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে থাকা ও ৩০ টাকা বেতনে হিন্দী পেপার বুকের ইংরাজী তর্জমা করার চাকরি পান। মাস ছয়েক থাকবার পর জানুয়ারি ১৯০৩ নাগাদ বর্মায় চলে যান। বর্মায় গিয়ে লালমোহনবাবুর ভগ্নীপতি রেঙ্গুনের অ্যাডভোকেট অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ওঠেন। রেঙ্গুন যাওয়ার দু-একদিন আগে সুরেন মামা ও গিরীন মামার অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেনামিতে ‘মন্দির’ গল্প লিখে কুন্তলীন পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় পাঠিয়েছিলেন। দেড়শ গল্পের মধ্যে ‘মন্দির’ সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিল। ১৯০৩ সালে এই গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার পেলেন। ব্রহ্মদেশে

বসবাসের সময় তিনি কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতেন ও সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকতেন। সমালোচক দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রের আগমন আকস্মিক কিন্তু বিজয়ীর বেশে। শুধু সাহিত্যসেবার দ্বারা জীবনে যশ ও অর্থ তিনিই প্রথম লাভ করেন একথা তিনি ঘোষণা করে গেছেন।'

অঘোরনাথ তাকে বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে ৭৫ টাকা মাইনের অস্থায়ী কেরানির চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। দু'বছর পর তার চাকরি চলে যায়। তখন বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে পেগু চলে যান। সেখানে অবিনাশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসবাস করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বর্মার পাবলিক ওয়ার্কস অ্যাকাউন্টস অফিসের ডেপুটি একজামিনার মণীন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে এই অফিসে চাকরি পান। পরবর্তী দশ বছর এই চাকরি করেছিলেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে শরৎচন্দ্র দুরারোগ্য পা ফোলা ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তখন ঊর্ধতন সাহেবের কাছে চিকিৎসার জন্য ছুটি চাইতে গেলে বচসার কারণে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রেঙ্গুন ছেড়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে প্রায় দশ বছর তিনি হাওড়ার শিবপুরে বাস করতেন। এরপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া শহর ছেড়ে নিজের সামতাবেড়ের বাড়িতে চলে যান। রূপনারায়ণের কোলে এই বাড়িটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় স্থান। এখানে বসে তিনি বহু মানুষের সেবা করেছিলেন।

রেঙ্গুনে বসবাসের সময় বোটাটং পোজনডং অঞ্চলে কারখানার মিস্ত্রিদের পল্লিতে তিনি বাস করতেন। তার বাসার নিচে শান্তি দেবী নামে এক ব্রাহ্মণ মিস্ত্রির কন্যা বসবাস করতেন। তার পিতা এক মদ্যপ পাত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে ঠিক করেন। শান্তি দেবী শরৎচন্দ্রকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে অনুরোধ জানালে শরৎচন্দ্র তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। কিন্তু প্লেগের আক্রমণে মাত্র দুদিনের রোগ-ভোগে পত্নী ও এক বছরের পুত্রের মৃত্যু হয়। এরপর রেঙ্গুনে কৃষ্ণদাস অধিকারী নামে এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তির অনুরোধে তার ১৪ বছরের কন্যা মোক্ষদাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তিনি মোক্ষদার নাম রেখেছিলেন হিরণ্ময়ী। হিরণ্ময়ী দেবী নিঃসন্তান ছিলেন। হিরণ্ময়ী দেবী ছেলেবেলা থেকেই শান্তস্বভাবা, সেবাপরায়ন ও ধর্মশীলা ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখ শান্তিতে কাটিয়ে গেছেন।

রেঙ্গুনে থাকার সময় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র একবার অফিসে এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। এই সময় মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয় হয়। ফণীবাবু শরৎচন্দ্রকে তাঁর কাগজে লেখা পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে গিয়ে 'রামের সুমতি' গল্পটি পাঠিয়ে দেন। গল্পটি 'যমুনা' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্প লিখে শরৎচন্দ্র একজন শক্তিশালী লেখক হিসাবে সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে পরিচিত হন। এর পূর্বে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়েছিল। অনেকের মত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই লেখা পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র 'যমুনা'র সঙ্গে 'ভারতবর্ষ'-এও সঙ্গে ভারতবর্ষেও লিখতে আরম্ভ করেন। একসময় 'যমুনা' ছেড়ে কেবল 'ভারতবর্ষ' লিখতে থাকেন এবং 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মালিক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স তাঁর বই প্রকাশ শুরু করেন।

মোট চোদ্দ বছর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে কাটিয়েছিলেন। রেঙ্গুন থেকে ফেরার পর তিনি নানা প্রগতিশীল কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একদিকে লেখনি চালনা অন্যদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সান্নিধ্যে এসে ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বালিগঞ্জে ২৪ অশ্বিনী দত্ত রোডে একটি বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকতেন। হাওড়ার বাজে শিবপুরে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ এবং পরে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি স্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দেওঘরে তিন চার মাস কাটিয়ে কলকাতা ফিরে এলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় তার যকৃতের ক্যান্সার ধরা পড়ে, যা তার পাকস্থলী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। ডা. বিধানচন্দ্র রায়, কুমুদশঙ্কর রায় প্রমুখ চিকিৎসকরা তাঁকে অস্ত্রোপচারের পক্ষে মত দেন। তৎকালীন সময়ের বিখ্যাত সার্জন ললিতমোহন বন্দোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পেটে অপারেশন করেছিলেন। ১২ জানুয়ারী শরৎচন্দ্রের অপারেশনের পর মাত্র চারদিন বেঁচে ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় পার্ক নার্সিং হোমে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি॥'

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন 'যিনি বাঙালির জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি'।

১.৪ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি

লেখক শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির অনুরাগের কথায় ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, 'বাল্যকাল হইতে যৌবনারম্ভ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র যে সাংসারিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহা যৌবনারম্ভেই কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ তাঁহার মর্মমূল হইতে উৎসারিত বলিয়া শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল।' একথার যথার্থ সত্যতা ধরা পড়েছে জীবনের প্রায় শেষ লগ্ন পর্যন্ত সৃজনকর্মে মেতে থাকার মধ্যে। একষট্টি বছর চার মাসের জীবৎকালে কথাসাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করে শরৎচন্দ্র খ্যাতির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের আবেদন সমাজের স্বাভাবিক ও সাধারণ মানুষের কাছে।

১৩১৯-২০ সালে 'যমুনা' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের আট-ন'টি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তিনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' (১৯১৩) এবং তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাস' (১৯৩৫)। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল 'শুভদা' (১৯৩৮), 'শেষ পরিচয়' (১৯৩৯)। প্রায় ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্ভারগুলি নিম্নরূপ :

ক) উপন্যাস :—

১. 'বড়দিদি'—১৯১৩
২. 'বিরাজ বৌ'—১৯১৪
৩. 'পরিণীতা'—১৯১৪
৪. 'পণ্ডিতমশাই'—১৯১৪
৫. 'পল্লীসমাজ'—১৯১৬
৬. 'চন্দ্রনাথ'—১৯১৬
৭. বৈকুণ্ঠের উইল'—১৯১৬
৮. 'অরক্ষণীয়া'—১৯১৬
৯. 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব—১৯১৭
১০. 'দেবদাস'—১৯১৭
১১. 'নিষ্কৃতি'—১৯১৭
১২. 'কাশীনাথ'—১৯১৭
১৩. 'চরিত্রহীন'—১৯১৭
১৪. 'দত্তা'—১৯১৮
১৫. 'স্বামী'—১৯১৮
১৬. 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব—১৯১৮
১৭. 'ছবি'—১৯২০
১৮. 'গৃহদাহ'—১৯২০
১৯. 'বামুনের মেয়ে'—১৯২০
২০. 'দেনাপাওনা'—১৯২৩
২১. 'নববিধান'—১৯২৪

২২. 'পথের দাবী'—১৯২৬

২৩. 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব—১৯২৭

২৪. 'শেষ প্রশ্ন'—১৯৩১

২৫. 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্ব—১৯৩৩

২৬. 'বিপ্রদাস'—১৯৩৫

২৭. 'শুভদা'—১৯৩৮

২৮. 'শেষের পরিচয়' (অসমাপ্ত)—১৯৩৯

খ) শরৎচন্দ্রের গল্পগ্রন্থ গুলি হল :—

১. 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প'—১৯১৪

২. 'মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প'—১৯১৬

৩. 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ'—১৯৩৪

৪. 'ছেলেবেলার গল্প'—১৯৩৮

এই গল্পগ্রন্থের কতগুলি উল্লেখযোগ্য গল্প হল: 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ', 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'কাশীনাথ', 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্য-স্মৃতি', 'হরিচরণ', 'ছবি', 'বিলাসী', 'মামলার ফল', 'হরিলক্ষ্মী', 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গ', 'অনুরাধা', 'সতী', 'পরেশ', 'লালু', 'ছেলেধরা', 'বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনি', 'লালু', 'দেওঘরের স্মৃতি' ইত্যাদি।

গ) প্রবন্ধগ্রন্থ :—

১. 'নারীর মূল্য'—১৯২৪ (দিদি অনিলা দেবী ছদ্মনামে প্রকাশিত)

২. 'তরুণের বিদ্রোহ'—১৯২৯

৩. 'স্বদেশ ও সাহিত্য'—১৯৩২

ঘ) উপন্যাসের নাট্যরূপ :—

১. 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী'—১৯২৮

২. 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রমা'—১৯২৮

৩. 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিরাজ বৌ'—১৯৩৪

৪. 'দত্তা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিজয়া'—১৯৩৪

এছাড়াও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বেশ কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়।

১.৫ শরৎ-উপন্যাসের বিশেষত্ব ও অভিনবত্ব

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের অভূতপূর্ব বিকাশ, পরিবর্তন ও রূপান্তর লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে এই ধারার সার্থক সূচনা ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারের গল্প-উপন্যাসে বাঙালি পাঠক তখন সন্তুষ্ট। সেই সময়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে পা রেখেছিলেন। তখন সাহিত্যে ইংরেজি চর্চার জোয়ার এলেও শরৎচন্দ্র মাতৃভাষা বাংলাতে সাহিত্যচর্চায় অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁর লেখা মাত্র কয়েকটি গল্প পাঠ করে বাঙালি পাঠকেরা লেখকের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সমকালীন সমাজ ও নর-নারীর প্রতি ছিলেন অন্তর থেকে সহানুভূতিশীল। গভীর মমত্ববোধের দ্বারা সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের শৈশব কৈশোর ছিল নানা ঘাত প্রতিঘাতে ভরা। হুগলীর দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুর ও রেঙ্গুনে বহু বিচিত্র মানুষদের দেখে তিনি জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। রক্ষণশীল পারিবারিক জীবন, নিঃসঙ্গ পথিক জীবন, সন্ন্যাস-জীবন, দারিদ্র্য- লাঞ্ছিত নিম্নস্তরের জীবন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন ও দেশনেতা রূপে সমাজের উচ্চবিত্তের জীবন তিনি অনায়াসে পার করে এসেছেন। সমাজ সচেতন সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি জনসাধারণের বিচিত্ররূপ আপন মনে দেখেছিলেন। সমাজের সব সমস্যা শরৎচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করেছিল বলে সুগভীর পর্যবেক্ষকের মতো তিনি সেসব আপন সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমের মতো বিচারকের দৃষ্টিতে নয়, তিনি জীবনকে দেখেছিলেন সমালোচকের দৃষ্টিতে। একারণে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার রূপকার তিনি।

শরৎচন্দ্রের ৫৭ তম জন্মোৎসবে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কলকাতার টাউন হলে কথাশিল্পীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। তারই প্রতিভাষণে তিনি পাঠ করেছিলেন,—'সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কোন হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।' তার কথাসাহিত্যের কাহিনি, বিষয় ও চরিত্রদের মধ্যে আমরা এই কথার প্রতিধ্বনি সর্বদা শুনতে পাই।

বাংলা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তার কারণেই তিনি 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' নামে খ্যাত। তাঁর সাহিত্যের মূল বক্তব্য হল নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত অথচ হৃদয়বান মানুষের ভেতরের কথা প্রকাশ করা। রবীন্দ্র-সমকালে বসেও তিনি আপন জ্যোতিতে উজ্জ্বল। তিনি সমাজের বিভিন্ন ক্ষত উন্মোচন করেছেন, কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানীর মতো তার প্রতিকারের পথনির্দেশ করেননি। কারণ সেই কাজ সমাজসেবীর—শিল্পীর নয়। শরৎসাহিত্যের বিশিষ্টতার কথায় ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'Encyclopedia of World

Literature' গ্রন্থে লিখেছেন, 'This sympathies for the und!erog and his plain speaking– endeared him to his readers. Sharatchandra had laid open the stores but he has no solution to offer the betterment of the society he pictured with fidelity. একথা যথার্থ যে, শরৎচন্দ্র সমস্ত রচনাতে সমাজের আসল মানুষের ছবি অকপটে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শরৎচন্দ্র মরমী কথাশিল্পী, বাঙালি জীবনের ব্যথা-বেদনার রূপকার। তিনি দেখিয়েছেন গ্রামীণ সমাজের সর্বংসহা নারীর তিলে তিলে অপমৃত্যু; প্রচলিত হৃদয়হীন প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে মানুষের চিরন্তন হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব। নারীর মধ্যে তিনি দেখেছেন কোমল হৃদয়ের অনুভূতি, প্রেম, বাৎসল্য ও স্নেহ। পুরুষের মধ্যে তিনি দেখেছেন বৈরাগ্য ও ত্যাগের ধূসরতা কিংবা আদর্শবাদী সত্তাকে। বলা চলে তাঁর সাহিত্যের মূল সুর নিবিড় মানবপ্রেম। অপরিসীম মমতায় তিনি তাই দেখাতে পেরেছেন শ্রীকান্তের মতো প্রেমিককে, যিনি সামাজিক সংস্কারের কারণে সারাজীবন রাজলক্ষ্মীর মুখাপেক্ষী হয়েও তাকে কাছে পায়নি। বিরহী দেবদাস লোকাচারের ভয়ে পার্বতীর কাছে থেকে দূরে সরে থেকেছে। বৈধব্যের দহনে বড়দিদি মাধবীর প্রেম পরিণতি পায়নি। পল্লীসমাজের নীচ সংস্কারের কারণে রমা ও রমেশের ঘটেছে চির বিচ্ছেদ। বামুনের মেয়ে সন্ধ্যা পিতার হাত ধরে নতমুখে জন্মভূমি ছেড়েছে। 'অরক্ষণীয়া'র জ্ঞানদা দারিদ্র্য বঞ্চনায় চোখের জল ফেলেছে। এরকম নারীদের বেদনার পাশে বিদ্রোহিণী, শক্তিময়ী নারী চরিত্রও এঁকেছেন। যেমন—'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের অভয়া, 'পথের দাবী'র সুমিত্রা, 'শেষ প্রশ্ন-র কমল, 'দেনাপাওনা'র যোড়শী প্রমুখ।

শরৎচন্দ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। তাঁর সাহিত্যের মূল সুর নিবিড় মানবপ্রেম। কিন্তু তাঁর কথাসাহিত্যের শিল্পকৌশল বা আর্ট সর্বজনগ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই শরৎসৃষ্টি প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন, 'বিষয়টা স্থানিক হতে পারে কিন্তু আদর্শটা সার্বভৌমিক। যে জিনিসের আধারটি বিশেষ একটি স্থানের সেই জিনিসের আদর্শটা যদি সর্বজনের হয় তবেই বিশ্বসাহিত্যে সেটি টিকে গেল।' একারণে শরৎচন্দ্রের বাঙালি সমাজকেন্দ্রিক গল্পগুলি দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছিল। বিশ্ব পরিবারের মনের খোরাক হয়ে উঠেছিল তাঁর রচিত গল্প উপন্যাসগুলি। সাহিত্যের নিত্য সত্য তথা শিল্পরূপের সর্বজনীনতা তাঁর সাহিত্যে দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে গিয়েছিল। তিনি বাংলা উপন্যাস ছোটগল্পে যে জীবন-বিশ্বস্ততার ছবি এঁকেছেন তা বাঙালি জীবনের প্রামাণ্য দলিল।

শরৎ-সাহিত্যে প্রথম সাধারণ মানুষ এসেছিল তাদের সজীব মুখশ্রী ও দরদ-মাখানো হৃদয় নিয়ে। উপন্যাস যদি মানব জীবনের মহাকাব্য হয়, তাহলে শরৎ-প্রতিভা অনায়াসে সেই মহাকাব্য রচনা করেছে। আমাদের আবহমান জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে বিদ্যুৎ ঝলকে উদ্ভাসিত করেছে। মানুষের বাইরের সত্তার চেয়ে ভেতরের চিরন্তন মানবাত্মার প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্রেরা শরৎ-সাহিত্যের মান বৃদ্ধি করেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকদ্যুতি এবং নির্যাতিত মানবাত্মার প্রতি সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসকে নবরূপ দান করেছিলেন। চরিত্র সৃষ্টি, প্লট নির্মাণ, ঘটনা সংস্থাপন ও প্রকাশভঙ্গীতে অভিনবত্ব এনেছিলেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে তিনি অসাধারণ প্রতিভায় চিরায়ত ফসলে পরিণত করেছিলেন। এককথায় বলা চলে, সাহিত্যজগতে সব দিক থেকে তিনি অতুলনীয়। প্রখ্যাত সমালোচক লিখেছেন, "নিষিদ্ধ সমাজ বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে সামাজিক রীতিনীতি ও চিরায়ত সংস্কারগুলির তীক্ষ্ণ তীব্র সমালোচনায়, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাহাতে তিনি বাঙালির মনের সংকীর্ণ গণ্ডী বহুদূর ছাড়াইয়া অতি আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন।' বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—

- দেশপ্রেম এবং অবহেলিত জনগণের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ।
- বাঙালির দুঃখ-দারিদ্র্য ও মর্মবেদনাকে তিনি মূর্ত করে তুলেছেন চোখের জলে, প্রেমের মাধুর্যে এবং জীবনদর্শনের গভীরতায়।
- তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি কখনো কখনো তিনি সামাজিক মূঢ়তা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, দেশপ্রেমের নামে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।
- পল্লিবাংলায় দারিদ্র ও কুসংস্কারের ফাঁসিকাঠে-বলি-হওয়া বাঙালিজীবনের ছবি আঁকাই শরৎ-উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।
- নারীমনের জটিলতা, তাদের সংস্কার ও প্রেমের দ্বন্দ্ব, যৌথ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনচিত্র এবং সেখানে নারীদের স্থান ইত্যাদি নানা চোখের-জলে-ভেজা বাস্তবসম্মত কাহিনি-রূপায়ণে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র নিঃসন্দেহে এক অদ্বিতীয় কথাশিল্পী।
- গল্প বলার সহজ-সরল অথচ চিত্তাকর্ষক রীতির জন্য তিনি প্রথমাবধি অভিজাত পরিবার থেকে শুরু করে গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারে সমাদর লাভ করেছেন।
- পরিশেষে বলা যায়, অভিজ্ঞতার গভীর ও বিপুল বিস্তারে, প্রখর পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে, সংস্কারমুক্ত মন ও মননে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে, আবেগের উচ্ছ্বাসে এবং সংবেদনশীলতায় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসের জগতে অমর হয়ে আছেন।

সবশেষে সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহমত হয়ে বলি, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের যে-পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র সেই পথ সমৃদ্ধিতে নতুন ধারায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বাংলার সমাজের কঠিন অনুর্বর মাটিতে নতুন রসের সুধা বইয়ে উপন্যাসের গতিপথ প্রশস্ত করেছিলেন। নারী চরিত্রের জড়তা ঘুচিয়ে তার ভেতরকার তেজস্বী রূপের সন্ধান দিয়েছিলেন। সমাজবৈষম্য দূর করে

স্বাধীন চিন্তার পথ খুলে দিয়েছিলেন। প্রেমের বহুমুখী বিশ্লেষণ করে প্রেমের রহস্যময় গতি-প্রকৃতির উপর নতুন আলোকসম্পাত করেছিলেন। ভবিষ্যৎ উপন্যাস সাহিত্যের গতি নিয়ামক হিসেবে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের চিরকল্যাণকর মূর্তি নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। আপামর পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তি ও আনন্দ-অমৃত আস্বাদনে শরৎ-প্রতিভা তাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একক-২ ❑ বাংলা উপন্যাস ও শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব)

২.১ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ

২.২ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

২.৩ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের কিছু তথ্য

২.৪ 'শ্রীকান্ত' চার পর্বের সংক্ষিপ্ত কথা

২.৫ শরৎ সাহিত্যে শ্রীকান্তের স্থান

২.১ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি সম্ভারে 'শ্রীকান্ত' নানা দিক দিয়ে একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। অনেকাংশে আত্মজীবনীমূলক এই উপন্যাসের কাহিনিতে শরৎ প্রতিভার যথার্থ রূপ ধরা পড়েছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্ব ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্যন্ত তেরোটি সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে তেরোটি সংখ্যায় প্রকাশিত কাহিনি নিয়ে 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৩ এর মাঘ মাসে (১২ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭)। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনি'। লেখকের নাম ছিল শ্রীকান্ত শর্মা। প্রথম দুটি সংখ্যার পর চৈত্র সংখ্যা থেকে লেখকের নাম দেওয়া হয়েছিল 'শ্রী শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'। এর পর থেকে 'শরৎচন্দ্র' নামটি লেখা হতে থাকে। ১৩২২ মাঘ থেকে ১৩২৩ এর মাঘ পর্যন্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনি' গ্রন্থাকারে 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) নামে মুদ্রিত হয়েছিল।

'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনি' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময়ে বাঙালি পাঠক সমাজে গভীর আলোড়ন ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। শরৎচন্দ্রের জীবনকাহিনিতে আমারা দেখেছি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুরের জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে খানিকটা ভবঘুরের মতো জীবন কাটাতে শুরু করেছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর পাড়ার ক্লাবে নাচ, গান, অভিনয়, খেলাধূলা ও যাত্রাপালার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাতেন। সেসময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রাজেন মজুমদার নামে এক পরোপকারী, নির্ভীক, মহাপ্রাণ, আদর্শবান যুবকের। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন ও পেগুতে মিস্ত্রি পল্লিতে বাস করতেন। পশ্চিমবাংলা, ভাগলপুর, মুজফফরপুর ও বর্মায় বসবাসের সময় যে সব মানুষদের তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাদের কথা নিয়ে রচিত হয়েছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম পর্বে ভাগলপুরের রাজেন মজুমদারকে ইন্দ্রনাথ হিসেবে অঙ্কন করেছেন।

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) প্রকাশের পর থেকে বাঙালি পাঠকসমাজ চরিত্রটিকে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল। পাঠকের দাবিতেই শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় পর্ব লিখেছিলেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'ভারতবর্ষ'-য় প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ সালে 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

এর প্রায় দশ বছর বাদে ১৯২৭ সালে 'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব) প্রকাশিত হল। এই পর্বের কাহিনিও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল।

'শ্রীকান্ত' (চতুর্থ পর্ব) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন- চৈত্র থেকে ১৩৩৯ এর বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তৃতীয় পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশের ছয় বছর বাদে ১৯৩৩ সালে 'শ্রীকান্ত' (চতুর্থ পর্ব) গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল।

২.২ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

কালের গতির সঙ্গে সাহিত্যের গতি পরিবর্তিত হয় প্রতিনিয়ত। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রস আস্বাদনের বিষয় ও পদ্ধতিতে আসে পরিবর্তন। শরৎচন্দ্র বিষয় নির্বাচন ও সৃজনী প্রতিভায় পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন। সাধারণত গল্প উপন্যাসের লেখকেরা সমকালের সমাজ ও মানুষদের আশ্রয় করে কাহিনি রচনা করেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সময়ের ব্যবধান অনেক। তিনি মোগল যুগের ইতিহাস থেকে আধুনিক নরনারীর মনস্তাত্ত্বিকতার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। শরৎচন্দ্রের প্রায় সব গল্প-উপন্যাস সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত। বিভিন্ন কাহিনির মধ্যে তিনি সমকালের নানা অসঙ্গতি, কদাচার, সামাজিক প্রথার নিষ্ঠুরতা, নীচতা, কুসংস্কার প্রভৃতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস সমাজকে স্পষ্ট ও তীব্রভাবে আঘাত করে সময়ের ছবি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

শরৎ সাহিত্যের সৃষ্টিকাল ১৯০৮ থেকে ১৯৩৮ এর মধ্যে বিস্তৃত। এই সময় আমাদের জাতীয় জীবন প্রবল আলোড়ন ও সংঘর্ষে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। ইংরেজ বিরোধী মনোভাব, সামন্ততান্ত্রিকতার অনুশাসনে ব্যাধিগ্রস্ত নাগরিক মানুষেরা তখনও বেঁচে ছিল। গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কারণে তাদের দুঃখ বিড়ম্বিত জীবনের ছবি এঁকেছেন তিনি। সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের আসরে কোনো mass writer-এর আবির্ভাব ঘটেনি। সমকালের গ্রামীণ সমাজজীবনের বাস্তবতা তিনি বাঙালি পাঠকের কাছে সার্থকভাবে উন্মোচিত করতে পেরেছিলেন।

আলোচ্য 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের প্রকাশকাল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব যথাক্রমে ১৯১৮, ১৯২৭ ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির প্রায় দুই দশক সময়কাল ধরে আলোচ্য উপন্যাসের চারটি পর্ব রচনা করেছিলেন। সমালোচকেরা 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে

বলেছেন তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীকান্তের বয়স উপন্যাসের প্রথম পর্বে ছিল পনের বছর। চতুর্থ পর্বে তার বয়স হয়েছে বত্রিশ বছর। শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব) রচনার সময় লেখক শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং চতুর্থ পর্ব রচনার সময় হয়েছিল সাতান্ন। লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে শ্রীকান্তের অনেক মিল থাকলেও সময়ের ব্যবধান অনেক। চার খণ্ডে বিধৃত বইটিতে ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও কল্পনার উজ্জ্বল খণ্ডচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন শরৎচন্দ্র।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগের সমাজে সনাতন ধর্মের ভেতরে জাত-পাতের বিষ নিহিত ছিল। সেই অন্ধকার কালে উপন্যাসের চরিত্রের বয়ানে জাত ও ধর্মের ঊর্ধ্বে চিরন্তন মানবিক বাক্য প্রকাশ করা ছিল দুঃসাহসের পরিচায়ক। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চরিত্রের ভেতর দিয়ে একজন বাঙালির বিশ্বদর্শনের দুর্লভ সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। উপন্যাসটি একশ বছর আগেকার বাঙালি জীবনযাত্রার এক আশ্চর্য দলিল।

চারটি খণ্ডে প্রকাশিত এই উপন্যাসে অনেক চরিত্র, উপ-চরিত্র, উপ-আখ্যান তিনি তৈরি করেছেন। এর মধ্যে ইন্দ্রনাথ, পিয়ারী বা রাজলক্ষ্মী, অভয়া, গহর, কুমার সাহেব, টগর, রতন, বঙ্কু, কমললতা, ব্রজানন্দ, পুঁটি, নবীন, নন্দ মিস্ত্রি গোটা উপন্যাসে একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি চরিত্র বাঙালি পাঠককে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে, এখনও সমানভাবে করছে। ভবিষ্যতেও করবে। একটা উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র, আখ্যান একশ বছর পরেও পাঠককে যখন আকর্ষণ করে, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শরৎচন্দ্র কতখানি দক্ষ শিল্পী ছিলেন। আলোচ্য উপন্যাসে সময়ের নিখুঁত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক একই পর্বে বহু বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশে লেখা শেষ গ্রন্থ। কারণ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিল তিনি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশে থাকার সময় রচিত 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লীসমাজ', 'মেজদিদি', 'চরিত্রহীন'-এর মতো 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আমরা সমাজ-ভাবনা ও প্রতিবাদী চরিত্রদের খুঁজে পাই। বাংলাদেশে বসবাসের সময়ে লেখক একইভাবে নিজের চিন্তা-চেতনা ও সমাজ বর্ণনার ধারা অব্যহত রেখেছেন। শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের বারোটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা থেকে আমরা বিচিত্র সময়ের ছবি খুঁজে পাই।

২.৩ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের কিছু তথ্য

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) আত্মজীবনীমূলক রীতিতে রচিত। লেখক এখানে সহজ সরল ঘরোয়া ভঙ্গীতে কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কাহিনি পাঠ করতে গিয়ে মনে হয়, লেখক বুঝি নিজের-জীবনে-ঘটে-যাওয়া ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। উপন্যাসের প্রথমদিকে রয়েছে শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদির কাহিনি। দ্বিতীয়ার্ধে রয়েছে শ্রীকান্ত ও পিয়ারী বাইজী তথা রাজলক্ষ্মীর প্রেমের কাহিনি।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে মোট বারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত শ্রীকান্তের বাল্য ও কিশোর বয়সের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে ফুটবল খেলার মাঠে বিপরীত পক্ষের হাতে শ্রীকান্তের মার খাওয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। এখানেই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। আমরা জানতে পেরেছি শ্রীনাথ বহুরূপীর বিচিত্র কার্যকলাপ। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে জেলেদের নৌকা থেকে মাছ চুরির কথা। অন্নদাদিদি ও শাহজীর কাহিনি এখানে অন্য মাত্রা পেয়েছে। মেজদার শাসন, নতুনদার কাহিনি, ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির নিরুদ্দেশ যাত্রার কথায় এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে 'শ্রীকান্ত'র কিশোর জীবনের ইতি টানা হয়েছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে আমরা পূর্ণবয়স্ক যুবক শ্রীকান্তকে দেখতে পাই। কোন বিশেষ পরিস্থিতির কারণে লেখাপড়া ও পিসির বাড়ি তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল তার বিশদ বর্ণনা কাহিনিতে নেই। অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের নিজের বিবৃতিতে জানা যায় যে, সে লেখাপড়া ছেড়ে দেবার পর ভবঘুরের মতো নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে। নানা অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তার দিন কেটে যাচ্ছে। প্রায় সব ধরনের নেশায়-আসক্ত শ্রীকান্ত তখন রাইফেল বন্দুকে হাত পাকিয়েছে। সব্যসাচীর মতো জীবনের সুখের আশা বর্জন করে এক বোহেমিয়ান বাউণ্ডুলের জীবন বেছে নিয়েছিল।

অষ্টম হতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ মূলত শ্রীকান্তের যৌবন বয়সের কাহিনি। তারুণ্যের উন্মাদনায় সে তখন টগবগ করে ফুটছে। এই অংশে রয়েছে কুমার সাহেবের তাঁবুতে পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে দেখা হবার কথা। মহাশ্মশানের অভিযান, পিয়ারীর বিদায়ের পর সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ ইত্যাদি। রামবাবু ও গৌরী তেওয়ারির কন্যার বিবরণে কাহিনির ভিন্ন মাত্রা ফুটে উঠেছে। শেষে অসুস্থ অবস্থায় পিয়ারীর পাটনার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয়লাভ এবং রাজলক্ষ্মীর বড় প্রেমের পরিচয়। রাজলক্ষ্মীর কাছে বিদায় গ্রহণের মধ্যে দিয়ে প্রথম পর্বের বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে প্রধান পুরুষ চরিত্র দুটি ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত। নারী চরিত্র দুটি অন্নদাদিদি ও পিয়ারী। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রেরা হল মেজদা, যতীনদা, শ্রীনাথ বহুরূপী, শাহজী, নতুনদা, পিসেমশাই, দ্বারিকবাবু, পিসিমা, ভট্টাচার্যিমশাই, হিন্দুস্থানি প্রবীণ ভদ্রলোক, রতন, গৌরী তেওয়ারীর কন্যা, সাধু, রামবাবু, বঙ্কু প্রভৃতি।

২.৪ 'শ্রীকান্ত' : চার পর্বের সংক্ষিপ্ত কথা

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব)-(১৯১৭) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশের পর থেকে বাঙালি পাঠকসমাজ নব উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। সমকালে রচিত শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এর গঠন স্বতন্ত্র। রচনারীতি ও শ্রেণিবিচারে এর প্রকৃতি আলাদা। অন্যান্য রচনায় তিনি প্রত্যক্ষ বর্ণনারীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে তিনি আত্মজীবনীমূলক রীতি অনুসরণ করেছেন। পূর্বে-রচিত উপন্যাসগুলিতে

কোথাও লেখকের নিজস্ব মতামত, কোথাও বা তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। এতদিন তিনি সমাজের মানুষকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি ও তাঁর নায়ক চরিত্র শ্রীকান্ত এক হয়ে গেছেন। কাহিনিতে কোন্ কথা শরৎচন্দ্রের, আর কোন্ কথা শ্রীকান্তের তা অনেক সময় পাঠক বুঝে উঠতে পারেন না।

'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীমূলক রীতিতে হলেও এটি শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী কিনা, এ নিয়ে বহু সংশয় ও বিতর্ক রয়েছে। এর কারণ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের বেশ কয়েকটি চরিত্র ও স্থানিক বিবরণের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অবিকল সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন—ভাগলপুরের ঘরবাড়ি, পথঘাট, বনজঙ্গল, গঙ্গা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি। শ্রীকান্তের যৌবনের ঘটনাগুলিও শরৎচন্দ্রের প্রথম যৌবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা বলে মনে হয়। অপ্রধান চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি মাত্র। একারণে এই প্রথম পর্বের কাহিনি লেখকের আত্মকাহিনি বলে মনে হয়। কিন্তু উপন্যাসে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যা শরৎচন্দ্রের জীবনে ঘটেনি। সেখানে লেখকের কল্পনাশক্তি অপূর্ণতাকে সৌন্দর্যসুষমা দান করেছে। অসামান্য শিল্পচাতুর্যের গুণে চেনাশোনা ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করেছেন।

শ্রীকান্তের ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবন, তার কৌতূহলী অথচ নিরাসক্ত দৃষ্টি, নারী সম্পর্কে দরদ ও সহানুভূতি, সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, অনুভূতিশীল ও স্পর্শকাতর মনোভাব—সবকিছুর মধ্যে যেন শরৎচন্দ্রকে দেখতে পেয়েছি। এখানে শ্রীকান্তের দরদি হৃদয়ের সঙ্গে তীক্ষ্ণ মননশীল সমালোচক সত্তা যুক্ত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই পর্বে আমরা শ্রীকান্তের কবি, দার্শনিক ও রসিক শিল্পী সত্তাকে খুঁজে পেয়েছি।

১৯১৮ সালে 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয় পর্ব) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই পর্বেও বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি সাজিয়ে কাহিনি গড়ে তোলা হয়েছে। ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে তিনি বর্মী সমাজ ও রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালি সমাজের বর্ণনা করেছেন। নিজের-চোখে-দেখা মানুষগুলি স্মৃতির পাতা থেকে সাহিত্যের আসরে স্থান করে নিয়েছে। বর্মী মেয়েদের স্বাধীনতা, তাদের চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ ও সংকোচহীন মানসিকতা লেখককে মুগ্ধ করেছিল। রেঙ্গুনের বস্তি অঞ্চলের মানুষদের চেহারা, পেশা, স্বভাব, নানা সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থানে উপন্যাসে বাস্তবতার ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে যে রেঙ্গুনবাসী বাঙালি সমাজের ছবি পাওয়া যায়, তা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল। এদেশে বিবাহের নিয়ম কঠোর নয়। নিষেধ-শাসনের বেড়াজালে এদের পারিবারিক জীবন আবদ্ধ নয়। তবে এই পর্বের ঘটনাপ্রবাহ অনেকখানি শিথিল।

কাহিনির শুরু ও শেষ হয়েছে শ্রীকান্তের পল্লিগ্রামের বাড়িতে। মায়ের গঙ্গাজল সখীর হাত থেকে রক্ষা পেতে শ্রীকান্ত পাটনায় রাজলক্ষ্মীর বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনির মতো যাত্রাপথের বর্ণনা, সহযাত্রীদের পরিচয়, অজানা লোকেদের স্বভাব পরিচয় ফুটে

উঠেছে। ছয় থেকে বারো পরিচ্ছেদ পর্যন্ত রেঙ্গুনের বিচিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় রয়েছে। অভয়া-রোহিণী বৃত্তান্তের পাশাপাশি ঘটমান নানা দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন। শেষ তিন পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের দিন কেটেছে রাজলক্ষ্মীর সান্নিধ্যে। তারা কখনো কলকাতায় কখনো কাশীতে বাস করেছে। কাশী থেকে জ্বরাক্রান্ত শ্রীকান্তের ফিরে আসা ও রাজলক্ষ্মীর উপস্থিতি কাহিনিতে অন্যমাত্রা সঞ্চারিত করেছে। সংলাপধর্মী দ্বিতীয় পর্বের পরিচ্ছেদ বিভাজনে লেখকের অসতর্ক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

তেরো পরিচ্ছেদ থেকে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মানসিক বৃত্তির রহস্য প্রকাশের মধ্যে শরৎচন্দ্রের লেখনীর যাদু ধরা পড়েছে। সেই গুণে কাহিনির এই অংশ একান্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। একনিষ্ঠ প্রেম যে অর্থহীন এবং অপমানকর সতীত্বের চেয়ে অনেক বড়, অভয়া চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। শ্রীকান্তের সঙ্গে অভয়ার কথোপকথনে অভয়ার বক্তব্য- যে বিদ্রোহী শরৎচন্দ্রের অন্তরের কথা, তা আমরা অনায়াসে বুঝে নিতে পারি। এই পর্বে রাজলক্ষ্মী কখনো পিয়ারী বাইজী, কখনো শ্রীকান্তের প্রেমিকা, কখনো বঙ্কুর মা, কখনো বিধবা ব্রহ্মচারিণী আবার কখনো এক অচেনা রহস্যজালে ঘেরা নব-নব-রূপে-সজ্জিতা এক কৌতূহলী নারী। নারী চরিত্রের বিচিত্র রূপের পাশে শ্রীকান্তের নিরসক্ত জীবনদৃষ্টি এই পর্বের মূল উপজীব্য।

১৯২৭ সালের ১৮ এপ্রিল 'শ্রীকান্ত' (তৃতীয় পর্ব) বই আকারে প্রকাশিত হল। এই পর্বের পনেরোটি পরিচ্ছেদে মনে হয়েছে শ্রীকান্ত বুঝি প্রিয়তম রাজলক্ষ্মীর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কিন্তু কাহিনিতে আসলে তা ঘটেনি। উভয়ের একত্রে অবস্থান সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মিলন ঘটেনি। একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান তাদের পরস্পরের থেকে আলাদা করে রেখেছে। দূর থেকে কাছে এসে তারা উপলব্ধি করেছে দুজনেই যেন একে অপরের নিকট থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে। মানবজীবনের এই গভীর ট্র্যাজেডি লেখক শ্রীকান্ত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। ভালোবাসা চায় বন্ধন, আবার বন্ধন চায় মুক্তি—এই সত্য শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর জীবনের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি।

বীরভূমের গঙ্গামাটিতে শ্রীকান্ত এক কর্মহীন আশ্রিত ব্যক্তি আর রাজলক্ষ্মী বহুবন্দিত ভূম্যধিকারিণী। এখন তাকে নিয়ে রাজলক্ষ্মীর কোন ভাবনা নেই, উত্তেজনা নেই। শ্রীকান্ত এখন তার কাছে সমর্পিত। দুজনের দূরত্ব কোনভাবে ঘোচেনি। এরপর শ্রীকান্ত ব্রহ্মদেশে বড় সাহেবের কাছে পুনরায় কাজ চেয়ে আবেদন করেছে ও মঞ্জুর হয়েছে। গঙ্গামাটি থেকে শ্রীকান্ত গেছে কলকাতায় আর রাজলক্ষ্মী পাটনার দিকে রওনা দিয়েছে।

এই পর্ব লেখার সময় শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখানে শ্রীকান্তের দৃষ্টি আত্মময়। বহিঃপ্রকৃতি ও শ্রীকান্তের মন এখানে একাত্ম হয়েছে। এই পর্বে অনেকখানি জুড়ে রয়েছে সুনন্দা ও বজ্রানন্দ। রতন চরিত্রটি এই পর্বে পূর্বের চেয়ে বেশি বিকশিত। 'শ্রীকান্ত'র পর্বগুলির মধ্যে তৃতীয় পর্বেই শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর উদাসীনতা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে রাজলক্ষ্মী ধর্মাচরণের মাদকতার কারণে নিজেকে শ্রীকান্তের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিল। এই পর্বে

রাজলক্ষ্মী কেবল বাঁধন আলগা করতে চেয়েছে, আর শ্রীকান্ত বাঁধা পরতে চেয়েছে। সুনন্দার প্রতি ধর্মাচরণের আকর্ষণে শ্রীকান্তের প্রতি সব আনুগত্য উবে গেছে। এই পর্বে রাজলক্ষ্মীর কাছে শ্রীকান্ত দুবার বিদায় নিয়েছে। অত্যন্ত অবিচলিতভাবে শ্রীকান্ত বিদায় জানিয়েছে। অর্থাৎ দুজনের মনের ছেঁড়া তারটি আর কোনোভাবেই জোড়া লাগানো সম্ভব হয়নি।

'শ্রীকান্ত' (চতুর্থ পর্ব) ১৯৩৩ সালে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসে তখন শ্রীকান্তর বয়স বত্রিশ এবং রাজলক্ষ্মীর বয়স সাতাশ বছর। শরৎচন্দ্রের বয়স তখন সাতান্ন বছর। এই পর্বের বর্ণিত ঘটনাস্থল লেখকের জন্মভূমি দেবানন্দপুর। এখানকার মাঠঘাট, গাছপালা, সরস্বতী নদীর প্রবাহ, নিজের চোখে দেখা লোকজন সবই শ্রীকান্তের স্মৃতিতে মমতার প্রলেপ দিয়েছে। এখানে উভয়ের মুখে গ্রামের বাল্য স্মৃতিচারণ শোনা গেছে। পরিণত বয়সের শ্রীকান্তর মধ্যে এই সময়ে পরিণত বয়সের ভাবুকতা ও অন্তর্মুখীনতা অধিক দেখা যায়। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সে জানতে পারে প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার মধ্যে সকল সুধা ও সৌন্দর্য নিহিত ছিল। তাই এখানে সামান্যের মধ্যে অসামান্যের, তুচ্ছের মধ্যে মহতের সন্ধান পেয়েছেন। চতুর্থ পর্বে শ্রীকান্ত এক স্বপ্নময় মায়ার জগতে অবস্থান করেছে।

চতুর্থ পর্বের চোদ্দটি পরিচ্ছেদে নানা বিচ্ছিন্ন বৃত্তান্তের বিবরণ রয়েছে। রয়েছে পুঁটুর বিবাহের বিবরণ, বাল্যবন্ধু গহরের হৃদয় বেদনার কথা। ভবঘুরে নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝে রাজলক্ষ্মী ও কমললতা দুই নারীর প্রেমে শ্রীকান্ত হাবুডুবু খেয়েছে। এই পর্বের শেষে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মিলিত জীবনে প্রেমের অবমাননা ঘটেছিল। শ্রীকান্ত চরিত্রের যে- অসাধারণত্ব ছিল, এই সময়ে তা ধূসর হয়ে গেছে। জীবনের শেষদিকে শরৎচন্দ্রের মনে যে- ক্ষমাসুন্দর ও করুণার ভাব জন্ম নিয়েছিল, তার প্রকাশ রয়েছে এই পর্বে। এখানে পল্লিবাংলার রূপ তিনি দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যা শরৎ সাহিত্যে বিরল। এই সুন্দর প্রকৃতির মাঝে থেকে এখন তার চিরবিদায়ের পালা। পরপারে চলে যাবার আগে মানুষের মনে যে বৈষ্ণবীয় প্রেমভাব জন্মে সেই প্রেমের আলোকে জীবনের সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে এক সুন্দর জীবনরস উপভোগের বর্ণনা কাহিনিকে সমৃদ্ধ করেছে।

২.৫ শরৎ-সাহিত্যে 'শ্রীকান্ত'র স্থান

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টির ধারায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি নানাদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষয়বস্তু, কাহিনিবিন্যাস, প্রকাশরীতি, চরিত্র-চিত্রণ ও গঠন কৌশলের দিক থেকে উপন্যাসটি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনি' নামে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় থেকে বাঙালি পাঠকমহলে উপন্যাসটি সাড়া জাগাতে শুরু করেছিল। প্রচলিত গতানুগতিক উপন্যাসের বিষয়ের বাইরে গিয়ে বেশ কিছু ঘটনাকে একত্রিত করে শরৎচন্দ্র যা পরিবেশন করলেন তা সত্যি অভিনব। উপন্যাসে বাস্তবতার অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের

সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ ঘটাতে পেরেছিলেন তিনি। David Copperfield এর রচনারীতির সঙ্গে মিলিয়ে তিনি 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস রচনা করেছেন। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন।' প্রচলিত ও গতানুগতিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য বর্জিত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস বাঙালি পাঠক ও সমালোচক মহলে স্বতন্ত্র রসোপলব্ধির স্বাদ এনে দিতে পেরেছিল।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের কাহিনির অভিনবত্ব সমকালীন পাঠককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে শ্রীকান্ত'র দুঃসাহসিক ছন্নছাড়া জীবনধারা ছিল সেকালের পক্ষে অভূতপূর্ব। এর কাহিনি বাঙালির সীমিত জীবনচেতনার বাইরে গিয়ে এক সীমাহীন মুক্ত জীবনের স্বাদ দিয়েছে। এই নতুন জীবন অভিজ্ঞতার সন্ধান দিয়েছে বলে তা জনমানসে এক নতুন সৌন্দর্য ও রহস্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আমাদের স্কুল-কলেজ-অফিসের লৌহ-নিগড়-বদ্ধ, রোগ-শোক-জর্জরিত, দলাদলি-বিরোধ-কন্যাদায়-বিড়ম্বিত বাঙালি জীবনের প্রান্তসীমায় যে বিচিত্র রসভোগের এত প্রচুর অবসর আছে, দুঃসাহসিকতার এত ব্যাকুল, প্রবল আকর্ষণ আছে, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও সমালোচনার এরূপ বিশাল, অব্যবহৃত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, চক্ষুর ও হৃদয়ের এত অপর্যাপ্ত রসদ মজুত আছে, তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না। এই কল্পনাতীত বিচিত্র সৌন্দর্য 'শ্রীকান্ত' আমাদের মুগ্ধ নয়নের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছে ও মুক্তহস্তে আমাদের পাতে পরিবেশন করিয়াছে।'

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে এক নতুন ধরনের বাংলা উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর পরে এই জাতীয় উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেলেও পূর্বে আমরা কখনো পাইনি। শরৎচন্দ্রই এই আত্মকাহিনির ছলে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। সমকালের পক্ষে এই পন্থা একেবার নতুন। তাঁর এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ চেনা পরিবেশ থেকে নেওয়া হয়েছে। এরা সকলে আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। উপন্যাসের শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, অন্নদাদিদি, ইন্দ্রনাথ, শাহজী, মেজদা, নতুনদা প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পূর্বে দেখা যায়নি। শ্রীকান্ত একাধারে উপন্যাসের নায়ক চরিত্র এবং সমকালীন বাঙালি জীবনবোধের যথার্থ প্রতিনিধি। এই চরিত্রটি সম্ভাবনার প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। শরৎ উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের থেকে সে অনেকাংশে ভিন্ন প্রকৃতির। তার চলাফেরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার সবকিছুতে এমন স্বকীয়তা রয়েছে যা আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা চলে না।

এই জাতীয় উপন্যাসে বৃহৎ ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা নেই। প্রয়োজনে বড় ঘটনাকে এড়িয়ে গিয়ে লেখক সাবধানে কাহিনি ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখি, চলতি পথিকের মতো সব কিছুকে ছুঁয়ে এগিয়ে চলে কাহিনি। উপন্যাসের সময়ে ফুটে উঠেছে নায়কের আশৈশবের জীবনকাল। ছেলেবেলায় ভাগলপুরের পরোপকারী বন্ধু রাজেন মজুমদারের জীবনচেতনার আদলে শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি। এটিও লেখকের এক অভূতপূর্ব সৃজন। নির্ভীক, মহাপ্রাণ, আদর্শবান, ত্যাগী, উদার, সহৃদয় ইন্দ্রনাথ সেকালের সমস্ত বাঙালি পাঠকের মন জয় করে নিয়েছে নিমেষে।

উপন্যাসে পিয়ারী বাইজী তথা রাজলক্ষ্মী এক বিচিত্ররূপিণী নারী। তার বাইজী বৃত্তিতে প্রেমিকাসত্তা লালনের করার মধ্যে এক নতুন ভাবনার কথা আমরা জানতে পেরেছি। নারী যে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চায়, রাজলক্ষ্মীকে না দেখলে তা সহজে বোঝা যায় না। বাইজী হয়েও সে শরৎচন্দ্রের অনুগ্রহপুষ্ট নায়িকা। কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে পিয়ারী বাইজীকে শ্রীকান্ত চিনতে পারেনি। লেখক সুকৌশলে ঘটনার মধ্যে নানা কথার সংযোজনে পিয়ারীর রাজলক্ষ্মী তথা নায়িকাসত্তার উন্মোচন করতে চেয়েছেন। শৈশবে- লালিত পুরাতন প্রেমের নতুন উপক্রমণিকায় চরিত্রটি এই পর্বে নতুন মাত্রা এনেছে। অনুপমা, শুভদা, মাধবী, ললিতা, বিরাজ, রমা, অচলা, ষোড়শী প্রভৃতি নারী চরিত্র শরৎচন্দ্র যে আঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন, রাজলক্ষ্মী তাদের থেকে বহুলাংশে ব্যতিক্রমী চরিত্র। সেকারণে চরিত্রটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

অন্নদাদিদি চরিত্র পরিকল্পনায় শরৎচন্দ্র শাহজীর মতো মানুষদের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। বলা চলে সেকালের পক্ষে এই চরিত্রটিও অভিনব। ঘৃণ্য নারী ঘাতক স্বামীর জন্য স্বেচ্ছায় সব নিন্দা ও অপবাদ মাথা পেতে নিয়েছে সে। প্রচণ্ড দুঃখ কষ্টে দিন কাটালেও পাতিব্রতের আদর্শ থেকে এক মুহূর্তের জন্য সে সরে দাঁড়ায়নি। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় ইতিপূর্বে এরূপ চরিত্র দেখা যায়নি।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের গঠন কৌশল অন্যান্য উপন্যাসের থেকে আলাদা। এর ভাব ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য আছে তা অনান্য উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায় না। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, 'শ্রীকান্ত ও শ্রীকান্তের লেখক শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা গূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ আছে। ... এই উপন্যাসখানি এক অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনি বটে। কিন্তু তাহা স্বলিখিত জীবনবৃত্তের মত নয়। পাঠকগণের জন্য উপন্যাসের আকারে লিখিত হইলেও উহা কতকটা আপনার মধ্যেই আপনাকে দর্শনের মতো। এই আত্মদর্শনের ভঙ্গীটি সাহিত্যে অতিশয় নূতন—আপনাকেই দেখা বটে, কিন্তু তাহাতে এমন একটি আত্মনিরপেক্ষতা আছে যে সে যেন অপর কাহাকে দেখার মতো।'

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি বহু বর্ণময় ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। শ্রীকান্ত'র পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রায় অধিকাংশ উপন্যাস বিচিত্র কাহিনিতে ভরপুর এবং নিবিড় হৃদয়াবেগের প্রকাশ রয়েছে। সেসব উপন্যাসের বন্ধনের চেয়ে এর কাহিনিগ্রন্থন খানিকটা শিথিল হলেও অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এর আবেদন ভিন্নতর। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে কাহিনি ও চরিত্রকে যে বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে দেখিয়েছেন লেখক, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। আবার বলা চলে শরৎচন্দ্রের জীবনব্যাপী শিল্পকর্মের মধ্যে লেখকের অন্তর্লোকে প্রবেশের চাবিকাঠি এই উপন্যাস।

লেখকের সমকালে অন্য কোনো কথাসাহিত্যিক এই ধরনের শিল্পকর্ম সৃজনের কথা ভাবতেও পারেনি। তাই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস শরৎসাহিত্যে কোনো মহত্তর সৃষ্টি না হলেও অনেকটা মনিমুক্তার মতো চাকচিক্যময়। সমালোচকেরা সেই কারণে বলে থাকেন এটি শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এর কাহিনির মধ্যে পারম্পর্যবিশেষ রক্ষা করা না হলেও বারোটি পরিচ্ছেদের প্রতিটি এক একটি মহামূল্যবান রত্ন। যারা

কেবল জীবনের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, তাদের কাছে এই কাহিনি রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়েছিল। অতি সাধারণ জীবিকায় অভ্যস্ত মানুষ নিত্যদিনকার ঘরের কাজের ফাঁকে শ্রীকান্তের মধ্যে একটু মুক্তির আনন্দ খুঁজে পেয়েছিল। শ্রীকান্তের ভাগ্যে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে শরৎচন্দ্রের উদার মানসিকতা ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীকান্ত'র পরবর্তী পর্বগুলিতে সমাজ সম্পর্কে শ্রীকান্তের যে মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল আলোচ্য উপন্যাসকে তার মূল উৎস বলা যেতে পারে। শ্রীকান্তের জীবনদর্শন ও জীবনের বিচিত্র রস আস্বাদনকারীর ভূমিকা এবং বিভিন্ন প্রকারের চরিত্রের কর্মকুশলতায় রচনাটি উজ্জ্বল।

সুতরাং সার্বিক বিচারে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

২.৬ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়টি খণ্ড? কোন সালে খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়।

২. শ্রীকান্ত উপন্যাস রচনার সমকাল ও সময় সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

৩. শ্রীকান্ত উপন্যাসটি কোন রীতিতে লিখিত। প্রথম পর্বের কয়েকটি অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের ঘটনাবলীর প্রক্ষেপ কেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় দেখান।

একক-৩ ❑ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের বিষয় ও শৈলী

গঠন

৩.১ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের কাহিনিসংক্ষেপ

৩.২ উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

৩.৩ উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠন কৌশল

৩.৪ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ভাষাশৈলী

৩.৫ উপন্যাসে হাস্যরস ও কৌতুকরস

৩.১ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের কাহিনিসংক্ষেপ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চার পর্বে 'শ্রীকান্ত'র শৈশব থেকে যৌবন-উত্তর কালের নানা ঘটনার পরিচয় রয়েছে। এর চরিত্রটির মধ্যে লেখকের আত্মজীবনের বহু ঘটনার যোগসূত্র রয়েছে। শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্রের শিশুবেলার দেবানন্দপুরের কথা যেমন কাহিনিতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে ভাগলপুরের মানুষ ও প্রকৃতির নানা পরিচয়। ব্রহ্মদেশে বসবাসকালে লেখকের নানা অনুভূতিতে সমৃদ্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের কাহিনি। চতুর্থ পর্বে পুনরায় ফিরে এসেছে জন্মভূমি দেবানন্দপুর ও অন্যান্য স্থানের কথা। আমরা আমাদের পাঠ্য 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের পরিচ্ছেদগুলির ঘটনাবলী সূত্রাকারে জেনে নেব।

প্রথম পর্বের বারোটি পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের বাল্যজীবন ও প্রথম যৌবনের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তর ছেলেবেলার বিবরণ রয়েছে। স্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে। বালক শ্রীকান্ত তন্ময় হয়ে খেলা দেখছিল। আনন্দে সে উৎফুল্ল। এমন সময় হঠাৎ মারামারি শুরু হল। মুসলমান ছেলেরা শ্রীকান্তকে ঘিরে ধরে কিল চড়ের সঙ্গে পিঠের উপর ছাতার বাঁট ভেঙে চলেছে। এমন সময় ছেলেদের ঘেরাটোপের মঝে হাজির হল ইন্দ্রনাথ নামে এক সাহসী বালক। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তর গভীর ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হল।

পিসিমা-পিসেমশাইয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত শ্রীকান্ত। আষাঢ় মাসের এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় অন্য ভাইদের সঙ্গে শ্রীকান্ত মেজ'দার কাছে পড়তে বসেছিল। সেই সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে শ্রীনাথ বহুরূপী বাঘ সেজে ঘরে ঢুকে পড়ায় বিষম গণ্ডগোল বাধে। ছোট বড় সকলে তখন বাঘের ভয়ে কাঁপছে। ইন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে জানিয়ে দিল, এখানে কোনো বাঘ আসেনি। এরপর শ্রীকান্তকে নিয়ে ইন্দ্রনাথ সন্ধ্যার অন্ধকারে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে। অসীম সাহসিকতায় ভর করে দুঃসাহসী দুই বালক চলেছে নিশীথ অভিযানে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখি দুই তরুণ বালক ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে খরস্রোতা গঙ্গার বুকে অন্ধকারের ভেতরে এগিয়ে চলেছে। ছয়-সাত ক্রোশ দূরে সতুয়ার চড়া। সেখানে জেলে মাঝিদের ধরে-আনা বড় বড় মাছগুলি পাহারা দেয়। তাদের হাতে ধরা পড়লে মৃত্যু অবধারিত। একথা জেনেও ইন্দ্র মাছ চুরির পথে পা বাড়িয়েছে। ইন্দ্র ডিঙি বেয়ে সেখানে হাজির হয়ে বড় বড় কয়েকটি মাছ তুলে নিয়ে আবার নৌকা ছেড়ে দিয়েছে। জেলেরা টের পেয়ে তাদের পেছনে তাড়া করেছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ কৌশলে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে অল্প গভীর খাতে নৌকা ঢুকিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ডিঙি তীরের দিকে নিয়ে গেছে। শ্রীকান্ত নৌকার উপরে বসে রয়েছে। জনার ভুট্টা গাছে অসংখ্য সাপ জড়িয়ে আছে। নৌকার ধাক্কায় একের পর এক সাপ গাছ থেকে জলে পড়ছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করেনি। শ্রীকান্তকে সে বলেছে 'মরতে আবার ভয় কীসের'। বড় নদীতে পড়বার পর আবার তাদের ডিঙি ভেসে চলেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতে শ্রীকান্ত উপস্থিত। জগতের সমস্ত বাধা বিপত্তির সমাধান আছে কেবল ইন্দ্রনাথের কাছে। তাই রাতের অন্ধকারে জেলেদের থেকে চুরি করে আনা মাছগুলি বিক্রি করতে তারা আবার ঘণ্টা দুয়েক ভেসে চলল। এরপর নৌকা একটি স্থানে বেঁধে ইন্দ্রনাথ তীরে নেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে কয়েকজন হিন্দুস্থানি জেলে এসে মাছগুলির নিয়ে কিছু টাকা দিল। ইন্দ্রনাথ সেই টাকা কাউকে দেবার জন্য আবার নৌকা নিয়ে রওনা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তাকে টাকা দেওয়া হয়নি। কারণ নৌকা বাঁধার স্থানে একটি শিশুর মৃতদেহ দেখে সেটিকে নৌকায় তুলে নিয়ে ঝাউ বনের মাঝে ফেলে দিয়ে এসেছে দুজনে। তখন সেই টাকা পৌঁছে দেবার সিদ্ধান্ত বদলে তারা বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি দুজনে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে বাড়ি ফিরে এসেছে। সমবয়সী যতীনদাদা আনন্দে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু মেজ'দা হাতের কাছে শিকার পেয়ে শ্রীকান্তকে মারতে উদ্যত হল। পিসিমা এসে তার কপালে হাত দিয়ে জ্বরের ভাব দেখে ঘুমোনোর নির্দেশ দিলেন। পিসিমার কড়া হুকুমের কাছে মেজদার শাসন বন্ধ করতে হল। এরপর শ্রীকান্তর ভীষণ জ্বরে পড়ল। সুস্থ হলেও অনেকদিন আর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। একসময় সে জানতে পারল ইন্দ্রনাথ এখন আর মাছ চুরি করতে যায় না। কেননা তার সেই অন্নদাদিদি মাথার দিব্যি দিয়ে তাকে মাছ চুরির কাজ করতে নিষেধ করেছে। সেই দিদিকে কিছু টাকা দেওয়া দরকার। তাই সে শ্রীকান্তের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েছে। শ্রীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে তা দিতে রাজী হয়ে যায়। ইন্দ্রনাথ বলেছে, পরদিন শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে দিদির বাড়ি যাবে। এই পরিচ্ছেদে আমরা শাহজীর সাক্ষাৎ পাই। শ্রীকান্ত মুসলমান সাপুড়ে শাহজীকে দেখে অবাক হয়েছে। ইন্দ্রনাথ শাহজীর ঘর থেকে ডালা এনে শ্রীকান্তকে সাপের খেলা দেখিয়েছে। বেগতিক দেখে আবার অন্নদাদিদি দক্ষতার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া গোখরো সাপটি ধরে দিয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা ইন্দ্রের মুখে শুনেছি সাপের ছোবল থেকে বাঁচবার উপায় হিসেবে 'বিষ পাথরে'র কথা। অন্নদাদিদির কাছে এই পাথর বেশ কয়েকটি রয়েছে। তাই ইন্দ্রনাথ ওদের কাছে থেকে একটি পাথর পাবার জন্য সব কাজ করে দেয়। শাহজীর কাছে এতদিন ঘুরে সে শুধু হাতচালার মন্ত্রটুকু শিখতে পেরেছিল। কিন্তু দিদিও যখন সব কিছু জানে তখন ইন্দ্র তার কাছে থেকেই সব বিদ্যা আয়ত্ত করতে

চায়। দিদির কছে মড়া বাঁচানোর মন্ত্র শিখে নিতে চায়। অন্নদাদিদি এসব জানেন না বললেও ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করে না। সে মনে করে, এতদিন ধরে শাহজী ও অন্নদাদিদি তাকে শুধু ফাঁকি দিয়েছে। দিদির না জানার কথায় ইন্দ্রনাথ ভীষণ চটে গেছে। অন্নদাদিদিকে প্রতারক বলে গালাগালি দিয়েছে। শাহজীকেও সে মিথ্যাবাদী ও চোর বলে গালাগালি দিয়েছে। বন্ধু শ্রীকান্তকে সে বলেছে 'জোচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে মরুক, সেই আমি চাই।' এরপর তারা দুজনে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এরপর শাহজী অন্নদাদিদিকে বেদম মেরেছে। দিদির আর্ত চিৎকার শুনে ইন্দ্রনাথ আবার বাড়ির ভেতরে গিয়ে শাহজীকে আক্রমণ করেছে। শাহজী ক্ষেপে গিয়ে সাপ মারা বর্শা দিয়ে ইন্দ্রনাথকে আহত করেছে। উভয়ের খণ্ডযুদ্ধে আমরা দেখেছি শাহজীর চাইতে ইন্দ্রনাথ অনেক বলশালী। অন্নদাদিদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে শাহজীর বাঁধন খুলে দিল এবং ভবিষ্যতে ইন্দ্রকে এখানে আসতে বারণ করে দিল। এভাবে অন্নদাদিদির সঙ্গে চিরতরে সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তারা দুজনে বাড়ি ফিরে এল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি এই ঘটনায় শ্রীকান্তের মনে ভীষণ আঘাত লেগেছে। প্রায় তিন চার-মাস উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ নাই। এমনকি দেখা হলেও তারা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেছে। দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষ্যে পাড়ায় থিয়েটারের মঞ্চ বাধা হচ্ছে। শ্রীকান্ত একান্ত নিবিষ্ট মনে থিয়েটার দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ ইন্দ্র ডেকে নিয়ে গেল অন্নদাদিদির বাড়িতে। তারা দেখল শাহজী সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। অন্নদাদিদির অনুরোধে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ মিলে শাহজীর দেহ মাটিতে কবর দিল। অন্নদাদিদি স্বামীর জন্য নির্যাতন সহ্য করলেও স্বামী বিয়োগের ব্যথায় কাঁদতে লাগল। ইন্দ্রনাথ সেসময়ে তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে অন্নদা রাজী হয়নি। দিদি বলেছেন, স্বামী যে ঋণ করে গিয়েছেন তা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না। শ্রীকান্ত সেসময়ে দিদিকে পাঁচ টাকা অর্থ সাহায্য করতে চাইলে দিদি তাকে স্নেহ ভরে আশীর্বাদ করতে গিয়ে বললেন, "তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে আজ মনে মনে সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার করে নেন।" এরপর ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত বাড়ি ফিরে এসেছে।

তিনদিন পর ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদির লেখা একটি চিঠি এনে শ্রীকান্তকে পড়তে দিয়েছে। পত্র থেকে জানা যায়, তার স্বামী অন্নদার বিধবা বড় বোনকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দীর্ঘ সাত বছর পর মুসলমান সাপুড়ের বেশে গ্রামে ফিরে আসে। অন্নদাদিদি তার সঙ্গে নিরুদ্দেশ হতে গ্রাম ত্যাগ করেন। লোকেরা জেনেছিল সে কুলত্যাগিনী। এখন স্বামীর ঋণ সে সব শোধ করে দিয়েছে। শ্রীকান্তের দেওয়া পাঁচ টাকা রাস্তার মোড়ের মুদির দোকানে রাখা আছে চাইলেই পাওয়া যাবে। একথাও তিনি লিখে গেছেন, দিদির কথা ভেবে তারা যেন মন খারাপ না করে। নিরুদ্দেশ দিদি দুজনের বন্ধুত্ব চির অটুট থাকুক— এই কামনায় পত্র শেষ করেছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদের শুরুতে অন্নদাদিদির নিরুপায় হয়ে চলে যাবার কথা জানা যায়। এরপর শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের অনেকদিন দেখা হয়নি। গঙ্গার ঘাটে তার ডিঙিটি ঠায় দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। এখানে আমরা ইন্দ্রনাথের নতুনদাদাকে প্রথম দেখি। তিনি কলকাতা থেকে এই শহরে এসেছেন। ইন্দ্রনাথের ডিঙিতে নতুনদাদা, শ্রীকান্ত চলেছে দূরের গ্রামে গানের আসরে। নতুনদাদা সেখানে হারমোনিয়াম বাজাবেন। গঙ্গার উপর দিয়ে নৌকায় যাবার সময়ে তার কথাবার্তা আচার-ব্যবহারে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত বিরক্ত হলেও মুখে কথাটি বলেনি। মুখে বড় বড় কথা বলে, গ্রামের ছেলেদের অপমান করে শেষ পর্যন্ত কুকুরের তাড়া খেয়ে কলকাতার বাবু প্রবল শীতের রাতে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরেছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তর ছেলেবেলার স্মৃতি পুনরায় মনে এসেছে। অন্নদাদিদির স্মৃতি তখন ঝাপসা হয়ে এসেছে। ইন্দ্রনাথের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ নেই। বহু স্থান ঘুরে শ্রীকান্ত পূর্বের এক সহপাঠী রাজার ছেলের আমন্ত্রণে হাজির হয়েছে শিকার পার্টিতে। সেখানে সাক্ষাৎ হয়েছে পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে। বাইজী টাকার বিনিময়ে পাটনা থেকে দু সপ্তাহের জন্য এখানে এসেছে। কিন্তু এই পিয়ারী যে শ্রীকান্তের বাল্যসাথী রাজলক্ষ্মী, তা প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে জানতে পারে যে, সে বাঙালির মেয়ে। শ্রীকান্ত পিয়ারীর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে। পরদিন পিয়ারীর আহ্বানে শ্রীকান্ত তার সঙ্গে দেখা করতে তাঁবুতে গিয়েছে। অনেক কথাবার্তা হলেও বাল্যসাথীর কথা মনে করতে পারেনি। বরং বাকচাতুর্যের কারণে বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছে। নিজের তাঁবুতে ফিরেও সে পিয়ারীকে কোথাও মনের মধ্যে খুঁজে পায়নি। এরপর পিয়ারী বাইজী সম্পর্কে শ্রীকান্তের মনে বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে।

একদিন কুমার সাহেবের মজলিশে ভূতের গল্প হচ্ছিল। এক প্রবীণ হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণ বলেছিলেন অমাবস্যার রাতে মহশ্মশানে গেলে ভূতের দেখা মিলতে পারে। শ্রীকান্ত ভূতে বিশ্বাস করে না। তাই সে মহাশ্মশানে যেতে প্রস্তুত হল। সে সময় পিয়ারীর খানসামা রতন এসে শ্রীকান্তকে পিয়ারীর সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়ে গেল। পিয়ারীর তাঁবুতে গেলে পিয়ারী তাকে শ্মশানে যেতে বারণ করে দিল। শ্রীকান্ত সেকথা শোনেনি। এই কথোপকথনের সময় পিয়ারীর প্রকৃত পরিচয় শ্রীকান্ত জানতে পারল যে, এই নর্তকী তার বাল্যসাথী রাজলক্ষ্মী। গ্রামের পাঠশালায় শ্রীকান্ত যখন সর্দার পাড়ায় ছিল, তখন বালিকা রাজলক্ষ্মী প্রতিদিন বৈচি ফলের মালা গেঁথে তাকে উপহার দিত। তাঁর কুলীন পিতা আরও একটি বিয়ে করে মাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। মা তাই বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পরে দুই বোন রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর বিয়ে হয় এক পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। কিন্তু ব্রাহ্মণটি নগদ সত্তর টাকা পেয়ে দেশে পালিয়ে গিয়েছিল। আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। বছর দেড়েক বাদে সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু হয়। রাজলক্ষ্মী কাশীতে গিয়ে জীবন চালাতে বাইজীর পেশা বেছে নিয়েছিল।

এদিকে পিয়ারী বাইজীর অনুরোধ উপেক্ষা করে শ্রীকান্ত মহাশ্মশানের উদ্দেশে যাত্রা করল। শ্মশানের পথের ভয়াবহ দৃশ্য ও নির্জন পরিবেশ তাকে খানিকটা বিচলিত করেছিল। শ্রীকান্ত তখন মনোবল হারিয়েছিল। পিয়ারীর-পাঠানো লোকজন চলে আসায় সে আবার মনোবল ফিরে পেয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তর অতীতচারিতার প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। অন্নদাদিদির আশীর্বাদ সঙ্গে রয়েছে বলে মন অন্য কোনো দিকে ফেরানো চলে না একথা ভেবে অবাক হল। পরদিন কুমার সাহেবের বড় তাঁবুতে বসে সকলে গত রাতের শ্মশানের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চেয়েছে। কুমারজী সহ তাঁবু ভরা লোকের সামনে শ্রীকান্ত অমাবস্যা রাতে শ্মশানের হাড়গোড় আর মড়ার মাথা দেখার কথা জানাল। সকলে নিস্তব্ধের মতো কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সকলের মাঝে পিয়ারী এই রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। শ্রীকান্ত সেদিন সকালে বিদায় নেবার কথা থাকলেও শরীর ভালো নেই বলে নিজের তাঁবুতে গেল। এতদিনের মধ্যে আজ শ্রীকান্ত প্রথম পিয়ারীর মনের ভাবান্তর লক্ষ করেছে। শ্রীকান্তর কাছে রমণীর প্রেম তুচ্ছ মনে হলেও আজ তার মূল্য বুঝতে পেরেছে। এক শ্মশান থেকে আর এক শ্মশানের পথে বিচরণের মধ্যে কথা শেষ হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত পরদিন আবার শ্মশানে গিয়ে মহাশ্মশানের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ফেরার সময় পুনরায় পিয়ারীর সঙ্গে দেখা। পিয়ারী তখন তার নাচ গানের দল নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। পিয়ারী সেদিনই শ্রীকান্তকে কুমার সাহেবের তাঁবু ত্যাগ করে বাড়ি যাবার অনুরোধ জানিয়েছে। পিয়ারী শ্রীকান্তর ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিল বলে একথা সহজে বলতে পেরেছে। শ্রীকান্তের একরোখা স্বভাব প্রথমে পিয়ারীর কথা গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভোর রাতে তাঁবুতে পৌঁছে কারো কোনো কথার উত্তর না করে সে নিজের শয্যায় শুয়ে পড়েছে।

একাদশ পরিচ্ছেদের শুরুতে শ্রীকান্ত নিজগৃহে ফিরে গেছে। পিয়ারীকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে শ্রীকান্ত চিঠি লিখেছে। পিয়ারী তার প্রত্যুত্তর দিয়েছে। হঠাৎ বাড়ি থেকে আবার পাটনার উদ্দেশে রওনা হয়েছে শ্রীকান্ত। মাঝপথে কিছু একটা ভেবে অচেনা এক স্টেশনে নেমে কিছুদিন অপরিচিত সাধুর চেলাগিরি করেছে। বিঠৌরা গ্রামে গৌরী তেওয়ারীর কন্যার সঙ্গে পরিচয় হলে তাদের দুঃখের কথা শুনেছিল। গৌরী তেওয়ারী বর্ধমানের রাজপুরের অধিবাসী। দীর্ঘদিন বাংলাদেশে বাস করায় তার ছেলেমেয়েরা বাঙালি হয়ে গেছে। কিন্তু দেশাচারের খাতিরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে। ভাবধারা ও আচার আচরণের মিল ছিল না বলে তারা গৌরী তেওয়ারীর মেয়ের উপরে খুব অত্যাচার করত। মেয়ে নিজের দুঃখের কথা বাবার কাছে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানাল শ্রীকান্তকে। একথাও জানাল যে, একদিন সে এসব সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করবে।

শ্রীকান্ত তখন সাধুর দলের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটি গ্রামে কলেরা মহামারী শুরু হয়েছে বলে সাধুবাবা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে চলেছেন। রামবাবু ও তার পত্নী শ্রীকান্তকে ছেলের বসন্ত রোগ দেখা দেবার কথা জানিয়েছে। বাঙালি বলে শ্রীকান্ত আপ্রাণ সেবা করে তাদের বাঁচিয়ে তুলল। কিন্তু সে নিজে যখন রোগাক্রান্ত হল, তখন রামবাবু তাকে একাকী ফেলে সপরিবারে চলে গেল। স্টেশনে কর্মরত এক সহৃদয় ভদ্রলোক পাটনায় রাজলক্ষ্মীকে খবর দেবার ব্যবস্থা করে দিল। পাটনা থেকে পিয়ারীর সতীন-পো বঙ্কু এসে শ্রীকান্তকে সেখানে নিয়ে গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি পিয়ারীর সেবায় শ্রীকান্তর তেরো দিনের জ্বর সেরে উঠেছে। অসুখ সেরে গেলে শ্রীকান্তের ব্যস্ততা না থাকায় কিছুদিন তার সঙ্গে থেকে যেতে চেয়েছে। কিন্তু পিয়ারী জানিয়েছে, আজকাল বঙ্কু প্রায়ই বাঁকিপুর হতে এখানে চলে আসে। বেশিদিন থাকলে সে অন্যরকম কিছু ভাবতে পারে। শ্রীকান্ত বুঝে গেছে যে রাজলক্ষ্মী প্রকারান্তরে তাকে চলে যাবার কথা বলেছে। পিয়ারী তখন নিজেকে সতীন-পো বঙ্কুর মা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। কিন্তু তার ধারণা যে ভুল ছিল তা বুঝতে পারে রাতে রাজলক্ষ্মীর আকস্মিক আবির্ভাবে। কারণ রাজলক্ষ্মী চুপি চুপি এসে তার জ্বরতপ্ত কপাল নিজের হাতে পরীক্ষা করে চলে গেছে। তখন শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এরপরে অতি প্রসন্ন চিত্তে সে রাজলক্ষীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। শরৎচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।' প্রথম পর্বের উপন্যাস কাহিনি এখানে সমাপ্ত হয়েছে।

৩.২ উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

: প্রথম পরিচ্ছেদ :

শ্রীকান্তের আত্মসমীক্ষা :—ভবঘুরে জীবনের শেষ বেলায় পৌঁছে শ্রীকান্তের অনেক কথাই বার বার করে মনে পড়ে যাচ্ছে। জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কালের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছে। এসব ছোট বড় নানা ঘটনা মনের গোপন কুঠুরিতে চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। শৈশবে যে তাকে জীবনধর্মে শিক্ষা দিয়েছিল, সেই ইন্দ্রনাথের মতো মহাপ্রাণ চরিত্রের আর সঙ্গে কোথাও সাক্ষাৎ হয়নি।

স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ ও ইন্দ্রনাথ :—একদিন স্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল খেলা চলছে। শ্রীকান্ত অতি মনোযোগসহ খেলা দেখছিল। হঠাৎ মারপিট শুরু হলে নিরীহ শ্রীকান্তের পিঠে কিল, চড়ের পর ছাতির বাঁট ভাঙল। সে সময়ে কিশোর ইন্দ্রনাথ এসে তাকে ছেলেদের থেকে আড়াল করে বাইরে নিয়ে এল। নিরাপদ স্থানে এনে ছেড়ে দিয়ে শ্রীকান্তকে পালানোর পথ করে দিল। শ্রীকান্ত পালাল না। নাম জেনে নিয়ে ইন্দ্রনাথ তাকে সিদ্ধি চিবাতে বললে সে তা করেনি। প্রথম পরিচয়ে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তর মনে একটা মোহজাল বিস্তার করে ফেলেছিল।

ইন্দ্রনাথ বাঁশিওয়ালা :—মাসখানেক বাদে একদিন শ্রীকান্ত গভীর রাতে গোঁসাই বাগানের জঙ্গলে মধুর সুরে বাঁশির বাজনা শুনতে পেল। কথাবার্তায় জানা গেল ইন্দ্রনাথই সেই বংশীবাদক। এভাবে বাঁশি বাজিয়ে গভীর জঙ্গলে সাপের ভয় তুচ্ছ করে অন্ধকারে সে হেঁটে যায়। বাঁশি শুনে শ্রীকান্তের মন মুগ্ধ হল এবং ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাব করবার ইচ্ছা হল। জানতে পারল ইন্দ্র পণ্ডিতমশায়ের শিখা কেটে দেবার কারণে প্রাপ্ত শাস্তির ভয়ে ঘৃণাভরে স্কুল ছেড়ে এসেছে; আর ফিরে যায়নি। স্কুল ছেড়ে দিয়ে সে শুধু নিজের ছোট ডিঙি নৌকা নিয়ে গঙ্গার বুকে একা ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে দশ পনেরো দিন সে নিরুদ্দেশ হয়ে থাকত।

শ্রীনাথ বহুরূপীর কীর্তি : শ্রীকান্তরা কয়েকভাই মেজদার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করত। ভাইদের পড়ার সময়ে দাদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন যাতে কেউ অকারণ সময় নষ্ট না করে। এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় সকলে পড়াশুনা করছিল। হঠাৎ পিঠের কাছে 'হুম' শব্দে মেজদা বিকট শব্দ করে মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চারদিকের অন্ধকারে এক গোলমাল বেধে গেল। সকলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে নানাদিকে ছুটল। ভট্টাচায্যিমশাই দৌড়ে পালাতে গিয়ে চোর সন্দেহে প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। শোনা গেল একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখে সকলের এই অবস্থা। ভয়ে কেউ সাহস করে এগোতে পারেনি। সে সময় আচমকা ইন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত হয়ে দেখল সেটা কোনো বাঘ নয়— শ্রীনাথ বহুরূপী। প্রতিবছর সে যেমন বহুরূপী সেজে খেলা দেখায়, এবার সে বাঘ সেজে খেলা দেখাতে এসেছিল। এমন ঘটনা যে ঘটে যেতে পারে, একথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। তখন তাকে সকলে মিলে যথেষ্ট শাসন করেছিল। তার দীর্ঘ লেজ কেটে রেখে তাকে বিদায় দেওয়া হল। এরপর ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে মাছ ধরতে যাবার আহ্বান জানিয়েছে। প্রবল আগ্রহে শ্রীকান্ত কোনো কথা না ভেবে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যাত্রা করেছে।

: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযান :—ইন্দ্রনাথ ছোট ডিঙি নিয়ে কোণাকুনি পাড়ি দিচ্ছিল। গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথ ডিঙির হাল ধরে বসেছিল। এই অবস্থায় ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীকান্তর ভয় করে না জেনে সে খুশি হয়েছিল। রাতের বৃষ্টিতে বালির পাড় ভাঙার শব্দ পাওয়া গেছিল। ইন্দ্রনাথের নির্দেশে শ্রীকান্ত দাঁড় টানতে লাগল। ইন্দ্রনাথ দূরে চড়া দেখিয়ে বলল, এর ভেতর দিয়ে ডিঙি বার করে নিয়ে যেতে হবে। জেলেরা টের পেলে লগির আঘাতে তাদের মেরে পুঁতে ফেলবে। কেউ খোঁজও পাবে না। শ্রীকান্ত অন্য পথে যাবার কথা বললে ইন্দ্রনাথ জানিয়েছে এপথেই যেতে হবে। কথা বলতে গিয়ে ডিঙিটি পাক খেয়ে ঘুরে গেলে ইন্দ্র ওকে কাপুরুষ বলেছে। শ্রীকান্ত তখন বিষণ্ণ মনে নৌকা বেয়ে চলল। ইন্দ্র তাকে বলেছিল যে, এমন কৌশলে তার নৌকাটি ভুট্টা-জনারের খেতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে যে ওরা টেরও পাবে না।

তবে একথাও বলেছিল, যদি টের পায় তবে নৌকা ফেলে গঙ্গায় ডুব দিয়ে ছয়-সাত ক্রোশ দূরে সতুয়ার চড়ায় উঠে সেখান থেকে ভোর বেলায় এপারে এসে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরা যায়। ইন্দ্রনাথের কথা শুনে শ্রীকান্ত হতবুদ্ধি। অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী ও শক্তিশালী না হলে কারো পক্ষে এভাবে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব। ইন্দ্রনাথ বলেছে এর আগে সে অনেকবার এরকম ডিঙি ফেলে চলে গেছে। পরদিন সকালে এসে জেলে মাঝিদের নিকট হতে নিজের ডিঙি চুরি গেছে বলে কেড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

দেখা গেল দুজন ডিঙি নিয়ে খাঁড়ির মুখে জেলে নৌকাগুলির নিকটে পৌঁছে গেছে। দুধারে বালির চড়ার মাঝের খাল ধরে গন্তব্যে পৌঁছে গেল। নদীবক্ষে জেলেদের পাতা বিশাল জালে বড় বড় রুই-কাতলা ধরা পড়েছে। এখানে পাহারা নেই বলে ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি পাঁচ-ছয়টি রুই-কাতলা তুলে নিজের ডিঙিতে রেখে দিল। দ্রুত তারা ডিঙি ভাসিয়ে অনুকূল স্রোতে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটি ভুট্টা

খেতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে জানাল, জেলেরা টের পেয়েছে। জেলেরা চারটি ডিঙা নিয়ে ছুটে আসছে তাদের দিকে। ভীত শ্রীকান্তকে সাহস দিয়ে তারা ভুট্টা খেতের গভীরে প্রবেশ করেছে। ইন্দ্রনাথ নৌকা হতে নেমে গিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে ডিঙি টেনে নিয়ে চলেছে। সেখানে বনের মাঝে ক্যানেস্ত্রা পেটানোর শব্দ ও চেরা বাঁশের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এরই মধ্যে শ্রীকান্ত দেখেছিল ভুট্টা জনারের ডগা থেকে খসে পড়ছে একের পর এক সাপ যা দেখে শ্রীকান্ত ভয়ে শিউরে উঠেছিল। ইন্দ্রনাথ নির্ভীক, তার গা ঘেঁষে সাপ চলে গেলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে শুধু বলেছিল, 'মরতে তো একদিন হবেই ভাই'।

ইন্দ্রনাথের অসাধারণ সাহসিকতায় শ্রীকান্ত বিস্মিত। শ্রীকান্ত নীরবে ভয়ার্ত চিত্তে নৌকায় বসে ভয়াবহ বিপদের কথা চিন্তা করছিল। ইন্দ্রনাথ এই বিশাল হৃদয়ের অধিকারী কীভাবে কোথা থেকে হতে পারল তা ভেবে কুল কিনারা করতে পারল না। একসময় তাদের নৌকাটি বড় নদীর স্রোতে পড়লে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল।

: তৃতীয় পরিচ্ছেদ :

ইন্দ্রনাথের মানবিকতা :—দীর্ঘ রাতের পরিশ্রমে শ্রীকান্ত ক্লান্তি বোধ করলে ইন্দ্রনাথ নৌকার পাটাতনে তার ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠে সে দেখে, নৌকা গঙ্গার বুকে কোনাকুনি পাড়ি দিচ্ছে। আবার খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে দেখল নৌকা পাড়ে বাঁধা। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে নৌকায় বসিয়ে রেখে তীরে নেমে গেছে। সাবধান করে বলেছে কেউ মাছ চাইতে এলে যেন না দেয়। এতে শ্রীকান্তর একটু ভয় হয়েছিল। খানিক বাদে ইন্দ্রনাথ ফিরে, সঙ্গে আসা দু-তিন জন লোককে কিছু টাকার বিনিময়ে মাছগুলি দিয়ে দিল। ইন্দ্রনাথের এই মাছ চুরির ঘটনায় শ্রীকান্তের মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ জানতে চাইল নৌকায় বসে থাকবার সময়ে তার ভয় করছিল কী না। শ্রীকান্ত ভয় না পাওয়ার কথা বললে, সে বলেছিল, রামনাম জপ করলে সব ভয় চলে যায়।

এরপর তাদের নৌকা এক প্রাচীন বটগাছের পাশে সরু ঘাটে থামিয়েছিল। সেখানে বাতাসের সঙ্গে পচা গন্ধ পেয়ে শ্রীকান্তকে বলেছিল, চারিদিকে গ্রামে কলেরায় অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। মানুষের মৃতদেহ পচে এরকম গন্ধ ছড়াচ্ছে। এবার ইন্দ্রনাথ তীরে নেমে একজনকে সেই টাকা ক'টি দিয়ে আসার কথা জানিয়েছে। তীরে একটি শিশুর মৃতদেহ দেখে ইন্দ্রনাথ সেটিকে চড়ার উপর ঝাউবনে রেখে দিল। শেষ রাতের দিকে শ্রীকান্ত বেশি ভয় পেল। সে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ভোরের আলো দেখতে পেল। ইন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতার ছবি এভাবে প্রথম পর্বের কাহিনিতে ধরা পড়েছে।

: চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

অন্নদাদিদি ও শাহজীর কথা :—শ্রীকান্ত সারারাত অন্ধকারে কাটিয়ে সকালবেলায় বাড়ি ফিরে এসেছে। তাকে দেখে বাড়ির সকলে হৈ-চৈ শুরু করে দিল। মেজদা তার শাস্তির বিধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পিসিমা শ্রীকান্তকে দেখে খানিকটা অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তার মুখ কালিবর্ণ, চোখ ছলছল। গায়ে

হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন গায়ে জ্বর-জ্বর ভাব আছে। মেজদার শাসন থেকে মুক্তি দিয়ে পিসিমা শ্রীকান্তকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেছেন। এমনকি পিসিমার ধমকে মেজদা জড়সড় হয়ে গেছে। সে রাত্রি থেকে শ্রীকান্ত অসুস্থ হয়ে সাত আট দিন জ্বরে শয্যাগত থাকল।

বহুদিন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা নেই। আবার এক শনিবারে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। ইন্দ্রনাথ তখন একটি ছিপ দিয়ে নালায় মাছ ধরছিল। শ্রীকান্তকে কাছে ডেকে বলল, তার অসুখের খবর পেয়ে সে খুব কষ্ট পেয়েছিল। মা-কালীর কাছে সে প্রতিদিন তার আরোগ্য কামনা করেছে। এরপর সে বলল যে, এখন সে রাতে আর মাছ চুরি করতে যায় না। একজন তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে মাছ চুরি করতে বারণ করেছে। শ্রীকান্তর কাছে পাঁচ টাকা চেয়েছে একজনকে দেবে বলে। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ নিজে টাকা দিতে চাইলে, সে মায়ের বাক্সের টাকা চুরি করেছে সন্দেহে সেই টাকা নিতে চায়নি ইন্দ্রনাথ। তাই সে একদিন শ্রীকান্তকে দিদির কাছে যেতে অনুরোধ করেছিল। শ্রীকান্ত যেতে সন্মত হলে অন্নদাদিদি ও শাহজীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে।

পরের দিন রবিবার ছিল বলে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে বনের মধ্যে এক ভাঙা কুটিরে হাজির হল। নিবিড় জঙ্গলের মাঝে উঠোনের উপর এক বিরাট অজগর সাপ দেখতে পেল। পাতার কুটিরের বারান্দায় বসে একজন দীর্ঘকায় মানুষ কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে উঠছিল। ইন্দ্র তাকে শাহজী সম্বোধন করে ডাকল। তার সামনে গাঁজার সরঞ্জাম। ইন্দ্রনাথ তাকে গাঁজার কল্কে সেজে দিত। শাহজী গাঁজা টানতে টানতে খানিকক্ষণ গালাগাল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তখন সাপখেলা দেখাবার জন্য ইন্দ্র একটি ঝাঁপি খোলে। সেটি খোলামাত্র ঝাঁপি হতে বেরিয়ে এল এক বিরাট গোখরো সাপ। সাপটি ঘরে প্রবেশ করলে ইন্দ্রনাথ খুব ভয় পেয়েছিল। সে সময় অন্নদাদিদি সেখানে চলে আসায় তারা রক্ষা পেল। অন্নদাদিদির পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানের মতো জামাকাপড় কিন্তু মাথায় হিন্দু সধবার মতো সিঁদুর পরা ছিল। দিদি অতি দ্রুত ঘরের ভেতরকার সাপটিকে ধরে এনে ঝাঁপিতে পুরে দিয়েছিল। তখন ইন্দ্রনাথ দিদিকে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে।

: পঞ্চম পরিচ্ছেদ :

ইন্দ্রনাথের ক্রোধ :—অন্নদাদিদি ইন্দ্রকে সস্নেহ তিরস্কার করে ভবিষ্যতে এরকম কাজ করতে বারণ করল। ইন্দ্র একটি শিকড় বের করে দেখিয়ে বলল, এই শিকড়টি ছিল বলে সে সাপখেলা দেখাতে সাহস করেছিল। ইন্দ্রের ধারণা এই শিকড় সঙ্গে থাকলে তাকে সাপ কামড়াবে না। আর কামড়ালেও কোন ভয় নেই। শাহজীকে ডেকে বিষ-পাথর লাগিয়ে বিষ টেনে বার করে নিত। তার ধারণা অন্নদাদিদিও সর্পবিদ্যায় পারদর্শী। তিনিও মড়া বাঁচানোর ও সাপকে বশীভূত করার মন্ত্র জানেন। তাই অন্নদাদিদির কাছে ইন্দ্রনাথ একটি বিষ-পাথর চেয়েছিল। কিন্তু দিদি যখন বলেছিলেন তিনি এসব কিছু জানেন না তখন ইন্দ্রের খুব রাগ হয়েছিল।

ইন্দ্রনাথ এতদিন সর্পবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র শেখার জন্য দিদি ও শাহজীকে সাহায্য করে এসেছে। কিন্তু আজ সে অনুভব করল জগতে সবই ফাঁকি। এমনকি রাগের বশে ভাবল, সাপুরেরা এরকমই ঠকবাজ। লোক

ঠকানো তাদের ব্যবসা। দিদির একথা শুনে ইন্দ্র রাগ করে শ্রীকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। শ্রীকান্ত যে পাঁচটি টাকা এনেছিল অন্নদাদিদির জন্য, তাও দিতে দিল না। গোলমালে শাহজীর ঘুম ভেঙে গেছে। ইন্দ্রনাথ তাঁর সামনে গিয়ে খুব একচোট গালাগালি করেছিল। শাহজী এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, তাঁর কানাকড়িও বিদ্যা নেই— লোক ঠকানো তার ব্যবসা। অন্নদাদিদি সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে। তাই শাহজী অন্নদাদিদিকে প্রচণ্ড মেরেছে। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ বের হয়ে যাবার সময় কান্না শুনে আবার ভেতরে গিয়ে দেখেছে দিদি মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

শাহজী ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে তখন একখণ্ড মল্লযুদ্ধ বেধে গেছে। শ্রীকান্ত উভয়কে আলাদা করে দিয়েছে। দেখা গেল বর্শার আঘাতে ইন্দ্রনাথ আহত হয়েছে। শাহজীও আঘাতে বিধ্বস্ত। শ্রীকান্ত ইন্দ্রের ক্ষতস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। শাহজীকে বিশ্বাস নেই বলে ইন্দ্র শাহজীর পাগড়ি দিয়ে তাঁর হাত বেঁধে রেখেছে। জলের ঝাপটায় দিদির জ্ঞান ফেরার পর শাহজীর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে ঘরে গিয়ে শুতে বলেছে। ইন্দ্রনাথকে এখানে না আসতে অনুরোধ করেছিলেন। এতে ইন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে অন্নদাদিদিকে গালাগালি দিয়ে শ্রীকান্তকে নিয়ে বাইরে বেরোলেও ওকে ফেলে চলে গেল।

: ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :

অন্নদাদিদির বিদায় :—একাকী শ্রীকান্ত অভিমান করে অনেকদিন ইন্দ্রের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখল না। এভাবে তিন চার মাস কাটিয়ে একদিন দত্তদের বাড়িতে থিয়েটার দেখার সময় দুজনের সাক্ষাৎ হল। ইন্দ্র জানাল অন্নদাদিদি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। শ্রীকান্ত আবার ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্নদাদিদির বাড়িতে উপস্থিত হল। সেখানে দেখতে পেল শাহজী দিদির কোলে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। পাশে একটি গোখরো সাপ। জানা গেল এই সাপের কামড়ে শাহজীর এবং সাপটির মৃত্যু হয়েছে। এরপর দিদির কথামতো দুজন মিলে মরদেহ মাটি চাপা দিলে দিদি কাঁদতে লাগলেন। তখন দিদি হাতের নোয়া জলে দিয়ে, চুড়ি ভেঙে বিধবার বেশ ধারণ করলেন। এতদিন বাদে ইন্দ্র জানতে পারে শাহজী দিদির স্বামী ছিলেন। অনেক অত্যাচার করলেও তারা একসঙ্গে থাকতেন।

ইন্দ্র দিদিকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে দিদি বলেন, স্বামীর ঋণ শোধ না করে তিনি কোথাও যাবেন না। দিন তিনেক বাদে শ্রীকান্ত জানতে পারে দিদি তার জন্য একটি চিঠি লিখে রেখে কোথাও চলে গেছেন। ইন্দ্র সেটি শ্রীকান্তকে পৌঁছে দিল। চিঠি পড়ে শ্রীকান্ত জানতে পারে অন্নদাদিদি ধনীর ঘরের মেয়ে। তার স্বামী নিজের বিধবা বড় বোনকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। বছর ছয়েক বাদে সাপুরের বেশে গ্রামে এসেছিলেন। স্বামীর ঋণ পরিশোধ হওয়ায় তিনি চলে যাচ্ছেন। বড় রাস্তার ধারে মুদির দোকানে শ্রীকান্ত'র পাঁচটি টাকা গচ্ছিত আছে।

: সপ্তম পরিচ্ছেদ :

নতুনদাদার কীর্তি :—বিষণ্নমনে শ্রীকান্ত মুদির দোকানে যেতেই পাঁচ টাকাটি দিয়ে দিল। বহুদিন আবার দুজনের দেখা নেই। এক শীতকালে ইন্দ্র এসে কোনো এক গ্রামে থিয়েটারের সংবাদ দিল। ইন্দ্র

জানাল, কলকাতা থেকে ইন্দ্রনাথের নতুনদাদা এসেছেন। তিনি সেখানে হারমোনিয়াম বাজাবেন। শ্রীকান্ত উৎফুল্ল চিত্তে নতুনদাদার সঙ্গে গ্রামে যেতে রাজি হল। দাদার গায়ে ওভারকোট, পায়ে পাম্প-সু, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ, মাথায় টুপি। ডিঙিতে উঠেই তিনি শ্রীকান্তকে তামাক সাজতে হুকুম দিলেন। একটু বাদে শ্রীকান্তর গায়ের চাদর নিয়ে পাটাতনে পেতে বসে পড়লেন। এদিকে পালে বাতাস কমে যাওয়ায় নতুনদাদা শ্রীকান্তকে দাঁড় টানতে আদেশ দিলেন। বিপদ বুঝে ইন্দ্রকে বললেন গ্রামে পৌঁছাতে না পারলে থিয়েটারে কেউ হারমোনিয়াম বাজাতে পারবে না। তাই দুই বন্ধুতে গুণ টেনে চলল। নতুনদাদা একটুও সাহায্য করল না, গ্যাঁট হয়ে নৌকায় বসে রইল।

রাত এগারোটা নাগাদ নতুন দাদার খিদে পেল। একটি ঘাটে নৌকা থামিয়ে খাবারের সন্ধানে গ্রামে গিয়ে কিছু পাওয়া গেল না। ফিরে এসে দেখল দাদা ডিঙায় নেই। অনুমান করল দাদাকে বাঘে নিয়ে গেছে। দুই বন্ধুতে দাদাকে খুঁজতে গিয়ে দেখেছে অদূরে বালির ঢিপি পারে নতুনদাদা জলের মঝে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুকুরের চিৎকার শুনে বাবু একেবার চুপসে গেছে। ইন্দ্রনাথ তাকে জল থেকে তুলে এনে ডিঙিতে তুললে পাম্প সু'র খোঁজ করলেন। অন্যান্য জামা কাপড়ের জন্য শোকে কাতর হয়ে শেষে শ্রীকান্তের চাদর গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

: অষ্টম পরিচ্ছেদ :

পিয়ারী বাইজী ও শ্রীকান্তের পরিচয় :—ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। যৌবনপ্রাপ্ত শ্রীকান্ত এখন লেখাপড়া ছেড়ে নানা উচ্ছৃঙ্খলতায় দিন কাটাচ্ছে। বিহারের এক রাজার ছেলে কুমার সাহেবের আমন্ত্রণে শিকার পার্টিতে যোগ দিয়েছে। বন্ধুর আয়োজনে এক সঙ্গীতের আসরে পিয়ারী বাইজী সুন্দর গান গেয়েছিল। শ্রীকান্ত মন ভরে সেই গান শুনেছিল। পরদিন বাইজী তাকে এখান থেকে চলে যেতে বললে শ্রীকান্ত শোনেনি। সকালবেলায় কুমার সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে অবস্থা সুবিধাজনক নয় বলে তাঁবুতে ফিরে এসেছিল। বাইজীর খানসামা রতনের কাছে-পাঠানো খবরে শ্রীকান্ত তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তাঁবুতে শ্রীকান্তকে পরিবার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছে। তখন সে বাইজীর পরিচয় জানতে চেয়েছে। পরিচয় না পেয়ে পিয়ারীর উপর রাগ করে সে তাঁবুতে ফিরে চিন্তিত হয়েছিল।

শিকার ও পিয়ারীর গান শুনে শ্রীকান্তর তিন-চার দিন কেটে গেল। কিন্তু পিয়ারী সম্পর্কে শ্রীকান্তর কোনো কৌতূহল জন্মাল না। একদিন কুমার সাহেবের তাঁবুতে ভূতের গল্প হচ্ছিল। এক প্রবীণ বলেছিলেন, যার ভূতে অবিশ্বাস আছে তিনি আজ গ্রামের মহাশ্মশানে গিয়ে ভূত দেখে আসতে পারেন। শ্রীকান্ত ভূতে অবিশ্বাস করত; তাই সে অমাবস্যার রাতে মহাশ্মশানে নির্দ্বিধায় যেতে চেয়েছে। ঠিক হল সে রাতেই তারা মহাশ্মশান অভিযান করবে। শ্রীকান্তের মনে এল বালবিধবা নিরুদিদির মৃত্যুর কথা। মৃত্যুর সময়ের চিৎকারে শ্রীকান্ত ভয় পেয়েছিল। এসব ভাবনার মধ্যে আবার পিয়ারী ডেকে পাঠাল। তাঁবুতে প্রবেশ করা মাত্র বাইজী শ্রীকান্তকে আজ শ্মশানে যেতে নিষেধ করেছে। শ্রীকান্ত গেলে বাইজীও তার সঙ্গে শ্মশানে যেতে চাইল। দুজনে দুজনের অধঃপতনের কথা ভেবে বিস্মিত হচ্ছিল।

কথাবার্তায় জানা যায় পিয়ারী শ্রীকান্তকে চিনতে পেরেছে। তার নাম রাজলক্ষ্মী এবং সে শ্রীকান্তের বাল্যসঙ্গিনী। শৈশবে কুল রক্ষার জন্য রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর বিয়ে হয়েছিল এক পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে। সত্তর টাকা পণ নিয়ে বিয়ে করে দেশে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। বছর দেড়েক পর সুরলক্ষ্মীর মৃত্যু হলে রাজলক্ষ্মী ভাগ্যের সন্ধানে কাশীতে গান বাজনা শিখে বাইজী হয়েছে। রাজলক্ষ্মীর নিষেধ না মেনে শ্রীকান্ত একাকী শ্মশানের দিকে রওনা হল। মহাশ্মশানের প্রবেশ মুখে শ্রীকান্ত অসংখ্য মড়ার মাথার খুলি ও নরকঙ্কাল দেখতে পেয়েছিল।

শ্রীকান্ত একটি বালির ঢিপির উপর বসে দমকা বাতাসে অসংখ্য প্রেতাত্মার দীর্ঘনিঃশ্বাস অনুভব করেছিল। ঠিক তখন কয়েকজন মানুষের চিৎকার শুনে শ্রীকান্তর মনে হয় রতনের গলার আওয়াজ। দেখা গেল রতন ও তিনজন লোক টাকার লোভে এখানে এসে শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মীর তাঁবুতে নিয়ে যেতে এসেছিল। তখন রাত তিনটে। শ্রীকান্তর মন রাজলক্ষ্মীর কাছে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে নিজের তাঁবুতে ফিরে গেল।

: নবম পরিচ্ছেদ :

কুমার সাহেবের তাঁবুতে :—পরদিন সকালে কুমার সাহেবের তাঁবুতে সকলে শ্মশানের গল্প শুনতে হাজির। কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীকান্ত তাঁবুতে প্রবেশ করলে সকলে তাকে হৈ-চৈ করে অভ্যর্থনা জানাল। কুমারসাহেবের প্রশ্নে শ্রীকান্ত জানিয়েছে, গত রাত্রে শ্মশানে ভূতপ্রেত কিছু দেখতে পায়নি। কেবল মড়ার মাথার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছে। শ্রীকান্ত নিজের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। রাজলক্ষ্মী সব শোনার পর কুমার সাহেবের কাছে বিদায় নিল। তখন শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখে বিস্মিত হয়েছিল। শ্রীকান্ত ভেবেছিল রাজলক্ষ্মী তাকে খবর পাঠাবে। কিন্তু কোনো খবর না পেয়ে সন্ধ্যায় শ্রীকান্ত সরসীবাঁধের ধার দিয়ে চলতে গিয়ে ধূলাবালিতে বসে রইল।

: দশম পরিচ্ছেদ :

শ্মশানের রূপ ও পিয়ারীর বিদায় :—ধূলাবালির উপর বসে শ্রীকান্ত মহাশ্মশানে রাত্রির রূপ দেখতে লাগল। সে এই গভীর রাতে যেন কারো ধ্যানে নিমগ্ন। বিশ্বচরাচরের নিস্তব্ধতায় শ্রীকান্ত আঁধারের রূপ দেখছে। কিছু সময় বাদে অন্ধকার হালকা হলে একজন মানুষ এসে শ্রীকান্তকে ডেকে নিয়ে গেছে রাজলক্ষ্মীর কাছে। শ্রীকান্ত বুঝতে পেরেছিল রাজলক্ষ্মী তার দলবল নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। শ্রীকান্ত তার কাছে উপস্থিত হলে তাকেও দেশের বাড়ি চলে যেতে বলেছে। শ্রীকান্ত কথা দিয়েছে আজ বেলা বারোটার আগে সে এই স্থান ত্যাগ করবে। রাজলক্ষ্মী হাতের আংটি খুলে শ্রীকান্তের পায়ের উপর রেখে প্রণাম করেছিল। তারা চলে গেলে শ্রীকান্ত তাঁবুতে ফিরে এসেছিল।

: একাদশ পরিচ্ছেদ :

গৌরী তেওয়ারীর কন্যা, সাধু ও রামবাবুর কথা :—রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়ে শ্রীকান্ত বাড়ি ফিরে এল। অথচ বাড়িতে মন না বসায় একদিন পাটনার দিকে রওনা হল। কিন্তু মাঝপথে 'বাড়' স্টেশনে নেমে

গ্রামে ঢুকে এক সাধুর ডেরা দেখতে পায়। সাধুকে শ্রীকান্ত প্রণাম করলে সেখানে তাকে থেকে যেতে বলে। শ্রীকান্ত গেরুয়া বেশে সাধুর চেলাগিরি শুরু করে দিল। দিন পনেরো বাদেই সাধু বিঠৌর গ্রামে চলে গেলে শ্রীকান্তকেও সেখানে যেতে হয়। একদিন সেখানে ভিক্ষা করবার সময়ে গৌরী তেওয়ারীর বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটির আদি বাড়ি বর্ধমানের রাজপুরে। হিন্দুস্থানী বলে বাংলাদেশে বর না পেয়ে বিহার প্রদেশে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচার আচরণে ও কথাবার্তায় মেয়েটি খাঁটি বাঙালি। বিহারী পরিবারের আচার-সংস্কারের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না বলে শ্রীকান্ত'র কাছে বাবার বাড়িতে খবর পাঠানোর আবেদন জানায়। শ্রীকান্ত পাড়ার মুদির দোকানে সব শুনে বর্ধমানের গৌরী তেওয়ারীকে চিঠি পাঠিয়েছিল।

এরপর সাধু আবার 'ছোট বাঘিয়া'তে তাঁবু ফেললেন। সেখানে বাঙালি রামবাবু ও তার পত্নী পুত্র নিয়ে বাস করতেন। কিন্তু গ্রামে বসন্ত মহামারী দেখা দিয়েছে। রামবাবুর দুই ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে শ্রীকান্ত তাদের সেবা করে। পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল বলে রামবাবুর স্ত্রী শ্রীকান্তকে দাদা বলে ডাকত। একদিন শ্রীকান্ত অসুস্থ হয়ে পড়লে রামবাবুর পরিবার তাকে ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। শ্রীকান্ত অনেক কষ্টে একটি গোরুর গাড়ি করে আরা স্টেশনে পৌঁছেছিল। সেখানে এক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে পাটনায় রাজলক্ষ্মীর নিকট চিঠি পাঠায়। তখন রাজলক্ষ্মী সতীন পুত্র বঙ্কুর সাহায্যে শ্রীকান্তকে পাটনা নিয়ে গেল।

: দ্বাদশ পরিচ্ছেদ :

পাটনায় শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর মহনীয়তা :—শ্রীকান্তকে পাটনায় নিয়ে গিয়ে পরম সেবা যত্নে রাজলক্ষ্মী সুস্থ করে তুলেছে। একদিন শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর বাড়িঘর ঘুরে দেখেছে, তার ঘরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাই। শ্রীকান্ত আরাম করে রাজলক্ষ্মীর বিছানায় বসে রয়েছে। রাজলক্ষ্মী স্নান করে তা দেখে অন্যত্র চলে গেছে। খানিক বাদে ফিরে এসে তারা অনেক কথা বলেছে। কৌশলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, শ্রীকান্ত যখন সুস্থ হয়ে গেছে তখন আর এখানে বেশিদিন থাকবার প্রয়োজন নেই। শ্রীকান্ত রসিকতার ঢঙে এ আরাম ছেড়ে না যাবার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী জানিয়েছে, এখানে সতীন-পুত্র মাঝে মাঝেই চলে আসে বলে এখানে বেশিদিন থাকা ঠিক হবে না।

শ্রীকান্ত এবার রাজলক্ষ্মীর মধ্যে মাতৃত্বের একটি রূপ স্পষ্ট দেখতে পেল। বঙ্কুকে আশ্রয় করে তার মনে মাতৃত্বের যে বোধ জেগে উঠেছে তার অমর্যাদা সে হতে দেবে না। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর কামনা দুর্নিবার বেগে একমুখী হলেও 'বঙ্কুর মা' তাদের সম্পর্কের মাঝে শক্ত প্রাচীর তুলে দিয়েছে। সন্ধ্যায় শ্রীকান্ত'র প্রচণ্ড মাথাব্যথায় 'ওডিকোলন' লাগানো হয়নি বলে রতনকে বকাঝকা করেছে। রাজলক্ষ্মীর উদাসীনতার কথা ভেবে রাতে শ্রীকান্তের ঘুম হয়নি।

গভীর রাতে রাজলক্ষ্মীর হাতের স্পর্শে ঘুম ভেঙেছে শ্রীকান্তর। মশারীর ভেতর হাত দিয়ে সে কপালের তাপ পরীক্ষা করেছে। এদিকে বুকের উত্তাপ অনুভব করেও সে নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

শ্রীকান্ত তখন জ্বরের অনুভব নিয়েই পাটনা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শরীরের কথায় শ্রীকান্ত জানিয়েছে, সে ভালো আছে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বাড়ি ফিরে চিঠিতে সংবাদ জানাতে বলেছে। শ্রীকান্ত রাজি হয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেছে। রাজলক্ষ্মী বারান্দায় একাকী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। শ্রীকান্ত বুঝতে পেরেছিল, বড় প্রেম মানুষকে মাঝে মাঝে দূরেও ঠেলে দেয়। মনে মনে ভাবল রাজলক্ষ্মী তাকে যে জীবন দান করলেন তা আর কোনো অবস্থাতে হেলায় হারাতে চান না। তাই জীবনকে বাঁচানোর প্রেরণায় উপন্যাসের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে।

৩.৩ উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠন কৌশল

সাহিত্যসৃজনে আঙ্গিক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা সাহিত্যের গদ্যভাষা শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। সাধারণ গদ্যরচনা থেকে উপন্যাস সাহিত্য আঙ্গিকে পৌঁছাতে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। উপন্যাস সৃজনের ধারায় 'শ্রীকান্ত' নতুন আঙ্গিক ও গঠন কৌশলের সাক্ষ্য বহন করছে। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে তখন বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। তবে গঠন নিয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎচন্দ্রই প্রথম মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি কথাসাহিত্যে ফুটিয়ে তোলেন। এরাই শরৎ সাহিত্যের সিংহভাগ দখল করে রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের দেখে অতি সাধারণ মানুষ এদের চিনে ফেলেন। মানুষের আপনজন হয়ে তিনি মানুষের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন অমর কথাশিল্পীর আসন নিয়ে।

শরৎচন্দ্র মানুষের সাদামাঠা জীবনের বিচিত্রকথা ফুটিয়ে তুলেছেন নানা আঙ্গিকে। আলোচ্য 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আঙ্গিক কৌশলেও আমরা অভিনবত্বের স্বাদ পেয়েছি। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে তিনি কাহিনিকে আশ্চর্য সাবলীল গতি দান করেছেন। কাহিনির বিন্যাসে কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। কাহিনিতে ঘটনাগুলি স্বাভাবিকভাবে বিন্যস্ত করেছেন। পাঠ করলে মনে হয়, জীবনপ্রবাহের স্বাভাবিক গতিতে উপন্যাসের ঘটনাগুলি ঘটে গেছে। ঘটনাবিন্যাসের স্বাভাবিকতার কারণে পরিচ্ছেদের বিন্যাস অনেক সময়ে খানিকটা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। কাহিনির সরল স্বচ্ছন্দ গতি বজায় রাখতে চরিত্রগুলি এসেছে। প্রতিটি চরিত্র কাহিনির প্রয়োজন অনুসারে হাজির হয়েছে। অকারণে দীর্ঘসময় উপস্থিত থেকে কাহিনিকে ভারাক্রান্ত করেনি।

'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে মোট দুটি কাহিনি রয়েছে। একটি শ্রীকান্তের বাল্যকালের কাহিনি এবং অন্যটি তার যৌবনের কাহিনি। বাল্যকাহিনিতে আছে বালক শ্রীকান্তের জীবনের কয়েকটি ঘটনার বিবরণ। রয়েছে ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির পরিচয়। এদের কথায় সমৃদ্ধ প্রথম আটটি পরিচ্ছেদ। অবশিষ্ট চারটি পরিচ্ছেদে শ্রীকান্তের যৌবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

উপন্যাসের পরিচ্ছেদ বিন্যাসে লেখকের একটু অসতর্ক শৈথিল্য ও অমনোযোগী মানসিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। পাঠ করলে মনে হয় লেখক যেন এই রকম পরিচ্ছেদ বিভাজন সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না। খানিকটা নিয়মরক্ষার জন্যে এরকম বিভাজন করেছেন। আবার আমরা একথাও বলতে পারি

'শ্রীকান্ত'র মতো আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে এই পরিচ্ছেদ বিভাজনের প্রয়োজন ছিল না। এখানে শ্রীকান্তের বাল্যজীবনের ঘটনাসমূহ এত স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলেছে যে, পরিচ্ছেদ বিভাগের মাধ্যমে এদের আলাদা করে দেখাতে গিয়ে কাহিনির মূল সুর কেটে গেছে।

আমরা প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদের মধ্যে এই কথার সমর্থন খুঁজে পাব। যেমন প্রথম পরিচ্ছেদে ফুটবল খেলার মাঠে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের পরিচয়ে কাহিনি শুরু হয়েছে। এরপর রয়েছে রাতের আঁধারে গঙ্গা নদীতে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক মাছ চুরির কথা। উপন্যাসের প্রচলিত রীতি অনুসারে একটি পরিচ্ছেদে এই ঘটনাটি সম্পূর্ণ হতে পারত। কিন্তু তা না হয়ে ঘটনাটি শেষ হল চতুর্থ পরিচ্ছেদে। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে শুরু করে চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনেকটা জুড়ে এই ঘটনা বিস্তৃত হয়েছে। নিশীথ রাতের ঘটনাতে চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হতে পারত। কিন্তু তা না করে এর মধ্যে অন্নদাদিদির ঘটনা বর্ণনা শুরু হয়ে গেল। আবার এই ঘটনার বিস্তার চলেছে পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। মাঝে পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিভাজন যেন অসংগত বলে মনে হয়েছে। অর্থাৎ পরিচ্ছেদ বিভাজনের রীতি সব ক্ষেত্রে মানা হয়নি। এই কারণে মূল কাহিনির মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্নতা চোখে পড়ে। সুতরাং বলতে পারি শ্রীকান্তর বাল্যজীবনের বর্ণনা একটানা নিটোল কাহিনি হিসেবে ততখানি সার্থক হয়নি। পড়তে পড়তে মনে হয় ঘটনাগুলি যেন বিচ্ছিন্ন কতগুলি ঘটনার সমাহার। কিন্তু প্রথম আটটি পরিচ্ছেদের এই গল্পকথার বিবরণ থেকে আমরা বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশে রয়েছে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষী তথা পিয়ারী বাইজীর কাহিনি। যৌবন পর্বে কাহিনি গ্রন্থনের শিথিলতা অনেকটা কম আছে বলে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেমের সম্পর্ক নিবিড় রসরূপ লাভ করেছে। তবে এখানেও কাহিনি বিন্যাসে কিছু শিথিলতা রয়েছে। যেমন নবম ও দশম পরিচ্ছেদের ঘটনা একই সময়ের। এদের মধ্যে পরিচ্ছেদের বিভাজনের কোনো প্রয়োজন ছিল না বলে মনে হয়। আবার একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, শ্রীকান্ত প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিক উপন্যাস নয়। এই উপন্যাসের গঠন কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিষয় ও চরিত্রধর্মের দিক দিয়ে এটি একেবারে নতুন ধরনের উপন্যাস। এরকম নতুন প্রকরণের প্রকাশ করতে গিয়ে পরিচ্ছেদ ও ঘটনা বিন্যাসে শিথিলতা দেখা দিয়েছে।

উপন্যাস পাঠের পর আমাদের মনে হয়, অনেক পরে রচিত বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' উপন্যাসের মতো 'শ্রীকান্ত' ও যেন বিচিত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনার একটি চিত্রমালা। 'শ্রীকান্ত'তে শরৎচন্দ্র যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন। যেমন—শ্রীনাথ বহুরূপী ঘটনা, নতুনদাদার ঘটনা, সাধুর সাক্ষাতের ঘটনা, গৌরী তেওয়ারী কন্যা ও রামবাবুর ঘটনা ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হলেও যেন এক অদৃশ্য সুতোর বাঁধনে কাহিনির ঐক্য ফুটিয়ে তুলেছে। এছাড়া শ্রীকান্তর বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা প্রকাশে এগুলি অনেকখানি সহায়তা করেছে বলে মনে হয়। প্রখ্যাত সমালোচক সে কারণে লিখেছেন,—'শ্রীকান্ত উপন্যাসের কাহিনি অসাধারণ বৈচিত্র্য-মণ্ডিত, এবং অগণিত নরনারী ইহাতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা নিজেদের প্রয়োজনে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে। কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পর্ক নাই। ... শুধু পরিধির বিশালতা দিয়া বিচার করিতে গেলেও শ্রীকান্তের তুলনা

বিরল। অথচ পরম বিস্ময়ের কথা এই যে বৈচিত্র্যের মধ্যেও গ্রন্থকার তাহার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলেন নাই, কোন একটি ক্ষুদ্র কাহিনি বা কোন একটি বিচ্ছিন্ন চরিত্র তাহার সীমা অতিক্রম করে নাই। শুধু যে ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি তাহাদের জীবনের পরিসমাপ্তির সন্ধান দিয়া যায় নাই তাহাই নহে, অন্যান্য ক্ষুদ্রতর চরিত্রগুলিও এই সংযমের পরিচয় দিয়াছে।'

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চরিত্রসৃজন রীতিতে লেখক নূতনত্ব এনেছেন। শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, পিয়ারী প্রভৃতি চরিত্র বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। এরা শরৎচন্দ্রের জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তি থেকে উঠে এসেছে। বাইরে এদের যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, হৃদয়বোধের চেতনায় এরা প্রত্যেকে অসাধারণ। এছাড়া লেখকের আত্মজীবনের নানা অংশ চরিত্রদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। শ্রীকান্ত আপাতদৃষ্টিতে ভবঘুরে উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু এই পরিচয়ের আড়ালে আমরা খুঁজে পাই এক গভীর সহানুভূতিশীল প্রেমিক চরিত্রকে। ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক অভিযান, বেপরোয়া স্বভাব, প্রচণ্ড ক্রোধ, শাসনে বাঁধা-না-পড়া মানসিকতার মধ্যে রয়েছে এক আশ্চর্য মহাপ্রাণতা। কলঙ্কিনী, কুলত্যাগিনী পরিচয়ের আড়ালে অন্নদাদিদি এক অন্যতমা পতিব্রতা নারী। সে সতীত্বের আদর্শে উজ্জ্বল চরিত্র। পিয়ারী বাইজী তার বাইজীবৃত্তিতে যেমন পারদর্শী তেমনি তার নারীসত্তার মধ্যে রয়েছে মহনীয়তার রূপ। পবিত্র প্রেমের আদর্শ নিয়ে শ্রীকান্তের প্রতি গভীর অনুরাগে রঞ্জিত। আবার মাতৃত্বের দীপ্তিতে সে দীপ্তিময়ী নারী। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের এইসব বিচিত্র চরিত্রসমূহ বাংলা উপন্যাসে এক নতুন পথের সূচনা করেছে।

রচনারীতির দিক থেকে 'শ্রীকান্ত' প্রচলিত রীতির অনুসারী নয়। উপন্যাসের শুরু হয়েছে পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণা দিয়ে। জীবনের অপরাহ্নবেলায় পৌঁছে বাল্য ও যৌবনের দিকে ফিরে তাকানোয় উপন্যাসের কাহিনি গ্রন্থিত হয়েছে। স্মৃতির পাতায় জীবনের ছবি খুঁজতে গিয়ে গভীর আত্মসমীক্ষার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মজীবনের উপাদানের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবনদর্শন। লেখক এখানে নিজের জীবনকে নিরাসক্ত হয়ে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ভালোভাবে দেখতে গিয়ে ঘটনা সংস্থানের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন। জীবনকথার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শূন্যস্থানগুলি কল্পনার দ্বারা পূরণ করেছেন। তথ্যের সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করেছেন হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শে। এভাবে তিনি ভেতর ও বাইরের সামঞ্জস্যে যা সৃজন করেছেন তা একেবারে অভিনব হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের গঠনকৌশল নানা দিক থেকে অভিনব ও গতানুগতিকতা মুক্ত। বিষয় সৃজন, চরিত্র নির্মাণ, প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক সাহিত্যের রস আস্বাদনের স্বাদ দিয়েছে এই উপন্যাস। শরৎচন্দ্র যে পদ্ধতিতে এই অসামান্য উপন্যাস রচনা করেছেন তা সেকালের পক্ষে একন্ত নিজস্ব। প্রচলিত রীতিতে কাহিনি বর্ণনা না করে তিনি এমন বিশেষ রীতি বেছে নিয়েছেন, যার মাধ্যমে সমগ্র কাহিনিটি ঘরোয়া অন্তরঙ্গ আত্মজীবনী হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র শরৎ সাহিত্যে এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে এই বিশেষ ধরনের গঠনকৌশল এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই। উপন্যাসের উন্মেষলগ্নে এই ধরনের গঠন কৌশলের রীতি পরবর্তীকালের বাংলা কথাসাহিত্যের

ধারায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে। সে কারণে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের গঠন কৌশল ও আঙ্গিকের বিশেষত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৪ 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ভাষাশৈলী

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরে সাহিত্যচর্চায় যা রেখে গিয়েছেন তা এককথায় অভিনব। এই সৃজনকর্মে যে গদ্যভাষা সৃষ্টি করেছেন তা বাঙালি পাঠকের কাছে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। তিনি নিজের ভাষাশৈলী সম্পর্কে একটি সভায় বলেছিলেন, 'আমি ভাষা ভাল জানি না—Vocabulary কম—লোকের ভাল লাগে কেন, তা জানি না। যা বোঝাতে চাই, তা মনে রাখি তার জন্য অনেক পরিশ্রম করি। লেখা অনেক ঘষামাজা করতে হয়—স্বতঃউৎসের মত বেরোয় না। যারা বলে যা লিখে যাব তাই ভাল, তারা প্রকাণ্ড ভুল করে। মানুষের বলার মত লেখাতেও অনেক Irrelevant কথা থাকে সেদিকে নজর রাখতে হয়।' আসলে শরৎচন্দ্র নিজের গদ্যভাষা বিষয়ে সর্বদা সচেতন ছিলেন। প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের মতো তিনিও উপন্যাসের নিজস্ব ভাষা গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিটি উপন্যাস গল্পে সেই ভাষাশৈলী সচেতনভাবে প্রয়োগ করেছেন। সমকালের গদ্য লেখকদের গদ্যভাষার অন্ধ অনুসরণ তিনি করেননি। বিশেষত বঙ্কিমি গদ্যভাষাকে সচেতনভাবে পরিহার করতে তিনি তৎপর ছিলেন।

বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের জটিল সমস্যা রূপায়ণে যে ভাষার দরকার, তিনি সেই ভাষা লিখতে যত্নবান ছিলেন। প্রয়োজন অনুসারে তিনি সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে সমান দক্ষতায় প্রয়োগ করেছেন। সাধু ও চলিত গদ্য সম্পর্কে উদার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি গদ্যভাষা নির্মাণ করেছেন। শরৎচন্দ্র পূর্বকালের গদ্যশিল্পীদের গদ্যভাষা দক্ষতার গুণে আয়ত্ব করেছিলেন। সংস্কৃতের তৎসম শব্দবহুল ভাষা, রবীন্দ্রনাথের সুললিত শব্দঝংকার মিলিয়ে যে নিজস্ব গদ্যভাষা নির্মাণ করেছেন তা স্বচ্ছ, সাবলীল, আন্তরিক ও দৈনিক মানুষের ব্যবহার্য ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমালোচকের ভাষায়, 'শরৎচন্দ্রের গদ্যে প্রচলিত ভাষা প্রথম তাহার ন্যায্য আসন পাইয়াছে অথচ নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অতিক্রম করে নাই। তাঁহার ভাষা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভাষা, বর্ণবহুলতার জন্য তাহার চিত্র কোথাও তাহার সহজ মাধুর্য হারায় নাই। ... ভাষার ঐশ্বর্য কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যভাষার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে লক্ষণীয়। কাহিনি বর্ণনায়, চরিত্র সৃজনে, প্রকৃতি চেতনায়, আত্মসমীক্ষায় ও হৃদয় ভাবনার প্রকাশে শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষা অনন্য। প্রতিদিনকার জীবনে লেখক যে বিষয়গুলি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন সেগুলিকে সহজ সরল আন্তরিক ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযান, শ্রীনাথ বহুরূপীর কাহিনি, অন্নদাদিদির কাহিনি, পিয়ারী বা রাজলক্ষ্মীর কাহিনি বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে শরৎচন্দ্রের ভাষারীতির বিশিষ্টতা চোখে পড়বে।

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযানের কাহিনি শরৎচন্দ্র প্রকৃতিচেতনা সমৃদ্ধ গদ্যভাষায়, অপূর্ব ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেছেন। —'কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ ও পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। ... আমাদের নৌকা কোণাকুনি পাড়ি দিতেছে এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোনখানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না।' নিশীথ অভিযানের ভাষা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিবিড়তায়, স্বচ্ছন্দ আবেগের তীব্রতায় ও স্বতোৎসারিত কবিত্বের সরল আন্তরিকতায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। ভাষার এই প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—'আমাদের সাহিত্যে নৌযাত্রা বর্ণনার অভাব নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এই বিষয়ে অনেক কবিত্বপূর্ণ সূক্ষ্ম অনুভূতিময় বিবরণ আছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের বর্ণনা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়। ইহার মধ্যে কবিত্বের অভাব নাই, কিন্তু কবিত্ব ইহার প্রধান কথা নহে। ইহার মধ্যে যে অকুণ্ঠিত বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুর পাওয়া যায়, তাহা কবিত্বকে অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে।'

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের সহজ অথচ গভীর সংকেতময় ভাষা ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ভাষার মাধ্যমে তিনি পাঠকের মনে চরিত্রটির সমগ্র সত্তাটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশীর মতো নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই চারিটি বসন্তের দাগ। ... ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়তো নয়, কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই।' অন্নদাদিদির চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে লেখক শরৎচন্দ্র সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন—'আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রের দিদিকে দেখিলাম—যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিলেন। বাঁ কাঁকালে আঁটি বাঁধা কতগুলি শুকনা কাঠ এবং ডান হাতে ফুলের সাজির মতো একখানা ডালার মধ্যে কতগুলি শাকসব্জী।' পিয়ারী বাইজীর পরিচয় দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র সংকেতপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন—'বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গাহিতে জানে।' এই ছোট্ট বাক্যটি পিয়ারী চরিত্রের বহুল বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে।

শ্রীনাথ বহুরূপীর কাহিনিতে যে গদ্যভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তা যেন এক রহস্যঘন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত অনুভূতির প্রকাশ। বহুরূপীর আবির্ভাবে ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। ... অকস্মাৎ আমার পিঠের কাছে একটা "হুম" শব্দ, এবং একসঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চিৎকার—"ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেললে রে।" '

সব মিলিয়ে আমরা দেখলাম শরৎচন্দ্রের ভাষা কবিত্বমণ্ডিত। প্রকৃতি বর্ণনায়, আত্মসমীক্ষা বা উপলব্ধির প্রকাশে শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষায় রয়েছে কবিত্বের স্পর্শ। সুনির্বাচিত শব্দ চয়ন, ধ্বনিচেতনা ও

পরিমিতিবোধ তার ভাষাকে অপরূপ রসমূর্তি দান করেছে। নিশীথ অভিযানে অন্ধকারের রূপ বা উদ্দাম জলস্রোতের বর্ণনায় তিনি অসাধারণ ভাষা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্ধকাররের কথা বলতে গিয়ে যখন বলেন, 'বায়ুলেশহীন নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ, নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট কালীমূর্তি।' তখন আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না প্রগাঢ় অন্ধকারের স্বরূপ। একইভাবে শ্রীকান্তের মহাশ্মশান অভিযান কালেও রাত্রির ধ্যানমগ্ন মহিমান্বিত রূপ অপূর্ব ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রকৃতি বর্ণনাকালে কবিত্বপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে আর আত্মসমীক্ষা বা উপলব্ধির প্রকাশে সংহত ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশে তিনি সিদ্ধহস্ত শিল্পী। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে ইন্দ্রনাথের অসাধারণ সাহসিকতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় পেয়ে শ্রীকান্ত'র মন গভীরভাবে আন্দোলিত হয়েছে। সেকথায় লিখেছেন, 'কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদী পাহাড় পর্বত, বন জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকার মানুষ-ই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ তো আর কখনো দেখিতে পাই নাই।' অন্নদাদিদির সম্পর্কেও এরকম ভাষার প্রয়োগ করেছেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। পিয়ারীর সঙ্গে শ্রীকান্তর পরিচয় পর্বে শরৎচন্দ্র আবেগদীপ্ত ও ব্যঞ্জনাময় গদ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। নির্জন নিশীথে শ্রীকান্তর ঘরে রাজলক্ষ্মীর নীরব উপস্থিতি এবং তার শরীরের খোঁজ নিয়ে ফিরে যেতে বলার মধ্যে গভীর ভাবদ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখলেন, 'আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্তই বুঝিলাম। যে গোপনে আসিয়াছিল তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।' আবার পাটনার বাড়ি থেকে শ্রীকান্তের বিদায় কালে সুগভীর মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখেছেন, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'

শরৎচন্দ্র তার উপন্যাসে যে শব্দ চয়ন ও বাক্যবন্ধ নির্বাচন করেছেন তা অতুলনীয়। উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি অলংকারের সার্থক ব্যবহার করে আপন অন্তরের গভীর উপলব্ধির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর ভাষা স্বচ্ছ-সাবলীল। এই বিস্তৃত পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে ভাষা ব্যবহারের লঘুতা প্রায় নেই বললেই চলে। সব মিলিয়ে বলা যায়, শরৎচন্দ্র পূর্বকাল ও পরবর্তী কালের বাংলা গদ্যভাষার মধ্যে একটা প্রাণের আবেগ সঞ্চার করে দিতে পেরেছিলেন। সেকারণে জীবৎকালে ও উত্তর কালে শরৎ উপন্যাস-গল্পের পাঠক সংখ্যায় কেনো ভাটা পড়েনি। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব উপন্যাসের ভাষাও এরূপ বহু গুণে গুণান্বিত।

৩.৫ উপন্যাসে হাস্যরস ও কৌতুকরস

বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস বিষয়ক আলোচনা মূলত পাশ্চাত্যের রূপরীতির অনুসারী। ভারতীয় রসশাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে হাস্যরস অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে হাস্য ও কৌতুকরসের প্রকাশ বহু পূর্বকাল থেকে প্রচলিত। শরৎচন্দ্র সাহিত্য সৃজনে হাস্যরসকে গুরুত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের মনস্তত্ত্ব তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ঘটনা বিন্যাস ও চরিত্র সৃজনে কৌতুরস পরিবেশনের দক্ষতা ধরা পড়েছে। তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনাগুলির বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব পাঠকমনে

অনাবিল কৌতুকের প্রকাশ ঘটিয়েছে। কাহিনির প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীনাথ বহুরূপী ও সপ্তম পরিচ্ছেদে নতুনদাদার কীর্তিকলাপ প্রবল কৌতুকের সৃষ্টি করেছে। এক প্রবল বৃষ্টির সন্ধ্যায় পড়তে-বসা কয়েকজন বালকের সামনে হঠাৎ বাঘের বেশে শ্রীনাথের আগমন যে তুমুল ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি ছোট ছোট মজার ঘটনায় বর্ণনা করেছেন। গম্ভীর স্বভাবের মেজদা কেমন ভয়ে কাতর হয়ে বিকট শব্দে চিৎ হয়ে পড়ে ছিল, তা পাঠকমনে একই সঙ্গে ভয় ও হাসির উদ্রেক ঘটিয়েছে।

পিসেমশাইয়ের ছোটাছুটি, চিৎকার, চোর ভেবে ভট্টাচায্যি মশাইকে বেদম প্রহারের অন্যদিকে ঘটনা পাঠ করে আমরা নির্মল কৌতুকে আপ্লুত হয়েছি। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মানুষজনের কথাবার্তায় কৌতুকরস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ভট্টাচায্যি মশাই মার খাবার পর জ্ঞান ফিরলে কাতরস্বরে বলেন, 'বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।' অথবা চৈতন্য ফেরার পর মেজদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।' —এ সকল ছোট ছোট সংলাপে পাঠকের হাসি থামিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে। ভয় পেলে মানুষ কেমন শিশুর মতো অসহায় হয়ে পড়ে, সব সাহস ও কঠোর মনোভাব কর্পূরের মতো উবে যায়, তা কাহিনি পাঠ করে আমরা জানতে পারি। বাঘের কথা শুনে পিসেমশাই যখন বলেন,—'সড়কি লাও—বন্দুক লাও। ... "লাও" তো বটে কিন্তু আনে কে।' পিসিমাও তখন ভয়ে অস্থির। এই ভয়ঙ্কর-সুন্দর পরিস্থিতি বর্ণনা যেভাবে হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করেছে তা এক কথায় অভাবনীয়।

শরৎচন্দ্র যেসব বিষয়ে কৌতুকরসের ঘটনা সৃষ্টি করেছেন তাতে কোনো কৃত্রিমতা নেই। ঘটনাগুলি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে অনিবার্যভাবে এগুলি কৌতুকরসময় পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। শ্রীনাথ বহুরূপীর হঠাৎ আবির্ভাবে যে কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রকৃত কারণ জানার পর সেই পরিস্থিতি আরও বেশি কৌতুকবহ হয়ে উঠেছে। ভট্টাচায্যি মশায়ের রাগের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি, কারণ তাকেই দারোয়ানাদের হাতে চোর সন্দেহে মার খেতে হয়েছিল। লেখক জানিয়েছেন, 'ভট্টাচায্যি মশাই তাহার পিঠের উপর খরমের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দি বলিতে লাগিলেন, "এই হারামজাদা বজ্জাতকে ওয়াস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়ে কাঁঠাল পাকায় দিয়া"—। শ্রীনাথ বহুরূপীর আগমনের ঘটনায় পিসেমশাই ও পিসিমার কথপোকথনে মধুর কৌতুকের সৃষ্টি হয়েছে। পিসেমশাই শ্রীনাথের শাস্তি হিসেবে ল্যাজ কেটে রাখার হুকুম দিলে পিসিমায় ঠাট্টা করে বলেছে, "রেখে দাও; তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।'

উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দত্তবাড়িতে কালীপুজো উপলক্ষে 'মেঘনাদবধ' নাটকের অভিনয়ের আয়োজনের বর্ণনাও কৌতুকর। এখানে সংক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে বিষয়ের উপভোগ্যতা ও হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। সংলাপ ব্যতীত শুধু বর্ণনার মধ্যেও যে নির্মল কৌতুকরস সৃজন করা যেতে পারে, দত্তদের বাড়ির থিয়েটারের ঘটনাটি তার নিদর্শন। সেখানে শ্রীকান্ত সারাদিন নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে স্টেজ বাঁধতে সাহায্য করেছে। যিনি রামচন্দ্র সাজবেন তিনি তাকে একবার দড়ি ধরতে বলায় শ্রীকান্ত ধন্য হয়ে গেছে। রাতের অভিনয়কালে এর প্রতিদান পাবে বলে আশা করেছে। শ্রীকান্তের ভাষায়, 'রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের

ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব।' কিন্তু থিয়াটারের সময় রামচন্দ্র শ্রীকান্তকে একবারও চিনতে পারেনি বলে বিষণ্ণ মনে বলেছে— "অকৃতজ্ঞ রাম।" এছাড়া যে ব্যক্তি মেঘনাদ সেজেছিল তার বর্ণনাতে লেখক হাস্যোদ্দীপক এবং কৌতুকরস সৃজনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেই কৌতুকের বর্ণনা এরকম, 'মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড। তাহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সারে চার হাত। ... এমন সময় সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল ...।' মেঘনাদের এই ভয়াবহ আবির্ভাবে দর্শককুল ভীত সন্ত্রস্ত—কিন্তু মেঘনাদ আগাগোড়া অবিচলিত। তার কোমরবন্ধ ছিঁড়ে গেলেও সে বাঁ-হাতে পেন্টালুনের মুখ চেপে ধরে শুধু তীর দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। এই অসামান্য বীরের সামনে লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারেনি। যেখানে লক্ষ্মণের বিজয়ী হবার কথা, সেখানে লক্ষ্মণ অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র এভাবে ছোট ছোট ঘটনার দ্বারা যে কৌতুককর পরিবেশ সৃজন করেছেন তা পাঠকের খুব ভালো লেগেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদে নতুনদাদার কার্যকলাপে অনাবিল হাসির উদ্রেক ঘটিয়েছে। এক প্রবল শীতের রাতে কলকাতা শহর-থেকে-আগত বাবুসাহেবের আত্মঅহংকারের কী পরিণতি হয়েছিল তা উপন্যাসের পাঠক মাত্রেই জানেন। এখানে কৌতুকের আবহটি সম্পূর্ণরূপে চরিত্রভিত্তিক। যে-বয়সে এই যুবকের সরল ও উদার হবার কথা, তিনি যদি স্বার্থপর ও অহংসর্বস্ব মানুষ হন; তাহলে কীরকম হাস্যরস সৃষ্টি হতে পারে তা শরৎচন্দ্র সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। নতুনদাদার পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, আচার, আচরণ, সবই কৌতুক উদ্রেককারী। শরৎচন্দ্র নতুনদাদাকে নিয়ে ব্যঙ্গের চাবুক মারেননি; কিন্তু জীবনের সহজ সরল স্বাভাবিক পথ পরিত্যাগ করে কৃত্রিমতা অবলম্বন করলে তার পরিণামে যে হাস্যকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

নতুনদাদা কলকাতার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত যুবক। শিক্ষাদীক্ষায়-আভিজাত্যে-দম্ভে তিনি নিজেকে বড় ভেবে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথকে যেভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করেছিলেন; তাতে বিদ্যাবুদ্ধির অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণিত হয়েছে। রাতের অন্ধকারে গ্রামে দুই বালককে খাবার সংগ্রহের জন্য পাঠিয়ে বিবেকবুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এর মাঝে কুকুরের তাড়া খেয়ে অতি শীতল জলে পড়ে যাবার ঘটনায় নির্মল হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করেছে। নতুনদাদার চালচলনে, কথাবার্তায়, কৃত্রিম আভিজাত্যের পরিচয়ে একদিকে যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে; তেমনি পাঠককুলকে এই অহংসম্পন্ন মানুষদের সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন। হাস্যরসের মাধ্যমে এখনে তিনি সমাজশিক্ষা দিয়েছেন। মানুষের কাছে মানুষের দম্ভ যে কত অসার হতে পারে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই চরিত্রটি। এছাড়া পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের মধ্যেও মাঝে মাঝে সরল স্নিগ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। কুমার সাহেবের তাঁবুর নানা ঘটনা, সাধুবাবার আশ্রম ত্যাগ ও তার নির্দেশে ভিক্ষা করতে গিয়ে গ্রামের মানুষের কথাবার্তায় হাসির খোরাক পাওয়া যায়।

সব শেষে বলা যায়, বলতে পারি লেখক শরৎচন্দ্র কেবল কৌতুকরস সৃজন করে ক্ষান্ত হননি, সেই কৌতুকের মধ্যে দিয়ে পাঠকের মনের গভীর চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। হাস্যরস যে কেবল পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, তা যে নীতিশিক্ষা ও সমাজশিক্ষার অঙ্গ হতে পারে—একথাটি আমাদের আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের নানা ঘটনায় হাস্যরস ও কৌতুকরস যে আমাদের বিচিত্র স্বাদের যোগান দিয়েছে একথা সহজেই বলা চলে।

৩.৬ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে কটি পরিচ্ছেদ রয়েছে? সেখানে কী বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইন্দ্রনাথের মানসিকতা কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে দেখান।

৩. প্রথম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে কুমার সাহেবের তাঁবুতে কী ঘটেছিল।

৪. প্রথম খণ্ডের কাহিনি বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের ভাষাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করুন।

একক-৪ ❑ ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) : সামগ্রিক পর্যালোচনা

গঠন

৪.১ ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের রসগ্রাহী আলোচনা

৪.২ উপন্যাসের শ্রেণি-পরিচয়

৪.৩ পুরুষ চরিত্র চিত্রণ : শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ

৪.৪ নারী চরিত্র চিত্রণ : রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাইজী, অন্নদা দিদি

৪.৫ অপ্রধান চরিত্র : মেজদা, নতুনদা, শাহজী

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৬.১ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৪.৬.২ বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ ‘শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) উপন্যাসের রসগ্রাহী আলোচনা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃজনের ধারায় ‘শ্রীকান্ত’ অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় উপন্যাসের কাহিনি সমগ্র পাঠক সমাজের নজর কেড়েছিল। উপন্যাসটি পাঠ করে সমকালীন সাহিত্যরসিক মানুষেরা ভিন্ন স্বাদের সন্ধান পেয়েছিলেন। সকলের কাছে মনে হয়েছিল এই কাহিনি অভিনব। বিষয়বস্তু, চরিত্রসৃজন, আত্মদর্শন ও প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে আলোচ্য উপন্যাস ছিল সেকালের পক্ষে ব্যতিক্রমধর্মী। প্রচিলত উপন্যাসের মধ্যে যেমন ঘটনার একমুখী ব্যাপ্তি থাকে এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথম পর্বের বারোটি পরিচ্ছেদ যেন বহু ঘটনার একত্র সমাবেশে এক বিচিত্র স্বাদের আকর। একটি পর্বে শ্রীকান্তের জীবনব্যাপী ঘটনার বিস্তার না ঘটিয়ে আত্মজীবনীর অংশ রূপে বাল্য ও কৈশোরের বিক্ষিপ্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এভাবে কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন বলে পাঠক সমাজে তখন গভীর আলোড়ন ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ নানা দিক দিয়ে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। সমালোচকেরা লেখকের জীবনব্যপী সৃষ্টির বৃহত্তম চার পর্বের এই উপন্যাসটিকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে কাহিনি, চরিত্রসৃজন, সমাজ সমস্যা প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাসে তিনি আত্মসমীক্ষার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জীবনের এক গভীরতর দিক প্রকাশ করেছেন। বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের নতুন ধারার তিনি সূচনা করেছেন। শৈশব কৈশোরের অনেক

ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে যে কাহিনি নির্মাণ করেছেন তা নতুনত্বের স্বাদ দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, 'এই রচনাটিতে শরৎচন্দ্র কতগুলি ঘটনা ও কয়েকটি নর-নারী চরিত্রের বর্ণনায় তাঁহার তুলির মুখে নিজ হৃদয়-শোণিতের বর্ণও যে- একটু অধিকমাত্রায় লিপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সেই হৃদয়-শোণিতের গাঢ় বর্ণ-ই আখ্যান বস্তুকে যেমন—তেমনই উহার নর-নারী চরিত্রকে এমন অনুভূতির বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছে।'

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কাহিনি ও বিষয়বস্তু বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অভিনব। 'শ্রীকান্ত' এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার অতি পরিচিত কাহিনি। বাংলা উপন্যাসের গতানুগতিক জীবন-পরিবেশে এই ধরনের ছন্নছাড়া জীবনের শিল্পরূপায়ণ ইতিপূর্বে হয়নি বললেই চলে। সেদিক দিয়ে এই রচনা বাংলা উপন্যাসে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। শ্রীকান্তের ঘরছাড়া বন্ধনমুক্ত জীবন এবং রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তার সংস্কারবন্ধনহীন প্রেমের শৈল্পিক প্রকাশ উপন্যাসের মুখ্য বিষয়। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের বাল্য ও কৈশোর জীবনের কথা প্রসঙ্গে যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যবহার করেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলের পটভূমিতে এক প্রবাসী বাঙালির পরিবারে শ্রীকান্তকে স্থাপন করেছেন। এখানে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের অপরূপ মহিমা অতি মধুর বলে মনে হয়েছে। মাঝপথে পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর কাহিনি বাঁক নিয়েছে। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর প্রেমের পবিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে। কাহিনিতে পিয়ারীর আগমন একটু ভিন্ন স্বাদ দিলেও শ্রীকান্তর ভবঘুরে মানসিকতায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। কথাসাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বাঙালি জীবনের মধ্যে যে এত রসভোগের উপকরণ লুকিয়ে আছে শরৎচন্দ্র এই কাহিনি না লিখলে আমরা জানতেই পারতাম না। তাঁর ভাষায়, 'শ্রীকান্তের ভাগ্যে যে সমস্ত বিচিত্র, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে মানসিক উদারতা ও সূক্ষ্ম নীতিজ্ঞানের মূল; যে আলোক তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে 'শ্রীকান্ত'ই তাহার আদি উৎস।'

'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে অসামান্য মৌলিকত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীকান্তের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র আপন জীবনভাষ্য রচনা করেছেন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার শৈল্পিক রূপের মধ্যে দিয়ে রোমান্সপ্রিয় ছন্নছাড়া বাঙালি জীবনের স্বরূপটি প্রকাশ করেছেন। এককথায় আমরা বলতে পারি শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের অন্তর্জীবনের প্রতীক এবং চিরন্তন বাঙালি মানসিকতার প্রতিনিধি। প্রমথনাথ বিশীর মতে, 'শ্রীকান্ত শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের প্রতিনিধি এবং বাঙালি সমাজের প্রতীক।' রবীন্দ্রনাথের অমিত রায়ের সঙ্গে তুলনায় শ্রীকান্তকে তিনি বলেছিলেন সাধারণ বাঙালি সমাজের প্রতিনিধি। শ্রীকান্ত ছাড়া ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, পিয়ারী বাইজী, মেজদা, নতুনদা, শাহজী, পিসিমা, পিসেমশাই, রামবাবুর স্ত্রী, গৌরী তেওয়ারীর কন্যা প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, শাহজী, পিয়ারী বাইজী—এই কয়টি চরিত্রগুলি একটু অন্যভাবে গড়ার মধ্যে দিয়ে চরিত্র-চিত্রণের সচেতনতা ধরা পড়েছে। তাঁর অসামান্য সৃজনপ্রতিভায় ইন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম বালক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সমালোচক লিখেছেন, ''সমস্ত বাংলা সাহিত্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইন্দ্রনাথের

জোড়া মিলে না।" অন্নদাদিদির ত্যাগ, সততা, মানব প্রেম সেকালের নারীশক্তির এক আশ্চর্য মানবী মূর্তি। তাকে যে আরণ্যক পরিবেশে শরৎচন্দ্র স্থান দিয়েছেন—শাহজীর নির্যাতন-অত্যাচার সহ্য করবার ক্ষমতা দিয়েছেন, প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বাঁচার শক্তি দিয়েছেন— সে সময়কার বাঙালি নারীর পক্ষে তা ছিল অতি বিরল ঘটনা। তার মধ্যে ক্ষমাশীলতা, দয়া ও করুণার যে ছবি অঙ্কন করেছেন তা এক কথায় তুলনাহীন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর অভিনবত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপন্যাসের সমকালীন গতানুগতিক রীতি ও পদ্ধতি এই গ্রন্থে অনুসৃত হয়নি। কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখক এমন এক আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন যা দেখে আত্মজীবনী, ভ্রমণকাহিনি অথবা ডায়েরি রচনার মিশ্ররূপের কথা মনে পরে যায়। শরৎচন্দ্র এই কাহিনিতে নিজের ফেলে আসা অতীতের জীবনভাষ্য রচনা করেছেন, কিন্তু সৃজন কৌশলে একে যথার্থ উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রখ্যাত সমালোচক লিখেছেন, 'শ্রীকান্ত ও শ্রীকান্তের লেখক শরৎচন্দ্রের মধ্যে একটা গূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ আছে। ... এই উপন্যাসখানি এক অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনি বটে। কিন্তু তাহা স্বলিখিত জীবনবৃত্তের মত নয়। পাঠকগণের জন্য উপন্যাসের আকারে লিখিত হইলেও উহা কতকটা আপনার মধ্যেই আপনাকে দর্শনের মতো। এই আত্মদর্শনের ভঙ্গীটি সাহিত্যে অতিশয় নূতন ...।'

বিশিষ্ট সমালোচকদের এরকম বিভিন্ন মতামতের নিরিখে নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভারে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে রয়েছে। অনেকে এই উপন্যাসের গঠনশৈলীতে শিথিলতার অভিযোগ এনেছিলেন ঠিকই, কিন্তু বর্ণিত বিষয় ও চরিত্রগুণে গ্রন্থের পরিচ্ছেদগুলি হয়ে উঠেছে এক অভূতপূর্ব উপভোগের সামগ্রী। প্রতিদিনকার সংসারযাত্রায় যাঁদের চাল-চলন, আচার- আচারণ, সামজিক রীতিনীতি, সংস্কার আমাদের একঘেয়ে মনে হয়, সেই ধারার বাইরে অন্য ধরনের মানুষদের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। সমকালীন সাহিত্যের প্রেক্ষিতে তা ছিল সম্পূর্ণ নতুন। তাই 'শ্রীকান্ত' সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষের প্রায় সকলের নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়েছিল। তার একরৈখিক গুণের কারণে নয়, দোষ-গুণে মিশ্রিত চরিত্রের কারণে পাঠকের এতখানি প্রিয় হয়ে উঠেছিল এই উপন্যাস। 'শ্রীকান্ত' সেকারণে বিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মধ্যবিত্ত তথা নিম্ন মধ্যবিত্তের অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়।

৪.২ উপন্যাসের শ্রেণি-পরিচয় অথবা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস কি না?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ধারায় অভিনব সংযোজন। শুধু কাহিনি ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য নয়, প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্বের কারণে গ্রন্থটিকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে একাধারে রয়েছে আত্মজীবনীর বৈশিষ্ট্য এবং ভ্রমণ কাহিনিসুলভ মনোভঙ্গী। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশের সময় যখন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনি' নামে বেরিয়েছিল তখন বাঙালি পাঠক ভিন্ন স্বাদ পেয়েছিল। তারা

ভেবেছিল এটি শরৎচন্দ্রের বেনামী রচনা। কারণ লেখকের দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুর হয়ে রেঙ্গুনে চলে যাওয়া পর্যন্ত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল, শুরুর কাহিনির সঙ্গে তার অনেকাংশে মিল রয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে তিনি লিখেছেন, 'আমার এই "ভবঘুরে" জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে! ... যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই তো হয় না, ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সে-ই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত থাকিলেই তো আর লেখা যায় না!" আসলে বর্ণিত বিষয়ের প্রাককথনের মতো এই রচনার বিশিষ্টতার কথা লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন। লেখকের জীবনে শৈশবকালের দুরন্ত মানসিকতা, ভাগলপুরের বন্ধু রাজেন মজুমদারের সঙ্গে উদ্দাম-উদ্দেশ্যহীন যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা কীভাবে প্রকাশ করবেন তা নিয়ে সংশয় ছিল। তাই আত্মকথনের রীতিতে সে বাস্তব সত্য পরিবেশন করেছেন।

কাহিনি পাঠের শেষে আমাদের স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে এটি কী জাতীয় রচনা? শুরুতে যখন মানসভ্রমণের কথা বলেন এবং পত্রিকায় প্রকাশের সময় 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনি' নাম দেন তখন পাঠকের মন ভ্রমণপিপাসুর অভিজ্ঞতা জানতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু কাহিনির পরবর্তী অধ্যায়গুলি প্রকাশের সময় রচনার নাম ও লেখকের নামে বদলে যায়। তখন পাঠক ভাবতে থাকেন বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন ধারার উদ্ভব হল। তখন পাশ্চত্যের Autobiographical Novel এর কথা আমাদের মনে আসে। কিন্তু সেকালের পক্ষে এই সাহিত্যধারা ছিল একেবারে নতুন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ধারার শুরু হয়ে গেল শরৎচন্দ্রের হাত ধরে।

মূল কাহিনির বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব এর মধ্যে ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা একেবারে গৌণ বিষয়। মুখ্য হয়ে উঠেছে শরৎচন্দ্রের আত্মোপলব্ধির বিচিত্র কথা। ভ্রমণকাহিনি বর্ণনাকারী ভ্রমণপথের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের বিবরণ দেন পাঠক মনোরঞ্জনের জন্য। ঘটনার মাধ্যমে কাহিনিবৃত্ত নির্মাণের উপর কোনো বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। এতে স্বতন্ত্র কোনো ঘটনার প্রাধান্য থাকে না। সেদিক থেকে আমরা 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) পাঠ করে দেখেছি, এখানে ভ্রমণকথার কোনো আনুপূর্বিক বিবরণ নেই। গ্রন্থের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে শ্রীকান্ত'র বাল্য ও কৈশোরের কাহিনি। যৌবনে বিঠৌর ও ছোটবাঘিয়ায় ভ্রমণের বর্ণনাটুকু এসেছে কাহিনির অনুষঙ্গ হিসেবে। গৌরী তেওয়ারীর বিবাহিতা কন্যার করুণ অবস্থার কথা এসেছে ভিনদেশে বাঙালি চরিত্রের অবস্থা দেখাবার কারণে। রামবাবু ও তার স্ত্রীর কথা এসেছে তাদের অকৃতজ্ঞ মানসিকতা দেখাবার জন্য। সেদিক থেকে বিচার করে বলতে পারি 'শ্রীকান্ত'র মধ্যে ভ্রমণকাহিনির বিশেষ কোনো গুণ নেই।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অনেক ঘটনার সঙ্গে কাহিনির বহুলাংশে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে খেলার মাঠে শ্রীকান্তের মার খাওয়া এবং ইন্দ্রনাথ নামের এক কিশোরের বাঁচানোর কথায় লেখকের ছোটবেলার স্মৃতি রয়েছে। ভাগলপুরের স্কুলে পড়া ছেড়ে দিয়ে লেখক পাড়ার ক্লাবে খেলাধুলা, সঙ্গীত, অভিনয় করে ভবঘুরের জীবন কাটিয়েছিলেন সেই স্মৃতির উল্লেখ রয়েছে

এখানে। উত্তম পুরুষে কাহিনি বর্ণনা দেখে অনেকে গ্রন্থটিকে আত্মজীবনী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অনেকে মনে করেছিলেন এটি বেনামে রচিত শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী। কিন্তু শ্রীকান্তের চরিত্রে লেখকের জীবনের অনেক সত্য থাকলেও সেটি গ্রন্থের একমাত্র উপজীব্য নয়। প্রথম পর্বের আত্মকথার মাঝে বলিষ্ঠ অংশ হয়ে উঠেছে ইন্দ্রনাথ। পিয়ারী ওরফে রাজলক্ষ্মীর বাইজী হবার কথা, অন্নদাদিদির কষ্টসহিষ্ণু জীবনের কথা উপন্যাস কাহিনিতে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। সেকারণে এই শ্রেণির রচনাকে সরাসরি আত্মজীবনী বলা সমীচীন নয়।

শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসে সমকালীন যুগ ও জীবনের বিশেষ কোনো ছায়াপাত ঘটেনি। পারিপার্শ্বিক কোনো বাস্তব ঘটনার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। আত্মজীবনীতে লেখক জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে যুগ ও জীবনকে ধরে রাখেন এবং অনেকসময় ইতিহাসসম্মত উপায়ে তার পরিচয় দেন। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সেরকম কোনো চেষ্টা আমরা লক্ষ করিনি। এর বেশিরভাগ ঘটনা লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হলেও তা কেবল মনোদর্পণের প্রতিফলন মাত্র। সেভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি 'শ্রীকান্ত' আত্মজীবনীর লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ, কিন্তু আত্মজীবনীমূলক গদ্যকাহিনি নয়।

গভীরভাবে বিচার করলে আমরা দেখি 'শ্রীকান্ত' রচনাটির মধ্যে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। চার পর্বের কাহিনি বিচার করলে আমরা শ্রীকান্তের জীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানতে পারব। সেখানে উপন্যাসের মধ্যে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ লক্ষ্য করা গেছে। শ্রীকান্তের বাল্য-কৈশোর ও যৌবন কথার স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে আসলে শ্রীকান্তের জীবনকথাই বলেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এই জীবনকথার সঙ্গে লেখকের জীবনের অনেক ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। গ্রন্থের প্রথমার্ধে শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদির কাহিনিটি মূল কাহিনির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। শ্রীকান্তের বোহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে এই শাহজী ও অন্নদাদিদির জীবনের ঘটনার অদৃশ্য যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং উপন্যাসের কাহিনিকে পূর্ণতা দেবার জন্য এইসব ঘটনার অবতারণা করেছেন।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ থেকে আমরা পূর্ণবয়স্ক যুবক শ্রীকান্তকে পাই। তখন তার মন তারুণ্যের উন্মাদনায় ফুটছে। এই পর্বের বিস্তার চলেছে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। এখানে শ্রীকান্ত পিয়ারীর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে। বাল্যসখী রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত কোনোভাবেই চিনে উঠতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সেই পরিচয়ের পর্দা খুলে গেছে। শ্রীকান্ত জানতে পেরেছে ছোটবেলার রাজলক্ষ্মী কীভাবে বাইজীতে পরিণত হয়েছে। দুটি নরনারীর হৃদয় বারবার কাছাকাছি হলেও তাদের মিলন সম্ভব হয়নি সম্পূর্ণ কাহিনিতে। লেখকের বক্তব্য বিষয়ে উঠে এসেছে 'প্রেমের ইতিহাস' বর্ণনার কথা। তাই চরিত্র সৃজন ও জীবন দ্বন্দ্বের প্রকাশের নিরিখে গ্রন্থটিকে সার্থক উপন্যাস বলতে পারি। আত্মজীবনের অংশ নানাভাবে জুড়ে রয়েছে বলে এটিকে বলা হয়েছে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

কেন্দ্রীয় চরিত্র সৃজনে দেখা গেছে লেখকের আত্মজীবনের অংশ। অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রও শ্রীকান্ত-কেন্দ্রিক। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের বিবৃতির ঢঙে উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

নিজের জীবনের আত্মকথা লিখতে বসে মনে হয়েছে জীবনের সব গ্রন্থি পরিপাটিভাবে সাজানো সম্ভব হয়নি। কিছু এলোমেলো কথা এসে পড়েছে ঘটনার মধ্যে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে একমাত্র শ্রীকান্ত চরিত্রের। পিয়ারী বাইজীর জীবনের কঠিন দ্বন্দ্বমুখর বিষয়ের কেন্দ্রে রয়েছে শ্রীকান্ত। বাস্তব অভিজ্ঞতা বহুমুখী ঘটনা উপন্যাসে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যাতে আত্মজীবনের কথা প্রধান হয়ে উঠেছে। সুতরাং সার্বিক বিচারে বলা চলে 'শ্রীকান্ত' রচনাটি প্রথম যুগের সার্থক উপন্যাস হিসেবে যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনার ধারাতেও এটি একটি মাইলস্টোন।

৪.৩ পুরুষ চরিত্র চিত্রণ : শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ

শ্রীকান্ত :—কথাসাহিত্যে চরিত্র নির্মাণ বা সৃজন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরৎচন্দ্রের জীবনব্যাপী সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন পর্বে বহু চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্ট বহু পুরুষ চরিত্রের মধ্যে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত চরিত্রটি নানা দিক থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। লেখকের মানসলোকের সমস্ত আন্তরিকতায় চরিত্রটি অনন্য। উপন্যাসের চার পর্বে আকর্ষণ-বিকর্ষণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জটিলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শ্রীকান্ত চরিত্রটি এক গভীর শিল্পসুষমা লাভ করেছে।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এই অভিজ্ঞতাগুলি শ্রীকান্তের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ বেলায় পৌঁছে পুরোনো দিনগুলির দিকে তাকিয়ে সে দেখেছে বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার চলমান মিছিল। এই দিকে তাকিয়ে সে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলেছে। স্মৃতির পাতা থেকে চলমান ঘটনার কথা মনে করতে গিয়ে ছোট ছোট ঘটনাকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। বড় বড় ঘটনা অনেক সময় তার বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছে। এই সব ছোট ও বড় ঘটনার বিশ্লেষণে শ্রীকান্ত যে জীবন-অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করেছে তাতে শ্রীকান্ত চরিত্রের স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়কের বাল্য বয়সের কথা বলেছেন। এর মধ্যে স্কুলে খেলার মাঠের ঘটনা, ইন্দ্রনাথের সঙ্গে গঙ্গার উন্মুক্ত বক্ষে নৈশ অভিযানের ঘটনা, শ্রীনাথ বহুরূপীর আগমনে কৌতুক ও ভয় এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব ঘটনাতে শ্রীকান্তের সঙ্গে সর্বদা ছিল ইন্দ্রনাথ। অনেক সময় ইন্দ্রনাথের কর্মপটুতা ও সাহসী মনোভাবের পাশে শ্রীকান্তকে খনিকটা ম্লান বলে মনে হয়েছে। তবে সপ্তম পরিচ্ছেদে অন্নদাদিদির চলে যাবার পর শ্রীকান্তের স্বকীয়তা পাঠকের নজর কেড়েছে।

ইন্দ্রনাথের পাশে শ্রীকান্তকে খানিকটা নিষ্প্রভ বলে মনে হলেও ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা তার সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মন, প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ, মার্জিত স্বভাব ও স্বহৃদয় মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি। ফুটবল খেলার মাঠে দুই দলের ঝগড়ার মাঝে নিরীহ শ্রীকান্ত মার খাচ্ছিল। সেই মারের হাত

থেকে বাঁচানোর পর ইন্দ্রনাথ তাকে পালিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু শ্রীকান্তের দৃঢ় স্বরে 'না' উচ্চারণের করার মধ্যে তার মানসিক শক্তির পরিচয় পাই। কারণ শ্রীকান্ত বিপদকে ভয় পায় না। নিজে বেঁচেছে বলে সে বিপদের স্থানে ইন্দ্রকে রেখে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে চায় না। বিপদের সময়ে রক্ষাকর্তাকে একা ফেলে চলে না যাওয়ার মধ্যে তার চরিত্রের নিঃস্বার্থ রূপ ও হৃদয়ের উদারতার পরিচয় পাই।

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে শ্রীকান্ত তার প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করেছে। তার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সুপ্ত অবস্থায় ছিল, সেগুলি ইন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পেয়ে তার প্রতি অনুরাগের প্রকাশ ঘটেছে। অতীত স্মৃতিচারণার সময়ে তাই শ্রীকান্ত অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পেরেছে, 'যিনি সব জানেন, তিনি শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক থাকিতে সেই হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতিটি কণা পর্যন্ত উন্মুক্ত হইয়া থাকিত।' ইন্দ্রনাথকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে শ্রীকান্তর মন এক নিঃশঙ্ক দুঃসাহসিক মৃত্যুভয়হীন জীবনের দিকে ধাবিত হয়েছে। ইন্দ্রের কাছ থেকে শিখেছে অন্যের বিপদে নিঃস্বার্থভাবে পাশে থাকার প্রেরণা।

শ্রীকান্ত এক অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলে। পিসেমশাই-পিসিমার আশ্রয়ে লেখাপড়া করছে। লেখাপড়ায় উন্নতি করে ভবিষ্যতের পথ সুগম করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার জীবননাট্যের মাঝে ইন্দ্রনাথের আগমনে বাঁধা ছকটি ভেঙে গেছে। হঠাৎ বাড়িতে কাউকে না বলে সে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে পাড়ি দিয়েছে রোমাঞ্চকর নৌযাত্রায়। গভীর অন্ধকারের মাঝে ইন্দ্রনাথের দুরন্ত দুর্দম উন্মাদনা ও শঙ্কাহীন চিত্তকে দেখেছে। তাকে দেখে ছোট-গণ্ডীতে-বাঁধা শ্রীকান্ত যেন সংকীর্ণ জীবনবৃত্ত পেরিয়ে বৃহত্তর লীলাভূমিতে পাড়ি দিয়েছে। নিশীথ অভিযানের পর থেকে শ্রীকান্তের গতানুগতিক-ছকে-বাঁধা জীবন থেকে এক দুঃসাহসিক অভিযানের অভিযাত্রী হতে পেরেছে।

ইন্দ্রনাথের দুর্দমনীয় মানসিকতার মধ্যে ছিল প্রাণ-প্রাচুর্যের পরম উল্লাস। শ্রীকান্তের মধ্যে সেই উদ্দাম জীবনোল্লাসের পরিবর্তে রয়েছে ভাবগম্ভীর মানসিকতা। জীবনের গভীরতা তাকে অনেক সময়ে সংযত ও নিরাবেগময় করে তুলেছে। ইন্দ্রনাথের মতো শ্রীকান্ত জীবনবেগে উচ্ছল নয়। জগৎ ও জীবনকে সে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেছে। এরপর সেই পর্যবেক্ষণের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ও সমীক্ষা করেছে। তাই সে জগৎ ও জীবনকে একইসঙ্গে বাস্তবতা ও হৃদয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে। ইন্দ্রনাথের কাছে সে জীবনসত্যের স্বরূপ জানতে পেরেছিল। তাই ইন্দ্রের রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহারে শ্রীকান্ত কখনো রাগ করেনি। অবহেলা ও অপমানের জন্য তার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। এই গভীর আত্মোপলব্ধি শ্রীকান্ত চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে ইন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ কিশোর শ্রীকান্তের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। শ্রীকান্ত তার নিজের চরিত্রগুণে ইন্দ্রনাথের মন জয় করে নিয়েছে।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা যে শ্রীকান্তকে পাই, পিয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগবিলাসের স্বাদ পেলেও তার যথেচ্ছচার করেনি। উদাসীন ও আত্মভোলা প্রকৃতির হলেও সে ভোগবিলাসের জীবন সাধনায় আত্মসংযম বজায় রেখেছে। কুমার

সাহেবের তাঁবুতে পিয়ারী বাইজীর সঙ্গে দেখা করার পর শ্রীকান্তর মনে প্রেমের আলোকশিখা জ্বলে উঠেছে। সেই আলোকবর্তিকা ভবিষ্যতের পথ দেখিয়েছে। প্রথমে সে পিয়ারীকে বাইজী ভেবে বিরক্ত হয়েছে। পিয়ারীর গান মুগ্ধ হয়ে শুনেছে, কিন্তু তার কথাবার্তায় বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে। সেকারণে শ্রীকান্ত বলেছে, 'কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল, সে হাজির হইলেই আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত, উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম।' পিয়ারীকে সে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু শ্মশানযাত্রার সময়ে পিয়ারীর বিচলিত মনোভাব দেখে শ্রীকান্ত একটু হতবুদ্ধি হয়েছে। যার সঙ্গে কোনো চেনাজানা নেই, তার মঙ্গল চিন্তার মনোভাব দেখে শ্রীকান্ত বিস্মিত হয়েছে। এই বাইজী যে আর পাঁচ জনের মতো নয় শ্রীকান্তের সচেতন মন সেদিন তা বুঝতে পেরেছিল।

এরপর থেকে শ্রীকান্তের মনোলোকে নতুন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। পিয়ারী যে শুধু বাইজী নয়, তার এই রূপের আড়ালে এক মমতাময়ী নারীমূর্তি লুকিয়ে রয়েছে তা অনুভব করেছে। পিয়ারী যে তার বাল্যকালের সাথী তা জানার পর সে আবেগোচ্ছল বা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। কারণ সে নিজের দিক থেকে কোনোদিন সামান্য আকর্ষণ বোধ করেনি। তাই বাল্যসাথীর বিচলিত ভাব দেখে বার বার ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কষাঘাতে জর্জরিত করেছে। কান্নার করুণ আকুতিতে, সবিনয় নিষেধে, সে শ্মশান অভিযানের সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। শ্রীকান্ত এক সাহসী চরিত্র। ইন্দ্রনাথ তাকে মৃত্যুভয় জয় করতে শিখিয়েছে। নিজের আত্মমর্যাদা বোধের পরিচয় দিতে সে শ্মশান অভিযান করেছে। শ্মশানে গিয়ে একটু ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু তা মৃত্যুভয়ের চেয়ে বেশি ছিল আত্মসম্মানের। এই আত্মসম্মান রক্ষা পেয়েছিল পিয়ারীর দ্বারা। পিয়ারী সেখানে রতন ও অন্যান্য লোকেদের পাঠিয়ে শ্রীকান্তের মনে সাহস যুগিয়েছে। তখন শ্রীকান্ত পিয়ারীর মমতাময়ী রূপ আবিষ্কার করে তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। পিয়ারীর ডাক প্রত্যাখ্যান করে এই নতুন ভালোবাসা হৃদয়ে উপলব্ধি করেছে। শ্রীকান্ত তখন থেকে পিয়ারী তথা রাজলক্ষ্মীর প্রতি প্রেম একটু একটু করে অনুভব করেছে। পিয়ারীর ডাকে তাই রাতের আহ্বান প্রত্যাখান করে প্রেমের গৌরব অনুভব করতে চেয়েছিল। কেবল দেহ সম্ভোগের কামনাবহ্নিতে প্রেমকে নস্যাৎ করে দিতে চায়নি। আসলে হৃদয়ের আনন্দকে চিরন্তন করে রাখবার জন্য প্রথমে যে ভুল হয়েছিল, তা আর পুনরায় করতে চায়নি। এভাবে শ্রীকান্ত চরিত্রের মহত্তর দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

পিয়ারীর মাঝে রাজলক্ষ্মী নামের যে মমতাময়ী নারীর মহান সত্তা লুকিয়ে ছিল, শ্রীকান্ত তা দেখে মুগ্ধ হয়েছে। জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। তার জীবনের গতি এতকাল যে বিশৃঙ্খল ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তার মধ্যে প্রেমের মাধুর্য এসে এক পরিণতির শৃঙ্খলা দিয়েছে। তাই পিয়ারীর নির্দেশে ঘরে ফেরার পর আবার বাইরে পা বাড়িয়েছে। পাটনা যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে মাঝপথে ট্রেন থেকে নেমে সাধুর চেলায় পরিণত হয়েছে। এতেও শ্রীকান্তের জীবন-অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে উঠেছে। সাধুবাবা অল্প সময়ে নানা স্থানে ঘুরে বেড়াত বলে সে বিচিত্র জীবন স্বাদের সন্ধান পেয়েছে। নিজেকে সর্বত্র মানিয়ে নেবার মধ্যে সকল পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পেরেছে। গৌরী তেওয়ারীর বিবাহিত কন্যার দুঃখে নিজের সহানুভূতি ও সমাজের দুর্দশার কথায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীকান্ত পরোপকারী বলে

মাঝপথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত রামবাবুর ছেলেদের সেবা শুশ্রূষা করেছে। একটি অপরিচিত পরিবারের জন্য সে যা করেছে, তাতে তাকে নিঃস্বার্থ পরোপকারী দয়াশীল মানুষ বলে মনে হয়। ইন্দ্রনাথের কাছে যে পরোপকারের শিক্ষালাভ করেছিল এখানে তার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। এছাড়া অন্নদাদিদিকে পাঁচ টাকা ধার দেবার ঘটনাতে শ্রীকান্তের এই গুণের পরিচয় পেয়েছি।

আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম পর্বের শেষে আমরা শ্রীকান্তের জীবনের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা দেখেছি। প্রেমের যে মধুর রূপের শুরু হয়েছিল পিয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাতে, পাটনায় তার বাড়িতে অবস্থানের সময় প্রেমের মহিমা নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। অসুস্থ অবস্থায় পাটনার বাড়িতে শ্রীকান্ত সুস্থ হয়ে উঠলে রাজলক্ষ্মীর মাতৃসত্তা আবিষ্কার করেছে। বঙ্কুর মা পরিচয়ে রাজলক্ষ্মীকে দেখে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মনোবেদনা জন্মেছে। কিন্তু এই মনোবেদনা ছিল নিতান্ত অর্থহীন। আসলে পিয়ারীর ভেতরে প্রেমিকা সত্তার যে প্রগাঢ় রূপ নিহিত ছিল, সে পরিচয় আমরা পেয়েছি শ্রীকান্তকে গভীর রাতে ঘরে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। সে নীরবে এসেছে, আবার বিদায় নিয়েছে। এরপর পিয়ারী নিজেকে বঙ্কুর মা পরিচয় দিয়ে শ্রীকান্তকে পরোক্ষ ইঙ্গিতে চলে যেতে বলেছে। বড় প্রেমের মহত্ত্বই এখানে। ত্যাগ ও সংযমের মধ্যে দিয়ে প্রেমের মহিমাময় রূপ জেনে শ্রীকান্ত আনন্দে উদ্বেল হয়েছে। চলমান সমাজের সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে-যে প্রেম নেই; যথার্থ প্রেম যে উদার ও মহৎ—ত্যাগ ও সংযমে যে প্রেমের প্রকৃত গৌরব—এই সত্যের চূড়ান্ত রূপ লেখক শ্রীকান্ত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অঙ্কন করেছেন। প্রেমের নতুন রূপে উদ্বুদ্ধ শ্রীকান্ত সেকারণে অসুস্থ অবস্থায় পাটনা পরিত্যাগ করেছিল। যাবার সময়ে প্রেমের গৌরব প্রকাশে বলেছে, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।' উপন্যাসে এভাবে শ্রীকান্ত চরিত্রের মহনীয়তা ধরে পড়েছে।

ইন্দ্রনাথ :—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'র চার পর্বের প্রধান আকর্ষণ শ্রীকান্ত। কিন্তু প্রথম পর্বে শ্রীকান্তের পাশে ইন্দ্রনাথ সকলের নজর কেড়েছে। শুধু বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি অতি বিরল। চরিত্রটির পরিকল্পনায় রয়েছে ভাগলপুরের বন্ধুপ্রতিম চরিত্র রাজেন মজুমদারের ছায়া। লেখকের ছোটবেলার-ঘটে-যাওয়া নানা ঘটনার সাক্ষী ছিল বন্ধু ইন্দ্রনাথ। প্রখ্যাত সমালোচক ইন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বর্ণপরিচয়ের রাখাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক দুষ্টু—লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালকের কাহিনি সাহিত্যের বা ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ইন্দ্রনাথের জোড়া মেলে না।' এই বক্তব্যে খানিকটা অতিরঞ্জন থাকলেও সেকালের পক্ষে সত্যি তা প্রাসঙ্গিক ছিল। আলোচ্য উপন্যাসের প্রথমে রয়েছে ইন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ডের বিবরণ। স্কুলে খেলার মাঠে আকস্মিক প্রহারের হাত থেকে শ্রীকান্তকে বাঁচানো, গভীর রাতে গঙ্গাবক্ষে মাছ চুরি করা, অন্নদাদিদি ও শাহজীকে সাধ্যমতো সাহায্য করার মধ্যে ইন্দ্রনাথের মনের উদারতার পরিচয় পাই। সে অসীম সাহসী, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী, নেতৃত্বদানে সক্ষম, নিঃস্বার্থ মনোভাব ও গভীর আন্তরিকতায় উজ্জ্বল চরিত্র।

ইন্দ্রনাথ হৃদয়ের আবেগে প্রাণিত, যৌবনের উন্মাদনা ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক সহানুভূতিশীল চরিত্র। শ্রীকান্ত তার সম্পর্কে বলেছে, 'যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল। তারপর কতকাল কত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি, ... কিন্তু এতবড় মহাপ্রাণ তো আর কখনও দেখিতে পাই নাই।' ইন্দ্রনাথের এই প্রবল হৃদয়বোধ তার প্রত্যেক কাজের মধ্যে লক্ষ করা গেছে। খেলার মাঠে শ্রীকান্তকে বাঁচানো, গঙ্গানদীর জলস্রোতে ডিঙিতে ভেসে বেড়ানো, জেলেদের পাহারা এড়িয়ে মাছ চুরি করা, বন্যজন্তু ও সাপে-ভরা জঙ্গলে নির্ভয়ে চলাফেরার মধ্যে রয়েছে চারিত্রিক নির্ভীকতা। গভীর সহৃদয়তা তাকে করে তুলেছে মৃত্যুভয়হীন। গঙ্গায় মাছ চুরি করে ফেরার সময় জেলেদের হাত থেকে বাঁচতে খালের ভেতরে নৌকো ঢুকিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেছে। তখন ভুট্টা জনারের গাছ থেকে সাপ জলে পড়তে থাকলে ইন্দ্রনাথ ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করেনি। শ্রীকান্ত ভয়ে অস্থির ও উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ইন্দ্রনাথ অনায়াসে বলেছিল, 'আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে তো একদিন হবেই ভাই।' মৃত্যুকে সে যেন জীবন-সাথী করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত পরাজিত মানুষদের মতো ইন্দ্রনাথ কখনো হারতে শেখেনি। সমস্ত বিপদের উপর দিয়ে সে তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছে। তার এই মানসিকতা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন—'ইন্দ্রনাথ কঠিন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু সে এমনি সহজে, এমনি অনায়াসে বিপদের মধ্য দিয়া অক্ষত অবস্থায় বাহির হইয়া গিয়াছে যে মনে হয় যাহা অপরের কাছে প্রতিকূল, তাহার কাছে তাহাই, অনুকূল; যে পথকে অপরে কণ্টকাকীর্ণ মনে করিবে, সেই পথই তাহার পক্ষে কুসুমাস্তীর্ণ।' ইন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতা শ্রীকান্তকে সাহসিকতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছে। শ্রীকান্তকে বাঁচাবার জন্য সে অনেকের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছে। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে গভীর অন্ধকারের গঙ্গায় ঠিক পথে ডিঙি নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। আসলে ইন্দ্রনাথ চরিত্র নির্মাণ করে লেখক শ্রীকান্তকে জাগতিক বাস্তব অভিজ্ঞতার পথে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতা শুধু বন্ধুত্বের সীমায় আটকে থাকেনি, তা সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। তার মহাপ্রাণতার অনুভব প্রকাশ পেয়েছে জীবত ও মৃত উভয় মানুষের ক্ষেত্রে। চুরি-করা-মাছ বিক্রি করে বাড়ি ফেরার সময় নদীর জলে একটি শিশুর সদ্যমৃত দেহ ভাসতে দেখে তার চোখ জলে ভরে গেছে। সদ্যমৃতের দেহ শেয়ালে টানাটানি করছে দেখে তার মন বিষণ্ণ হয়েছিল। তাই মৃতদেহটি চড়ার উপর নিয়ে গিয়ে অতি যত্নে রেখে এসেছিল। এই কাজে আপন অন্তরের স্নেহাতুর মনটি যেন আরও একবার কেঁদে উঠেছিল।

বিশ্বপ্রাণের চরৈবেতির মন্ত্রে দীক্ষিত চরিত্র ইন্দ্রনাথ। সে বাইরের পৃথিবীকে নিজের ঘর করে নিতে পেরেছিল। ঘরের প্রতি তাই তার আকর্ষণ ছিল অতি ক্ষীণ। বাড়িতে মা-ভাই আত্মীয়স্বজন থাকলেও কেউ তাকে গভীর স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারেনি। সংসারের মোহ তাকে বিন্দুমাত্র আকৃষ্ট করেনি। ডিঙি নিয়ে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে বাড়ি-ঘরের কথা ভুলে গিয়ে অনেকদিন সে বাইরে কাটিয়ে আসত। যেসময়ে সব বালকেরা লেখাপড়া শিখে জীবনে উন্নতির কথা ভাবে, ইন্দ্র তখন রোমাঞ্চকর

অভিজ্ঞতায় মনের আনন্দ খুঁজে পায়। যেকথা তার বয়সের ছেলেরা মুখে আনতে ভয় পায়, ইন্দ্রনাথ অনায়াসে তা উচ্চারণ করে। বেপরোয়া চলাফেরা ও প্রকাশ্যে ধূমপান করে নিজের অমার্জিত রুচির পরিচয় দিয়েছে। লেখাপড়া না শিখে সে জল জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। ইন্দ্রনাথ সাধারণের চোখে খারাপ ছেলে হলেও তার বিচিত্র কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর মহাপ্রাণতার ছবি পাঠককে মুগ্ধ করেছে।

ইন্দ্রনাথ সর্বদা নির্ভীক, নির্লিপ্ত ও পরোপকারী যুবক। পরের উপকার করতে সে নিজে সজ্ঞানে অন্যায় করেছে। অন্নদাদিদিকে অর্থ সাহায্যের জন্য করবে বলে মাছ চুরি করে টাকা সংগ্রহ করেছে। কাহিনির কোথাও আমরা তাকে নিজের স্বার্থের জন্য কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখিনি। শাহজীর অত্যাচার থেকে দিদিকে বাঁচাতে তাকে আঘাত করেছে। অন্নদাদিদিকে সেবার দ্বারা সুস্থ করে তুলেছে। শাহজীর সাপের কামড়ে মৃত্যুতে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কবরে মাটি দিয়েছে। কলেরা রোগীর সেবা করেছে। আবার দিদি নিরুদ্দেশ হলে তার জন্য দুঃখ করেছে। কলকাতা-থেকে-আসা নতুনদাদাকে গ্রামের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে রাতভর কষ্ট করেছে। বন্ধু শ্রীকন্তকে নতুনদাদা অপমান করলে মুখ বুজে সহ্য করেছে। মাঝ রাতে গ্রামের মধ্যে গিয়ে দাদার জন্য খাবার সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ কুকুরের তাড়ায় নতুনদাদার জামাকাপড় সব ভিজে গেলে শীতের রাতে নিজের গায়ের চাদর দাদাকে দিয়ে দিয়েছে। এরকম বহু গুণের অধিকারী হয়েও সে সর্বদা এক নিরহংকারী সাদামাঠা মানবচরিত্র। নিজের কাজে অনেক অপরিণামদর্শিতার পরিচয় রাখলেও সমস্তকিছুর মধ্যে তার সরলতা ও মানবিক গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

বালকসুলভ স্বভাবের সরল বিশ্বাসে সে শাহজীর কাছে সাপ ধরার মন্ত্র শিখে নিতে চেয়েছে। অন্নদাদিদির কাছে বিষ-পাথর চেয়ে নিয়ে মানুষকে সাপের কামড় থেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। সে মা কালীর অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে। ভূত-প্রেতের মন্ত্র শিখে মানুষের সেবা করতে চায়। শাহজীর কাছে সাপখেলার গোপন রহস্য জেনে মানুষকে চমকে দিতে চায়। সব মিলিয়ে আমরা দেখি, পরহিত সাধন ও মানবসেবা যেন ইন্দ্রনাথের জীবনে বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। এরকম এক অসাধারণ চরিত্র সৃজন করে শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙালি পাঠকের মন জয়ে করে নিয়েছিলেন।

সমাজের কোনো প্রথাগত বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে ইন্দ্রনাথের জীবন বাঁধা ছিল না। কিন্তু প্রকৃতির পাঠশালায় নিত্য যাতায়াতের ফলে তার যে শিক্ষা হয়েছে, তাতেই তার মহৎ রূপটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। 'মড়ার আবার জাত কি রে!' এবং 'মরতে তো একদিন হবেই ভাই।'—এসব বাক্যগুলিতে ইন্দ্রনাথের জীবনের সহজ সত্যকে আমরা সহজে বুঝে নিতে পেরেছি।। তার এই সহজ সত্য উপলব্ধির কথা শুনে শ্রীকান্ত বিস্মিত হয়েছে। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা দেখে অবাক হয়েছিল। সহজ সরল বুদ্ধিবলে ইন্দ্রনাথ সব ঘটনার আসল সত্য উদ্ঘাটন করতে পারত। অন্য পাঁচটি ছেলের মতো সে ধূর্ত কিংবা চাতুরীর দ্বারা মানুষের মন জয় করতে চাইত না। সেকারণে এই সহজ বুদ্ধির সহায়তায় সে জীবনে চরম আনন্দ উপভোগ করেছে।

ইন্দ্রনাথের মতো বহু গুণে গুণান্বিত চরিত্র সমাজের সব ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছে। প্রচলিত মূল্যবোধের নিরিখে তাকে বিচার করা চলে না। জাগতিক সমস্ত লাভ-ক্ষতির হিসাবের বাইরে থেকে সে নির্ভীক নির্লিপ্তভাবে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে। নিজের সুখ সমৃদ্ধির কথা চিন্তা না করে সে একদিন ঘর ছেড়ে চলে গেছে। উপন্যাসের প্রথম পর্বের সপ্তম পরিচ্ছেদেই পাঠকের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের শেষ দেখা। এরপর কাহিনিতে নায়ক শ্রীকান্তের যৌবন পর্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বৃহত্তর এই কাহিনির মাত্র অল্প কয়েকটি পরিচ্ছেদের আমরা ইন্দ্রনাথের উপস্থিতি আমাদের মুগ্ধ করেছে। কাহিনিতে এই স্বল্প উপস্থিতির সময়টুকুতে আমাদের মনে হয়েছিল উপন্যাসের নায়ক বুঝি ইন্দ্রনাথ। লেখক শরৎচন্দ্র আত্মজীবনের অংশ দিয়ে যেমন শ্রীকান্তকে গড়েছিলেন তেমনি ইন্দ্রনাথের প্রতিও ছিল আন্তরিক ভালোবাসা। সেকারণেই চরিত্রটি আমাদের নজর কেড়ে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

৪.৪ নারী চরিত্র চিত্রণ : রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাইজী, অন্নদাদিদি

রাজলক্ষ্মী বা পিয়ারী বাইজী :—শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র সৃজনের ধারায় পিয়ারী বাইজী তথা রাজলক্ষ্মী এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের অষ্টম পরিচ্ছেদের আমরা পিয়ারী বাইজীর প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথম পর্বে পিয়ারীর যৌবনের সূচনাকাল থেকে কাহিনিতে আগমন ঘটেছে। পিয়ারী যে আসলে শ্রীকান্তের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী রাজলক্ষ্মী—এই সত্য জানতে আমাদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। কুমার সাহেবের তাঁবুতে পিয়ারী বাইজীকে প্রথম দেখা গেছে। শ্রীকান্তর সঙ্গে কথপোকথনের সময়ে তার জীবনের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পিয়ারীর বাইজীজীবনও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীকান্তের সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকে তাদের প্রেমের বিচিত্র ধারা প্রকাশ পেয়েছে। কঠিনে-কোমলে মিশ্রিত এক সংসার-সুখ বঞ্চিত নারী হিসেবে পিয়ারী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে।

গভীর প্রেমের আবেশে, কঠিন সংযমে, প্রবল বুদ্ধিমত্তায় ও আন্তরিক পবিত্রতায় সে এক সর্বংসহা নারী। জীবনের শৈশবে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে মাকে ছেড়ে গেছে। দুই বোন রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীকে রক্ষায় একই পাত্রে পাত্রস্থ হতে হয়েছিল। কিন্তু সত্তর টাকা পণ নিয়ে স্বামী আর কোনোদিন তাদের কাছে ফিরে আসেনি। বোন সুরলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর সে কাশীতে গিয়ে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করে বাইজীর জীবন বেছে নিয়েছে। প্রচণ্ড দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পেতে তার এই পথে পদচারণা। শিশুকালে পাঠশালায় পড়বার সময়ে রাজলক্ষ্মী বালক শ্রীকান্তকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিল। প্রতিদিন সে বৈচি ফলের মালা গেঁথে শ্রীকান্তকে দিত। শ্রীকান্তের মনে তখন ভালোবাসার কোনো অনুভূতি ছিল না। রাজলক্ষ্মী যে ভালোবেসে শ্রীকান্তকে মালা দিত তা কখনো কল্পনায় আসেনি। বালিকা রাজলক্ষ্মীর বাল্যপ্রেমই তার জীবনের রক্ষাকবচ। এই প্রেম-ভাবনা তার বাইজী জীবনের দুঃখ কষ্টের মধ্যেও অন্তরের পবিত্রতা বোধ জাগিয়ে রেখেছিল। সমালোচক লিখেছেন, 'দেহে যখন যৌবন অনাগত তখন তাহার

কিশোরী হৃদয়ে সেই আগুনের পরশ লাগিয়াছিল, সে যে চির যৌবনের অমৃত পরশ। সে অগ্নির পরশ এমনই গোপনে ঘটিয়াছিল যে দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে নাই। সে যেন একান্তই তাহার নিজের; সংসার নয়, সমাজ নয়, বোধ হয় ভগবানও নয়—কেহই তাহার সাথী ছিল না। সেই প্রেম এমনই যে তাহার মন্ত্রটাই রাজলক্ষ্মীর গুরু হইয়াছে, আর কোন গুরুর আবশ্যক হয় নাই।'

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের ঘটনাক্রমে পিয়ারীর বাল্য প্রেমের বিশেষ কোনো বর্ণনা নেই। কিন্তু কাহিনির শেষ পর্যন্ত শ্রীকান্তের প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় পেয়েছি। অসুস্থ অবস্থায় শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর পাটনায় বাড়িতে হাজির হলে গোপন প্রেম প্রকাশ পেয়েছে। রাজলক্ষ্মীর বাল্যপ্রেম ছিল একেবারে নীরব। হৃদয়ের গভীরে শিকড় পোঁতা থাকলেও বাইরে তার কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না। শ্রীকান্তকে নিয়ে তার প্রেমের চরিতার্থ হবে— এই আশা বৃথা। নিজে দরিদ্র অসহায় বলে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। দত্ত বাড়ির পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুই বোনকে বিয়ের নামে অকুল পাথারে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের রাতেই 'স্বামী সম্পর্কধারী মানুষটি নগদ টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলে আর ফিরে আসেনি। তাদের এই দুঃখের জীবনকে তার যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে কাশীতে নাচ-গান শিখে বাইজীবৃত্তি বেছে নিয়ে জীবন কাটিয়েছে। চরম হতাশার মধ্যে নতুন জীবনের বার্তা ধ্বনিত হয়েছে রাজলক্ষ্মীর মধ্যে দিয়ে। পিয়ারীর মাধ্যমে সমকালীন কুলীন মেয়েদের দুরবস্থার দিকটির কথা সুকৌশলে উত্থাপন করেছেন লেখক।

ছলাকলা পূর্ণ বাইজী হিসেবে রাজলক্ষ্মী বহু পুরুষের মনোরঞ্জন করেছিল। এই নতুন পেশা তাকে অনেক অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে বাইজীর জীবন বেছে নিলেও তার অন্তর কখনো এই বৃত্তির দ্বারা কলুষিত হয়নি। বাইজী জীবনের পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যেও সে নিজের অন্তরে শুচিশুভ্র প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল। জীবনের এই মহা মুল্যবান সম্পদের কথা সে সকলের কাছে গোপন রেখেছিল। এমনকি নিজেও কখনো ভাবেনি তার এই সুপ্ত প্রেম কোনোদিন চরিতার্থ হবে। তাই কুমার সাহেবের তাঁবুতে প্রথম শ্রীকান্তর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে নিজেকে প্রকাশ করেনি। বরং নিজের পেশাগত পরিচয় প্রকট করতে চেয়েছে। স্বেচ্ছায় এমন আচরণ করেছে, যাতে শ্রীকান্তর মন বাইজীর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু পরে তা হিতে বিপরীত হয়েছে। কুমার সাহেবের তাঁবু থেকে শ্রীকান্ত শ্মশান অভিযানে গেলে পিয়ারী তাকে বারণ করেছে। মনের মানুষকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার প্রয়াস তখন আমরা প্রথম লক্ষ করেছিলাম। পিয়ারীর নিষেধ না মেনে শ্রীকান্ত শ্মশানে গেলে প্রিয়জনের বিপদের কথা ভেবে খানসামা রতন ও অন্যান্যদের পাঠিয়েছিল ফিরিয়ে আনতে। তখন আমরা পিয়ারীর অন্তরের বিশুদ্ধ প্রেমের প্রমাণ পেয়েছি। এই ঘটনার পর থেকে শ্রীকান্ত পিয়ারীর প্রেম সম্পর্কের বিকাশ দেখা গেছে।

পিয়ারীর কৃত্রিম-রং-মাখা মূর্তিটির ভেতরে যে প্রেমময়ী কল্যাণী রাজলক্ষ্মী লুকিয়ে ছিল, তা আমরা বুঝে নিতে পেরেছি। রাজলক্ষ্মীর অগ্নিপরীক্ষায় জয়ী রূপ দেখে শ্রীকান্ত তাকে জীবনের প্রধান অবলম্বন

বলে ভাবতে শুরু করেছে। প্রেমে বিজয়িনী রাজলক্ষ্মী তখন প্রেমের মধ্যে কল্যাণ চেতনার প্রকাশ দেখতে পেয়েছে। অসুস্থ শ্রীকান্তকে পাটনার বাড়িতে এনে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলার মধ্যে মমতাময়ী কল্যাণমূর্তিটির পরিচয় পাই। পাটনার বাড়িতে শ্রীকান্তর সান্নিধ্যে প্রতি পদক্ষেপে তার সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। রাজলক্ষ্মীর শয়নগৃহের শুচিশুভ্র পবিত্র রূপ দেখে শ্রীকান্ত নিজেও বিস্মিত। সে বুঝতে পেরেছে পিয়ারী অন্যান্য বাইজীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সতীনের ছেলে বঙ্কুর কথায় জানা যায় রাজলক্ষ্মী সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট সম্পর্কে সহানুভূতিশীল। শুধু মুখে নয়, কাজে-কর্মে সে মানবদরদী। গ্রামে আট দশজন ছেলের পড়াশুনার খরচ সে নিয়মিত বহন করে। প্রবল শীতে সে বহু মানুষকে কাপড় দেয় এবং গ্রামের লোকের জলকষ্টের কথা ভেবে নিজের উপার্জনের টাকায় পুকুর খনন করিয়ে দেয়।

রাজলক্ষ্মীর মমতাময়ী রূপের পরিচয় আমরা উপন্যাসের অনেকস্থানে পেয়েছি। বহু প্রতিবন্ধকতার কারণে তার মধ্যে নারী হৃদয়ের সহজাত বৃত্তিগুলি বিকশিত হতে পারেনি। তার মা তাকে বিবাহ দিয়েছিল শুধু সমাজ কলঙ্ক ঘোচাতে। কিন্তু একদিনের জন্য বিবাহিত জীবনের স্বাদ সে পায়নি। পত্নী বা মাতা রূপে তার জীবনে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। তার অস্থিমজ্জায় বিবাহিত নারীর সংস্কার বেঁচে রয়েছে। নারীজীবনে মাতৃত্বের স্বাদ পেতে সে বঙ্কুর মা হয়ে থাকতে চেয়েছে। এই মাতৃসত্তার মর্যাদা রক্ষার্থে নিজের প্রেমিককে নির্মমভাবে দূরে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এটা যে তার পক্ষে কতখানি মর্মান্তিক যন্ত্রণার ব্যাপার, তা জেনেও এই নির্মম সত্যকে বরণ করে নিয়েছে। উপন্যাসে সর্বদা আমরা দেখেছি, সে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করবার কথা কখনো ভাবেনি।

পিয়ারী নিজের প্রেমচেতনাকে জীবনের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করেছে। অসুস্থ শ্রীকান্তকে দূরে সরিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন মাতৃসত্তার মর্যাদা রক্ষা করেছে, অন্যদিকে অন্তরের প্রেমবাসনাকে সচেতনভাবে রক্ষা করেছে। পাটনায় শ্রীকান্তকে কাছে পেয়ে পিয়ারী বুঝতে পেরেছিল এখানে সে দীর্ঘদিন বাস করলে তার স্বাভাবিক জীবনধর্ম খুইয়ে সুখভোগী হয়ে উঠবে। এই সুখভোগ তার এতদিনের দুঃখ দারিদ্র্য জীবনের লালিত প্রেমকে নষ্ট করে দেবে। অতিরিক্ত আরাম ও সুখের মাঝে পড়ে শ্রীকান্তের জীবনধর্মের বিচ্যুতি ঘটবে। তখন শ্রীকান্ত আর পাঁচজন সাধারণ সুখসন্ধানী মানুষের সমতুল হয়ে উঠবে। এই অবনমন থেকে শ্রীকান্তকে মুক্তি দিতে ও নিজের জীবনধর্মকে রক্ষা করতে সে দুজনের মাঝে মাতৃত্বের প্রাচীর তুলে শ্রীকান্তকে অসুস্থ অবস্থাতেই বিদায় দিয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে রাজলক্ষ্মীর সংযম ও প্রেমের বলিষ্ঠতার প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীকান্ত তার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলতে পেরেছে, 'তোমার ঋণ ইহজীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সংকল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।'

রাজলক্ষ্মীর এই দুর্লভ মহৎ প্রেমের পরিচয় পেয়ে শ্রীকান্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে ত্যাগ করে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে-প্রেম রাজলক্ষ্মীর জীবনের রক্ষা কবচের চেয়ে অধিক, যে-প্রেম তার জীবনে

শৃঙ্খলা এনে দিয়েছ, সে-প্রেমকে রক্ষা করতে শ্রীকান্তও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার রাজলক্ষ্মীর প্রেমধর্মের মহত্ত্বের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'রাজলক্ষ্মী তাহার আত্মগত গভীর পিপাসাকে, নিজ অন্তরে ধারণ করিয়া চিত্তকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিল। সেই প্রেম একটা শক্তিরূপে—রক্ষাকবচের মতোই—সকল অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও তাহাকে শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। সেই প্রেমই তাহার গুরু, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। তাহার প্রাণ সেই গুরুর চরণে 'একটি নমস্কারে' চির প্রণত হইয়া আছে।' এভাবে নানা গুণে গুণান্বিত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলির মধ্যে রাজলক্ষ্মী রূপে গুণে, মাধুর্যে, ঔদার্যে এক প্রগতিশীল নারীর সম্মানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

অন্নদাদিদি :—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যে নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে অন্নদাদিদি বিচিত্রতম। কাহিনিতে তার আগমন ঘটেছে কোনোরকম ভূমিকা ছাড়া। আবার বিদায়ের বেলাতেও এরকম ভাবে চলে যাবে তা পাঠক কল্পনা করেনি। ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযানের সময়ে আমরা প্রথম অন্নদাদিদির কথা জানতে পারি। তারপর থেকে তার জীবনের নানা গুণের কথা জানতে পারি শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায়। অন্নদাদিদির সুগভীর জীবনপ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করেছে। সমাজ সংসারের ভয়ে দীর্ঘকাল লুকিয়ে থেকে, নিজের পরিচয় গোপন করে সে গভীর অরণ্যে বাস করেছে শাহজীর সঙ্গে। কিন্তু বাউন্ডুলে, নেশাখোর, সাপুড়ে স্বামীর ঘরে নিত্যদিনের অভাব মেটাতে সচেষ্ট থেকেছে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনীর মতো সে ধর্মান্তরিত মুসলিম স্বামীকে গভীর ভালোবাসা রেখে বাঁচতে চেয়েছে। প্রবল আত্মসম্মানবোধ, দুঃখ সহ্য করবার অসীম ক্ষমতা তার চরিত্রকে অনন্য করে তুলেছে। বাস্তব সমাজের নিন্দা-ভয়-লজ্জা-ঘৃণার ঊর্দ্ধে উঠে এক উজ্জ্বল নারী চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে।

মানব সমাজের বইরে লোকচোখের আড়ালে এক আরণ্যক আদিম পরিবেশে কঠোর বিবেকযন্ত্রণার দহনে দগ্ধ হয়ে সনাতন নারী ধর্মের জয় ঘোষণা করেছে। উপন্যাসে অন্নদাদিদির প্রথম পরিচয়ে আমরা এক কঠোর কঠিন সংগ্রামী সাধিকার রূপ খুঁজে পাই। তাকে শ্রীকান্তর প্রথম দেখে মনে করেছে, 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি, যেন যুগান্তর ব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন।' অন্নদাদিদির সম্পর্কে খোঁজ নিলে জানা যায় তিনি ধনীর ঘরের কন্যা ছিলেন। তার স্বামী শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই ছিলেন। সেখানে তার বিধবা দিদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে তাকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। দিদির মৃত্যু তার মর্মে আঘাত হেনেছিল। নারীত্বের লজ্জা ও গ্লানি তাকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করছিল। দীর্ঘ সাত বছর পিতার ঘরে স্বামী পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার কারণে অনেক অসম্মান সহ্য করতে হয়েছিল। শেষে একদিন তার স্বামী মুসলমান সাপুড়ের বেশে গ্রামে এলে অন্নদাদিদি তার সঙ্গে আবার ঘর ছেড়ে চলে গেছে। নিজের দুর্ভাগ্যের দায় নিজের হাতে তুলে নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে অকূল সাগরে ভেসে চলেছে। এই অবস্থায় স্বামীর ভালোবাসা ও প্রীতি তার ভাগ্যে জোটেনি। বরং প্রতিদিন জুটেছে নির্মম অত্যাচার, গালাগালি ও শারীরিক মানসিক প্রহার। প্রবল দুঃখের মধ্যেও নিজে ঘুঁটে বিক্রি করে, কাঠ কুড়িয়ে, স্বামীর আহার্য ও নেশার দ্রব্যের যোগান দিয়েছে।

অন্নদাদিদির গভীর স্বামীপ্রেম ও হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যধর্মে শ্রদ্ধার কারণে স্বামীর সমস্ত অন্যায় কাজ মেনে নিয়েছে। হিন্দু নারীর কাছে পতি যে কেবল এক প্রিয় ব্যক্তিমাত্র ছিল না, বরং ছিল এক আদর্শের প্রতীক—তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা তা স্পষ্ট বুঝে নিতে পারি। অন্নদাদিদির স্বামী হয়েও তিনি বিধবা দিদিকে হত্যা করেছে, স্ত্রীকে ফেলে চলে গেছে, নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করেছে—তা সত্ত্বেও তিনি স্বামীর জন্য সব বিসর্জন দিয়ে ঘর ছেড়েছেন। হিন্দু নারী স্বামীর আদর্শকে শ্রদ্ধা করে। লেখক এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে সেই সনাতনী আদর্শের কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ব্যক্তিরূপের চাইতে তাদের কাছে পতিত্বের আদর্শ অনেক বড় ছিল। স্বামী প্রবল অসংযমী, দুশ্চরিত্র, পাগল, খুনি, বিধর্মী যাই হোক না কেন হিন্দু নারীরা তাদের 'স্বামী সংস্কার' থেকে সরে আসে না, অন্নদাদিদি তার অন্যতম প্রমাণ। বাল্যকাল থেকে 'পতি পরম দেবতা'—এই আদর্শ তার মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছিল। অন্নদাদিদির চরম দুঃখবেদনা সহ্যের মূলে রয়েছে এই প্রচলিত সংস্কারবোধ। সেই বোধে উদ্দীপ্ত চরিত্র অন্নদাদিদি।

অন্নদা নিজেকে স্বামীর অনুগামিনী মনে করেন। দুঃখদারিদ্র্য গ্লানি নিয়ে তিনি স্বামীর সান্নিধ্যে বেঁচে থাকতে চান। এই স্বামী-সান্নিধ্য তাঁর জীবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে হয়। তাই দিদি বলেন, 'তিনি যখন জাত দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বইতো নয়।' আবার স্বামীর মৃত্যুর পর তার দেনা শোধ দেবার তাগিদে বলেছে, 'স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ।' এই ছোট ছোট উক্তির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় অন্নদাদিদি কতখানি স্বামী অনুগতপ্রাণ নারী ছিলেন। তার রক্তে ছিল হিন্দু নারীর সংস্কারবোধ। সংস্কারের দৃঢ়তার কারণে ধর্মান্তরিত স্বামীর সঙ্গে বাস করেও হিন্দু সধবা নারীর সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লোহা ত্যাগ করেননি। এভাবে অন্নদাদিদি পতিব্রতা ধর্মের কারণে সেকালের পাঠকের নজর কেড়েছিল।

অন্নদাদিদি ধনীর কন্যা বলে বাল্যকাল থেকে সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে বড় হয়েছিল। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধের বৈশিষ্ট্যে তিনি উজ্জ্বল। পিতার ঘর ত্যাগ করে শাহজীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হলে তাকে কঠোর দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল। কাঠ সংগ্রহ করে, ঘুঁটে বেচে সংসার চালালেও বাবার বাড়ির কারো কাছে কখনো হাত পাতেনি। দিদিকে ইন্দ্রনাথ খুব ভালবাসত বলে দিদির দুঃখে কাতর হয়ে জোর করে তাকে টাকা দিয়েছে। ইন্দ্রের এই অসাধারণ শক্তির জন্য দিদি তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। কিন্তু শ্রীকান্তের কাছ থেকে টাকা নিতে দিদি কুণ্ঠা বোধ করেছে। তাই তো আমরা দেখি বিদায়ের সময় শ্রীকান্তের দেওয়া পাঁচ টাকা খরচ না করে গ্রামের মুদির দোকানে রেখে গেছে। শ্রীকান্ত অনুতপ্ত হয়ে বলেছে, 'আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে গর্বে কতদিন কত আকাশ কুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। ... ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না...।' দুঃখ যাদের নিত্য সঙ্গী সেই মানুষদের মধ্যে আত্মমর্যাদার এই চেতনা দেখে আমরা প্রাণিত হয়েছি।

ধনীর কন্যা হয়ে, দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটলেও অন্নদাদিদি বলিষ্ঠ জীবনধর্মে উজ্জ্বল চরিত্র। তার জীবনবোধে কোনো ফাঁকি বা বঞ্চনা নেই। তিনি যা করেছেন তা এক গভীর সত্যবোধে প্রতিষ্ঠিত। শাহজী মিথ্যা কথা বলে ইন্দ্রনাথের কাছে টাকা নিত বলে অন্নদাদিদি মানসিক যন্ত্রণা পেতেন। তাই তিনি ইন্দ্রের কাছে আসল সত্য প্রকাশ করে হৃদয়ের ভার লাঘব করেছেন। ইন্দ্রকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, 'আমরা মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে, কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কিনা জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।' ইন্দ্রের কাছে এই ধ্রুব সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে বলে শাহজী দিদিকে প্রচণ্ড মেরেছে—কিন্তু সমস্ত মার দিদি মুখ বুজে সহ্য করেছে। আবার শাহজীর নামে ইন্দ্রের কাছে কোনো অভিযোগ পর্যন্ত করেনি। পরিবর্তে দিদি শাহজীর বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে শুতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাতা ধরিত্রীর মতো অন্নদাদিদি সর্বংসহা এক নারী চরিত্র। অসাধারণ দুঃখের মধ্যে তিনি সংসার-সমাজ ত্যাগ করে সুখের সন্ধান করেছেন। বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছেন কষ্টের জীবনের মধ্যে। মানুষের এক জীবনে যত দুঃখ ভোগ সম্ভব তা সে করেছে। বিধবা দিদি মারা গেছে, পিতার ঘর ছেড়েছে, নেশাখোর উপার্জনহীন স্বামীর সাথে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছে। কোনো কিছুতে তার আত্মসুখ অন্বেষণের বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায়নি। বিবাহিত জীবনের সুখভোগ কোনোদিন হয়নি। খুনী, ঠক, প্রবঞ্চক, ধর্মত্যাগী স্বামীর সঙ্গে পিতার ঘর ছেড়েছেন বলে তিনি 'কুলটা' আখ্যা পেয়েছিলেন। কঠোর দুঃখের মধ্যে দিন কাটিয়েও তিনি অন্তরের পবিত্রতা হারাননি। জীবনের কোনো মলিনতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অনন্ত দুঃখের আগুনে পুড়ে তিনি খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। পার্বতী কঠোর দুঃখ সাধনায় যেমন শিবকে পেয়েছিলেন, তেমনি অন্নদাদিদি দুঃখভোগের মধ্যে জীবনের হলাহল পান করবার শক্তি পেয়েছেন। এই মহীয়সী নারীর দুঃখভোগের কথা স্মরণ করে শ্রীকান্ত পরবর্তীকালে অনুযোগের সুরে বলেছে, 'আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কীসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তার নিলে? তার জাতি নিলে, ধর্ম নিলে—সমাজ, সংসার, সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি তো আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি।' শ্রীকান্তের এই মহানুভবতায় আমরা যেন অন্নদাদিদির মহত্ত্ব আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এখানেই অন্নদাদিদি চরিত্রটির সার্থকতা।

৪.৫ অপ্রধান চরিত্র : মেজদা, নতুনদা, শাহজী

শরৎচন্দ্রের সব উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রগুলি অনেক সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই চরিত্রগুলি না থাকলে ঘটনার যথার্থ পরিস্ফুটন সম্ভব হয় না। সে কারণে মূল কাহিনির কেন্দ্রীয় পুরুষ ও নারী চরিত্রের পাশে বহু অপ্রধান চরিত্র সৃজন করেন। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের প্রধান চরিত্রগুলির পাশাপাশি অপ্রধান চরিত্রগুলির বিচরণ কাহিনির সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলেছে।

এখানে শ্রীকান্ত চরিত্রের শৈশব কৈশোরের নানা ঘটনার সাক্ষী হিসেবে এসেছে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে আবার কয়েকটি চরিত্র কাহিনির আবর্তে স্থান পেয়েছে। আবার শ্রীকান্তর শৈশবের নানা ঘটনার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে অপ্রধান চরিত্রগুলি। উপন্যাসের মেজদা, শাহজী, নতুনদাদা, রতন, পিসেমশাই, পিসিমা, ছিনাথ বহুরূপী, কুমার সাহেব, খানসামা রতন, গৌরী তেওয়ারীর মেয়ে, রামবাবু ও তাঁর পত্নী প্রমুখ ছোটখাটো চরিত্রগুলি নানাভাবে কাহিনির উপভোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছে। আবার এই চরিত্রগুলির সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদের শ্রীকান্ত জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছে। লেখক এই অপ্রধান চরিত্রগুলি সৃষ্টি করে স্বল্প পরিসরে এদের মূল চারিত্র্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মূল কাহিনির সঙ্গে এদের যোগসূত্রের কথা আভাসে ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেকারণে এই অপ্রধান চরিত্রগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করব।

মেজদা :—শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে 'মেজদা' একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র। সে শ্রীকান্তর পিসতুতো ভাই। বিচিত্র শাসন পদ্ধতিতে সে বাড়ির ছোট দুই ভাইকে লেখাপড়ায় মনোযোগী করবার চেষ্টা করেছে। কঠোর মানুষের মধ্যে যে প্রচণ্ড ভীরু একটি প্রাণ লুকিয়ে ছিল তা কাহিনি পাঠক মাত্রই জানেন। মেজদা নিজেও পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী। সে দুবার এন্ট্রান্স ফেল করে তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সময় সম্পর্কে সে অতি সচেতন। তার পাশের পড়ার জন্য যাতে কোনো সময় নষ্ট না হয় সে বিষয়ে ভীষণ সতর্ক। সময় বাঁচাবার জন্য অন্য ভাইদের জন্য বিচিত্র ব্যবস্থা চালু করেছিল। কাঁচি দিয়ে কাগজ টুকরো করে তার একেকটিতে 'বাইরে', 'থুতু ফেলা', 'নাক ঝাড়া', 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি শব্দ বন্ধ লিখে রেখেছিল। এই চিরকুটের একটি করে নিয়ে এক এক জনকে বাইরে যেতে হত। তারা কেউ যাতে সময় নষ্ট না করে সেদিকে মেজদার সজাগ দৃষ্টি ছিল। ভাইদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে ও সময় নষ্টের হিসাব রাখতে গিয়ে, যে নিজের সব সময় নষ্ট হয়ে যেত, সেদিকে তার খেয়াল নেই। এইসব কাণ্ডকারখানার জন্য তার পড়াশুনা যে পণ্ড হতে চলেছে, সেদিকে তার নজর নেই। এই কারণে বছর বছর সে ফেল করে। উপন্যাসে তার কথায় বলা হয়েছে, 'মেজ'দার দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এনন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার।'

উপন্যাসে গম্ভীর রাশভারী শাসক মেজদা ছিল প্রচণ্ড ভীতু। তাই এক সন্ধ্যায় শিশুদের পড়াশুনার সময় হঠাৎ বাঘের আগমন ঘটলে মেজদার ভয়ের পরিচয় পাই। একটা 'হুম' শব্দে মেজদা একেবার চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছিল। নিজে ফিট হয়ে গিয়ে অন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে ছেড়েছিল সে। মেজদা চৈতন্য ফিরে পেয়ে সেই বাঘের কথায় বলেছিল, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। সে এক মস্ত ভালুক হোক বা বাঘ হোক, সেটি উপস্থিত হয়েছিল বলে আমরা মেজদাদার সাহসটুকুর পরিচয় পেয়েছিলাম। কিন্তু শেষে দেখা গেল এ সেই বারাসতের শ্রীনাথ বহুরূপী। সে প্রতিবছর এই সময়ে এসে তাদের বাড়ি থেকে কিছু রোজগার করে নিয়ে যায়। আসলে এই বাঘের ঘটনাতে মেজদার শোচনীয় পরিণতি কাহিনিতে অনাবিল হাস্যকৌতুকের

সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অভিযান শেষে ক্লান্ত অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এলে আমরা আবার মেজ'দার এক ঝলক দেখা পেয়েছিলাম। কিন্তু পিসিমার দৃষ্টিতে শ্রীকান্ত তখন অসুস্থ বলে মনে হওয়ায় মেজদা বিশেষ কিছু বলতে পারেনি। এরকম ছোট ছোট চরিত্রগুলি আমাদের খণ্ড খণ্ড আনন্দের স্বাদ দেয়। মেজদা চরিত্র সেকারণে বিশেষ গুরুত্ববহ।

শাহজী :—'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা প্রথম শাহজী চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি অন্নদাদিদির ধর্মান্তরিত স্বামী। অন্নদার বিধবা দিদির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত দিদিকে হত্যা করে শাহজী। সাত বছর ধরে নিরুদ্দেশ থাকার পর পুনরায় গ্রামে মুসলমান সাপুড়ের বেশে উপস্থিত হয়ে অন্নদাদিদিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। শাহজী অপ্রধান চরিত্র হলেও কাহিনিতে তার গুরুত্ব রয়েছে। এককথায় শাহজী হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, বিবেকবোধ শূন্য, প্রতারক ও নারীঘাতক চরিত্র। সে ছিল অন্নদার বাড়িতে ঘর-জামাই। কঠোর সতীত্বের আদর্শে বিশ্বাসী অন্নদার মতো স্ত্রীকে পেয়েও সে বিধবা দিদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয় লোক অপবাদের ভয়ে তাকে হত্যা করেছে। আসলে শাহজী সব কাজগুলি করেছে সুপরিকল্পিতভাবে। সেদিক থেকে সে ক্ষমার অযোগ্য এক প্রতারক পুরুষ চরিত্র।

শাহজীর হৃদয়হীনতার কথা জেনেও অন্নদাদিদি হিন্দু ধর্মের 'স্বামী সংস্কার' মেনে তাকে আবার গ্রহণ করেছে। জঘন্য অপরাধে অপরাধী খুনি স্বামীর জন্য অন্নদাকে পিতার ঘরে কলঙ্কিনী সেজে থাকতে হয়েছে। অসহ্য দুঃখ সহ্য করতে না পেরে দুর্বৃত্ত স্বামীর সঙ্গে অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এই কৃতকর্মের জন্য শাহজীর কোন অনুশোচনা নেই। বরং সে সর্বদা নেশা করে অন্নদাদিদিকে শারীরিক ও মানসিক পীড়া দিয়েছে। দিদি নিজে ঘুঁটে কুড়িয়ে, কাঠ সংগ্রহ করে স্বামীর আহার্য ও নেশার সামগ্রী জোগাড় করে দিয়েছে। অন্নদাদিদি এত কষ্ট সহ্য করলেও তার প্রতি শাহজীর কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। পত্নীর এত ত্যাগ ও সেবায় তুষ্ট না হয়ে সে নির্দয়ের মতো ব্যবহার করেছে। কারণে-অকারণে প্রহার ছিল শাহজীর কাছে অন্নদাদিদির একমাত্র উপহার। তবুও স্বামীকে সে ঈশ্বরের মতো শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সৌভাগ্যের শিখর থেকে দুর্ভাগ্যের অতলে ডুবে গিয়েও অন্নদা কখনো শাহজীর উপর রাগ করেনি এখানেই তার অনন্যতা।

শাহজী হীন প্রতারক চরিত্র। সে সাপ ধরার মন্ত্র, মড়া মানুষ বাঁচানোর মন্ত্র ইত্যাদি শেখাবার নাম করে ইন্দ্রনাথের কাছে নিয়ত মিছামিছি টাকা নিয়েছে। এই প্রতারণার কথা দিদি ইন্দ্রনাথকে বলে দিলে হিংস্র স্বভাবের শাহজী অন্নদাদিদিকে প্রচণ্ড প্রহারে অচৈতন্য করে দিয়েছে। সে ইন্দ্রনাথকে বর্শা দিয়ে আঘাত খুন করতে চেয়েছে। যখন সে বুঝেছে ইন্দ্রনাথ তার চেয়ে শক্তিশালী; তখন সে নিরস্ত হয়েছে। উপন্যাসের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা শাহজীর সাক্ষাৎ পাই। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি সাপের কামড়ে শাহজীর মৃত্যু হয়েছে। তার সকল নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে অকাল মৃত্যুতে। জীবনে যত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করেছে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার অবসান ঘটে গেছে। লেখক অন্নদাদিদির মুখে শাহজীর মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে।

সেখানে ঐ সাপটি ধরিয়া যাহা বকশিশ পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরিয়া দিদির পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাঁহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।' এভাবে একটি মানুষের মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন মানুষের জীবনে যেমন অন্যায় অত্যাচার নিষ্ঠুরতা আছে তেমনি সেসব পাপ কর্মের সাজাও অনেক সময় এক জীবনেই ঘটে যায়। এভাবে কাহিনিতে শাহজী চরিত্রটিকে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তিনটি পরিচ্ছেদে জীবন্ত করে রেখেছেন।

নতুনদা :—'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নতুনদা চরিত্রটি কিছু বৈচিত্র্যের কারণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা নতুনদার সাক্ষাৎ পেয়েছি। চরিত্রটির উৎকট স্বার্থপরতা, চরম আত্মকেন্দ্রিকতা ও হাস্যকর ভীরুতার জন্য বাংলা সাহিত্যে চিরনূতন হয়ে রয়েছে। মেজদা যেমন শ্রীকান্তর পিসতুতো ভাই এই নতুনদা তেমনি ইন্দ্রনাথের মাসতুতো ভাই। তিনি মহানগর কলকাতার বাসিন্দা। পোশাকপরিচ্ছদ কথাবার্তায় চালচলনে তিনি নিজেকে সর্বদা 'কলকাতার বাবু' সমাজের প্রতিনিধি বলে জাহির করতে চেষ্টা করেন। তাঁর পরনে সিল্কের মোজা, পায়ে চককে পাম্প-সু, শরীর ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি। নতুনদা খাস কলকাতার বাবু বলে কলকাতার বাইরের মানুষদের প্রতি তার ঘৃণা ও অবজ্ঞার শেষ নেই। কলকাতার মানুষ বলে তার শিক্ষাদীক্ষা, আচার-আচরণ ও সঙ্গীতশিক্ষার গুণে তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই মনোভাবের কারণে ইন্দ্রনাথের সাধের ডিঙিতে উঠেই 'যাচ্ছেতাই' বলতে দ্বিধা করেননি। ইন্দ্রর প্রাণের সঙ্গী শ্রীকান্তর নামের 'শ্রী' শব্দটি নিয়ে বিদ্রুপ করেছেন। শ্রীকান্তর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে নিজের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এক অপরিচিত ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ঢঙে কথা বলে নিজের চারিত্রিক হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রচণ্ড শীতের রাতে শ্রীকান্তর গায়ের চাদরকে নোংরা বলে আবার সেই চাদর পেতে আরামে বসে পড়েছে। এদিকে নিজে সব ধরনের শীত পোশাকে সেজেগুজে এক সাধারণ বালকের গায়ের চাদরটা নিয়ে নিতে তার বিন্দুমাত্র বাধেনি। এই শীতে শ্রীকান্তর গায়ে যে কিছু রইল না সে চিন্তা তার মনকে একবারও আঘাত করেনি। বলা চলে সে একেবারে হৃদয়হীন চরিত্র। প্রবল শীতের রাতে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ পালা করে গুণ টেনে নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কোনো সাহায্য তো দূরে থাকুক ডিঙির হালটি ধরতে রাজী হননি। নিজের দামী দস্তানা ও পোশাক যাতে বিন্দুমাত্র নষ্ট না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন। নতুনদা নিজের জিনিসপত্র সম্পর্কে অতি সতর্ক। শ্রীকান্তের ভাষায়, 'পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চড়িলে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।' নতুনদা নিজের সঙ্গীতপ্রতিভা নিয়ে অহংকারবোধ করেছেন। নিজেকে 'দর্জিপাড়া'র

ছেলে বলে নিজের সুখ্যাতি করেছেন। তিনি হারমোনিয়াম বাজাতে অতি দক্ষ; অনুষ্ঠানে না পৌঁছতে পারলে সেই গ্রামদেশে অনুষ্ঠান শুরু হবে না। ইন্দ্রের কথায় যখন জানতে পেরেছে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাতে রাত দুটো বেজে যাবে, তখন গঙ্গার মৃদুমন্দ হাওয়ায় তার ক্ষুধার উদ্রেক ঘটেছে। রাত তখন এগারোটা। এই গ্রামের মাঝে কোনো দোকান আর খোলা নেই। কিন্তু দুই বন্ধু নতুনদাকে রেখে খাদ্যবস্তুর সন্ধনে যাত্রা করেছে। সে সময়ে 'ঠুন ঠুন পেয়ালা' গানটি হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে। এভাবে নতুনদা এক অদ্ভুত 'কলকেত্তাই' চরিত্র হয়ে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের বিরক্তি উৎপাদন করেছিল।

নতুনদা'র জন্য ইন্দ্র যখন গ্রামের ভেতর খাবার সন্ধান করতে চলেছে তখন দাদাকে সঙ্গে যেতে বলেছিল। সেসময় দাদা নিজের অহংবোধের কথায় বলেছে, 'আমারা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে, তা জানিস কিন্তু তা ব'লে ছোটলোকেদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।' একজন শহুরে মানুষ যে গ্রামের মানুষদের সম্পর্কে এত হীন মনোভাব পোষণ করতে পারে তা নতুনদাকে না দেখলে জানা সম্ভব হত না। শরৎচন্দ্র একই সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন বলে এরকম বহু চরিত্র আঁকতে পেরেছিলেন।

মাঝরাতে দুই বালকের খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টার জন্য নতুনদা কোনো সাধুবাদ জানাননি। দাদার এই আচরণে ইন্দ্র শ্রীকান্তের কাছে একটু লজ্জিত হয়েছিল। সঙ্গীতপ্রতিভার অহংকার শেষ পর্যন্ত কুকুরের তাড়ায় গঙ্গাজলে ধুয়ে গেছে। দাদার গান ও অপরিচিত পোশাক দেখে গ্রামের কুকুরের দল তাকে তাড়া করলে শেষে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। প্রচণ্ড শীতের রাতে জলে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় আমরা তার চরম ভীরু মানসিকতার পরিচয় পাই। ইন্দ্রনাথ দাদার এই দুরবস্থা দেখে তাকে জলে নেমে উদ্ধার করলেও তার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে বরং তাকে গালাগালি দিয়েছেন। নিজের শরীরের চেয়ে পরিধেয় বস্ত্রগুলির জন্য আক্ষেপ তার মনকে বিষণ্ন করেছিল। উৎকট স্বার্থপরতা, চরম আত্মকেন্দ্রিকতা, শূন্যগর্ভ অহংকারের সমন্বয়ে এক আধুনিক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মানুষ হিসেবে নতুনদা'র জুরি মেলা ভার।

৪.৬ অনুশীলনী

৪.৬.১ সংক্ষিপ্ত আলোচনামূলক প্রশ্ন :

১. ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তর নিশীথ অভিযানের বর্ণনা দিন।

২. অন্নদাদিদির গৃহে শ্রীকান্তর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

৩. শ্রীকান্ত'র মহাশ্মশানে অভিযানের কাহিনি সংক্ষেপে লিখুন।

৪. শ্রীকান্ত কোন্ অবস্থায় পাটনা থেকে রাজলক্ষ্মীর বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৫. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে শ্রীকান্তের যৌবনে সন্ন্যাসজীবনের কাহিনি বর্ণনা করুন।

৬. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে শাহজী চরিত্রের পরিচয় দিন।

৭. উপন্যাসে শাহজীর মৃত্যু ও অন্নদাদিদির মানসিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখুন।

৮. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) অবলম্বনে পিয়ারী ও শ্রীকান্তর সাক্ষাৎকারের মুহূর্ত নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

৯. উপন্যাসে রামবাবু, সাধুবাবা ও গৌরী তেওয়ারীর ঘটনা সংক্ষেপে লিখুন।

১০. 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' এই মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

৪.৬.২ বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন :

১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) কোন্ শ্রেণির গ্রন্থ? ভ্রমণকাহিনি, আত্মজীবনী না উপন্যাস আলোচনা করুন।

২. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাস অবলম্বনে শ্রীকান্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাস অবলম্বনে ইন্দ্রনাথ চরিত্রের মহাপ্রাণতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে পিয়ারী বাইজী বা রাজলক্ষ্মীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় দিন।

৫. শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনার ধারায় 'শ্রীকান্ত'র স্থান নির্ণয় করুন।

৬. 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা চলে কি না তার সপক্ষে যুক্তি দিন।

৭. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মূল কাহিনির পাশে অন্নদাদিদি-শাহজী বৃত্তান্ত কতখানি প্রাসঙ্গিক হয়েছে তা বিচার করুন।

৮. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসের সামগ্রিক আবেদনের কাছে অন্নদাদিদির মূল্য কতখানি তা বিচার করুন।

৯. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসে পিয়ারী বাইজীর রাজলক্ষ্মীতে রূপান্তরের কাহিনি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

১০. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাস অবলম্বনে শরৎচন্দ্রের গদ্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাস হাস্য ও কৌতুকরসের প্রকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

১২. 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠনশৈলীর পরিচয় দিন।

৪.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* : ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২. *বাংলা উপন্যাসে কালান্তর* : শ্রী সরোজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৩. *জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র* : ড. অজিত কুমার ঘোষ

৪. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (পঞ্চম খণ্ড) : ড. সুকুমার সেন

৫. শরৎচন্দ্র পুনর্বিচার : অরণকুমার মুখোপাধ্যায়

৬. শরৎসাহিত্যের মূলতত্ত্ব : হুমাউন কবীর

একক-৫ ❑ ছোটগল্প : 'দেনাপাওনা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ ছোটগল্পের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

৫.৪ গল্পকার রবীন্দ্রনাথ

৫.৫ 'দেনাপাওনা' : ছোটগল্পের প্রকাশ ও বিষয়বস্তু

৫.৬ 'দেনাপাওনা' : বিষয় বিশ্লেষণ

৫.৭ 'দেনাপাওনা' : রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা বা সমাজ-সমস্যার শিল্পরূপ

৫.৮ নামকরণ ও চরিত্র বিচার

৫.৯ অনুশীলনী

৫.৯.১ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

৫.৯.২ বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

- বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের স্বরূপ সম্পর্কে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।
- গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সাধারণ পরিচয় জানা যাবে।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' গল্পের বিষয়বস্তু জানতে পারা যাবে।
- সমাজ-সমস্যামূলক গল্প 'দেনাপাওনা'য় নিরুপমা দুঃখ-বেদনার কথা জানা যাবে।
- পণপ্রথা উনিশ শতকের বাংলাদেশে কী ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল তার এক টুকরো ছবি আমরা খুঁজে পাব এই পাঠ থেকে।

৫.২ প্রস্তাবনা

বাংলা কথাসাহিত্যের নবীনতম শাখা ছোটগল্প। এই ধারার সার্থক স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বাংলা ছোটগল্প পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুসরণে রচিত। রবীন্দ্রনাথ পদ্মাতীরে শিলাইদহে

বসবাস করবার সময় প্রথম ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। অতি সাধারণ মানুষদের দেখে তাদের জীবনের সাদামাঠা কথা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী, 'সবুজপত্র' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠ্য 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পটি সেকালের সমাজ-সমস্যার এক উল্লেখযোগ্য দলিল। পণপ্রথার অভিশাপ মানুষের জীবনকে কতখানি দুর্বিষহ করে তুলেছিল সেকথা আমরা এই গল্পটি থেকে জেনে নিতে পারব। সামাজিক প্রথার নিষ্ঠুরতা নিরুপমার জীবনে মৃত্যু ডেকে এনেছিল। সেই চিরন্তন সত্যের বাস্তব রূপায়ন 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পটি।

৫.৩ ছোটগল্পের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন শিল্প-আঙ্গিক হিসেবে ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ। পূর্ণ জীবন নয়, বরং জীবনের খণ্ডাংশই এখানে প্রাধান্য পায়। এই সময়ে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্প জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এসেছে। একক অনুষঙ্গের আধারে ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে পূর্ণ জীবনের ব্যঞ্জনা। মূলত আমেরিকায় ছোটগল্পের জন্ম হলেও ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো ভারতবর্ষেও পৌঁছে গেছে এই শিল্পধারা। উনিশ শতকের নয়ের দশকে বাংলা ছোটগল্পের যাত্রা শুরু। রবীন্দ্রনাথ সে-যাত্রার অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর হাতে ঘটেছে বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল মুক্তি।

সাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ শিল্পমাধ্যম হল ছোটগল্প। Elizabeth Bowen লিখেছেন, The short story is a younger art as known it– it is a child of the nineteenth Century. একটি অতৃপ্তির মধ্যে ছোটগল্প সমাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই লিখেছিলেন,

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

ছোটগল্পে 'প্রতীতি'র সমগ্রতা থাকা প্রয়োজন। ছোটগল্পের কাহিনি হতে হবে সংক্ষিপ্ত, সংযত ও গল্পরস সমৃদ্ধ। একটি মাত্র সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। সমালোচক ব্র্যান্ডের ম্যাথুজ ছোটগল্পের সংজ্ঞায় লিখেছেন, 'A short story deals with a single character, a single event, a single emotion– or a series of emotions called forth by a single situation.' আবার ছোটগল্পে গীতিকবিতার দৃঢ় বন্ধন, নাটকীয়তা ও রোমান্টিক আবেগ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সংজ্ঞায় যে 'ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা'র কথা বলেছিলেন, অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই মতকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তাঁর ভাষায়, 'ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতিজাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনি, যার প্রথম বক্তব্য কোনও ঘটনা বা কোনও পরিবেশ বা কোনও মানসিকতা অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।' ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন, 'ছোটগল্প যেন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার পাতায় গদ্যে লেখা গীতিকবিতা।'

ছোটগল্পের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও নানা বিশিষ্টতার নিরিখে আমরা একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করব। কথাসাহিত্যের যে-শাখা উপন্যাসের তুলনায় ছোট, বিষয় ও ঘটনা একমুখী, সংযমবোধে যার নাটকীয়তা আছে এবং যার মাধ্যমে ব্যঞ্জনধর্মিতা প্রকাশ পায়, সর্বোপরি অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা থাকে না তাকে ছোট গল্প বলা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শাখা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে এরকম :—

১. ছোটগল্পের আয়তন বা বিষয় হবে খুবই ছোট।

২. ছোটগল্পে অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা থাকবে না।

৩. গল্পকাহিনির গতি হবে একমুখী।

৪. প্রতীতির সমগ্রতা বজায় থাকবে।

৫. ক্ষুদ্র আখ্যানে সমগ্র জীবন প্রতিফলিত হবে।

৬. ছোটগল্পের সূচনায় থাকবে আকস্মিক চমক।

৭. রবীন্দ্রনাথের মতে ছোটগল্পের সমাপ্তিতে অতৃপ্তির বেদনা থাকবে।

৮. ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযম বোধ থাকবে।

৯. বর্ণনা বা বিশ্লেষণ নয়, ব্যঞ্জনাই ছোটগল্পের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

১০. ছোটগল্পের মধ্যে একটি শীর্ষ মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স থাকবে।

১১. ছোটগল্পের বাঁধুনি আঁটোসাঁটো হতে হবে।

১২. ছোটগল্পের ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে চমৎকারিত্ব থাকবে।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আধুনিককালে বহু সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাহিত্যরীতির স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে এখনো বাংলা ছোটগল্প বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্রথম যুগের স্বরূপ বৈশিষ্ট্যের উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

৫.৪ গল্পকার রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতক ছিল মানুষের নিয়ত মূল্যবোধের পরিবর্তন ও জিজ্ঞাসার কাল। গোটা বিশ্বে তখন চলছিল নতুন ধারার সাহিত্য সৃজনের প্রক্রিয়া। তখন Novel বা উপন্যাসের দীর্ঘ কাহিনি পাঠের পরিবর্তে মানুষ ছোটগল্প পড়তে উৎসাহী হয়েছিল। সেই চিন্তন থেকে যুগ যন্ত্রণার নতুন ফসল ছোটগল্পের জন্ম। উনিশ শতকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চারজন ছোটগল্পকার হলেন ক. আমেরিকার এডার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯) খ. ফ্রান্সের গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) গ. রাশিয়ার আন্তন চেকভ (১৮৬০-১৯০৪) এবং ঘ. ভারত তথা বঙ্গদেশের রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১- ১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের জনক ও অন্যতম শিল্পী। তাঁর

হাতেই এর পত্তন, পরিচর্যা ও বিকাশ ঘটেছিল। তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় 'নব কাহিনি' নামে ছোট আকারের গল্প লিখতেন। এগুলি ছিল ছোটগল্প রচনার প্রস্তুতি পর্ব। এই সময়কার ঔপনিবেশিক শাসন, পল্লিবাংলার মানুষের নতুন জীবনবোধের মাঝে ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ সার্থক ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। ব্যক্তিগত বিষণ্ণতা, গ্রামবাংলার মাটির মানুষদের জীবনবোধ, দিগন্তব্যাপী পদ্মাতীরের প্রাকৃতিক শোভা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি অতি সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সব মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে 'গল্পগুচ্ছ'র গল্পগুলিতে। তাই 'গল্পগুচ্ছ'র জগৎ সাধারণ মানুষের জগৎ। বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ তখন জীবনকে দেখছেন ঐকান্তিক আন্তরিকতায়। বাংলা কথাসাহিত্যে তখন প্রতাপশালী রাজা-জমিদারদের কথা ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনকথা নিয়ে তিনি প্রথম গল্প লিখলেন। 'সাহিত্যে গান ও ছবি' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলি লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।' বাংলার মানুষের সমাজিক, পারিবারিক ও দাম্পত্য সমস্যার পটভূমি তার ছোটগল্পের অন্যতম বিষয়। বাস্তব চেতনায় সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা, দারিদ্র্য ক্ষুধা-বঞ্চনায় লাঞ্ছিত জীবনের ছবি এঁকেছেন। পণপ্রথা, জাতপাত, প্রায়শ্চিত্ত, দাম্পত্যকলহ সব কিছুর মধ্যে জীবনরস ঘনীভূত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' ১২৮৪ শ্রাবণ-ভাদ্র প্রথম সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৭)। ড. সুকুমার সেন মনে করেন, 'ভিখারিণীতে ছোটগল্পের ঠাঁট আছে'। 'ভিখারিণী' বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক নির্মাণ। ১২৯১ কার্তিক সংখ্যার 'ভারতী'তে 'ঘাটের কথা' এবং ১২৯১ অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'নবজীবন' পত্রিকায় 'রাজপথের কথা' প্রকাশিত হয়। সমালোচকেরা এগুলিকে সার্থক ছোটগল্প বলতে চাননি। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'হিতবাদী' পত্রিকায় ছয়টি গল্প লিখে তাঁর জয়যাত্রা শুরু (১৮৯১)। এরপর তিনি লিখতে থাকেন 'সাধনা', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায়। মৃত্যুর পর ১৩৬২ বঙ্গাব্দে 'মুসলমানীর গল্প' 'ঋতুপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মোটামুটিভাবে ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ এই দীর্ঘ সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা করে গেছেন। কিন্তু শেষ দশ বছরে মাত্র কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। বর্তমানে 'গল্পগুচ্ছ'র তিন খণ্ডে ৮৪ টি, 'গল্পসল্প'-য় ১৬ টি, 'সে' গ্রন্থে ১৪ টি অনুচ্ছেদ, 'তিনসঙ্গী'তে ৩ টি, 'মুকুট' ও 'ভিখারিণী' মিলিয়ে তাঁর মোট ১১৯ টি গল্পের কথা জানা গেছে।

স্থূলবিচারে ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলি লিখেছেন। এর মধ্যে 'হিতবাদী'তে ৬ টি, 'সাধনা'য় ৩৬ টি, 'ভারতী'তে ১৩ টি, 'সবুজপত্রে' ১০ টি 'প্রবাসী'তে ৬ টি এবং বাকী গল্পগুলি অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকেরা রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নানাবিধ শ্রেণিবিভাজন করেছেন। প্রকাশকাল এবং চরিত্র লক্ষণের দিক থেকে আমরা গল্পগুলোকে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করতে পারি—

ক. প্রথম পর্ব : 'হিতবাদী' 'সাধনা'র যুগ (১৮৯১-১৮৯৩)—গল্পসংখ্যা ৩৩টি।

খ. দ্বিতীয় পর্ব : 'সাধনা' 'ভারতী' যুগ (১৮৯৪-১৯০২)—গল্প সংখ্যা ৩১টি।

গ. তৃতীয় পর্ব : 'ভারতী' 'সবুজপত্রে'র যুগ (১৯০৩-১৯৩৩)—গল্প সংখ্যা ২০টি।

ঘ. চতুর্থ পর্ব : অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প (১৯৩৪ পরবর্তী)। গল্প সংখ্যা ৩৫টি।

উল্লিখিত শ্রেণির বিভিন্ন গল্পে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের চিন্তা-ভাবনা ও মানসিকতার পরিচয় পাই।

আমরা বিভিন্ন পর্বের গল্পগুলির উল্লেখ করে তাদের দু-একটি বিশিষ্টতার কথা বলতে পারি। প্রথম পর্বের 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত ছ'টি গল্প হল—'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নী', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি'। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল—'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'দালিয়া', 'কঙ্কাল', 'একরাত্রি', 'জীবিত ও মৃত', 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি', 'সুভা', 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি' ইত্যাদি। এই পর্বের গল্পগুলিতে পল্লিজীবন, সাধারণ মানুষের হৃদয়রহস্য ও মানবমনের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় একাত্মতা প্রাধান্য পেয়েছে। এ পর্বের গল্পে চরিত্রের বিকাশ ও পরিণামী ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে প্রকৃতি পালন মুখ্য ভূমিকা করেছে। 'পোস্টমাস্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'সুভা', 'শাস্তি'—এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কয়েকটি গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদে যে আত্মিক মৃত্যু নেমে আসে—সেকথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি এই সময়ে মানুষের হৃদয়-রহস্যের প্রকাশে সাহায্য করেছে। 'পোস্টমাস্টারে'র রতন ও 'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল—'মেঘ ও রৌদ্র', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'অতিথি', 'আপদ', 'ডিটেকটিভ', 'অধ্যাপক', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'নষ্টনীড়', ইত্যাদি। এই পর্বের গল্পগুলিতে পল্লিবাংলা ও কলকাতা একসঙ্গে উঠে এসেছে। এই সময় রবীন্দ্রনাথ পদ্মা-লালিত গ্রামের রোমান্টিক প্রকৃতি ও কলকাতার জীবনধর্মের তুলনা করেছেন কিছু গল্পে। জীবনের সরল সৌন্দর্যকে যেমন দেখেছিলেন তেমনি জটিল, যন্ত্রণাদীর্ণ মানুষদেরও দেখেছেন। এককথায় তিনি তখন জীবনের সমগ্রতার ছবি এঁকেছিলেন। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে দেশীয় মানুষের মিথ্যাচার ও ব্রিটিশ আনুগত্য, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ অতীতের স্বপ্নময়তার প্রতি আকর্ষণ, 'মণিহারা' গল্পে স্বর্ণতৃষ্ণার মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের গল্পে রোমান্টিকতার মোহন জগৎ ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রেখেছেন। 'নষ্টনীড়' প্রাক-'সবুজপত্র' যুগের শ্রেষ্ঠ ফসল। এ-গল্পে হৃদয়াবেগের চেয়ে মনোবিকলন, গতির চেয়ে বিকৃতি, গীতিময়তার চেয়ে বিশ্লেষণ সমধিক—এই বৈশিষ্ট্যই 'সবুজপত্র'-যুগের গল্পে ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল—'মাল্যদান', 'গুপ্তধন', 'পণরক্ষা' 'হালদার গোষ্ঠী', হৈমন্তী', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর' প্রভৃতি। এই সময়ে ব্যক্তির সঙ্গে প্রথা ও সমষ্টির সংঘর্ষ এবং সকল পুরোনো মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ প্রধান হয়ে উঠেছে। তার উল্লেখযোগ্য পরিচয় রয়েছে 'হালদার গোষ্ঠী', হৈমন্তী', 'বোষ্টমী' ইত্যাদি গল্পে। 'হালদার গোষ্ঠী'তে বংশের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ এবং ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা রয়েছে। রক্ষণশীল সমাজ ও প্রথার বিরুদ্ধে নারীর নীরব প্রতিবাদ

রয়েছে হৈমন্তী' গল্পে। 'বোষ্টমী'তে প্রথালালিত ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রাম বর্ণিত। সামাজিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী নারীর বিদ্রোহ 'স্ত্রীর পত্র'। গতানুগতিক প্রেমধারণার বিরুদ্ধে আধুনিক নারীসত্তার জাগরণ 'পয়লা নম্বর'। তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনকে নতুন শিল্প-আঙ্গিকে নির্মাণ করেছেন। নতুন জীবনবোধ ও শিল্পরীতিতে বিশিষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর পর্বের রবীন্দ্রগল্প। জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানা ঘটনা ও প্রবণতা এ-সময় রবীন্দ্রমানসকে রূপান্তরিত করে। তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে ছোটগল্প লিখেছিলেন।

চতুর্থ পর্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল—'রবিবার', 'শেষ কথা', 'ল্যাবরেটরি', 'বদনাম' ইত্যাদি। এই পর্বে নারীমুক্তির সাধনা, বিজ্ঞানচেতনার আলোকে ব্যক্তির আত্মমহিমা আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তির বিদ্রোহ প্রধান বিষয়। 'রবিবার' গল্পে লেখক নায়িকা বিভার কাছে অভীককে আধুনিক পুরুষ ও দায়িত্ববান প্রেমিক রূপে ফিরিয়ে আনতে চেয়াছেন। 'শেষকথা' গল্পের নবীনমাধব আবেগহীন বিজ্ঞানী। অচিরা আত্মবিশ্লেষণে সংশোধিত বিরল নারী চরিত্র। নারী জানে প্রিয়কে মুক্তি দিতে, ভালোবাসা দ্বারা নিজে মুক্তি পেতে। এই আধুনিক নারীর পরিপূর্ণ রূপ পাই 'ল্যাবরেটরি'র সোহিনী চরিত্রে। একমুখী পতিভক্তি বা স্মৃতিলালিত বৈধব্যে প্রেমের মুক্তির সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আধুনিক নারীর ব্যক্তিমহিমার উদ্বোধন ঘটেছে এখানে। বলা চলে এই পর্বে আমরা সর্বজ্ঞানী পরিণত মনের রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত গল্পে মানুষ ও তাদের জীবনের বিচিত্র পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। কখনো পল্লিপ্রকৃতির উদারতায়, কখনো নগর জীবনের জটিলতায় বিচিত্র মানুষদের কথা বলেছেন। আবার সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার আবর্তে গণ্ডীবদ্ধ মানুষের খণ্ড ক্ষুদ্র জীবনকে অবলম্বন করে মানুষের অন্তর্লোকের সত্য আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্প শিল্পিত ও বহু রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠল। তিনি ছোটগল্প রচনার জন্য স্বতন্ত্র ভাষাশৈলীর প্রয়োজন অনুধাবন করেছিলেন। সেই ভাষাশৈলী নির্মাণে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকের উৎকর্ষে তিনি একক সাধনা দ্বারা বাংলা ছোটগল্পকে নিয়ে গেছেন শিল্পের শীর্ষচূড়ায়। বস্তুত রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ছোটগল্প বিশ্ব-ছোটগল্পের আসরে সম্মানের আসন অর্জন করেছে। এই বিশেষত্বের কারণে রবীন্দ্রনাথ হয়ে রয়েছেন বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম পথিকৃৎ।

৫.৫ 'দেনাপাওনা' : ছোটগল্পের প্রকাশ ও বিষয়বস্তু

- **উৎস ও প্রকাশ :**

  'দেনাপাওনা' গল্পটি সম্ভবত ১২৯৮ বঙ্গাব্দে রচিত হয়েছিল।

  সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকায় গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

  পরবর্তীতে 'দেনাপাওনা' গল্পটি 'গল্পগুচ্ছ' (প্রথম খণ্ড) ১লা আশ্বিন ১৩০৭ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

● **বিষয়বস্তু :**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ-সমস্যামূলক গল্প 'দেনাপাওনা'। গল্পের শুরু এরকম—'পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিল নিরুপমা।' তখনকার দিনে ছেলেমেয়ের নাম হত দেব-দেবীর নামানুসারী। নিরুপমা তার ব্যতিক্রম। আদরের কন্যা নিরুপমার এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। পিতা রামসুন্দর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ দেখছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মস্ত এক রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে নিরুপমার বিবাহ স্থির হয়েছে। পাত্র হাতছাড়া হবার ভয়ে রামসুন্দর বরপণ দশ হাজার টাকা ও অন্যান্য দানসামগ্রী দিতে রাজী হলেন। কিন্তু অর্থের কোনো সংস্থান নেই। বন্ধক দিয়ে, বিক্রয় করে, বিয়ের দিন পর্যন্ত বহু চেষ্টার পরেও হাজার ছয়-সাত বাকী রইল। শুভ কাজের সময়ে বরের পিতা বলেছিলেন, 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না'। এই কথায় বাড়ি শুদ্ধ সকলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তখন পাত্র পিতার দর-দামের প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিয়ে করতে রাজী হলে শুভ কাজ সম্পন্ন হল।

নিরুপমা যাবার সময়ে বাবাকে বলেছিল ওরা বাপের বাড়ি আসতে দেবে তো! বিবাহের পর দেখা দিল বিষম বিপত্তি। রায়বাহাদুরের বাড়িতে নিরুপমার কোনো সম্মান নেই। রামসুন্দর মেয়েকে দেখতে গেলে কোনোদিন সাক্ষাৎ পান, কোনোদিন না দেখেই ফিরে আসেন। মেয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে রামসুন্দর সিদ্ধান্ত নেন, যে-কোনো উপায়ে বরপণের টাকা শোধ করে দেবেন। এদিকে বিয়ের পর প্রচণ্ড টানাটানিতে সংসার চলছে। পাওনাদারদের নজর এড়িয়ে চলতে হচ্ছে নিরুর বাবাকে। শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা মেয়েকে খোঁচা দিয়ে কথা শোনাচ্ছে। প্রতিবেশীরা বউয়ের প্রশংসা করলে শাশুড়ি নিরুর বাপের বাড়ির কুৎসা করছে। রামসুন্দর মেয়েকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা থেকে মুক্তি দিতে বসতবাড়ি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। বাড়িতে তিন বিবাহিত ছেলে বাবার এই চেষ্টায় প্রবল আপত্তি জানালে বাড়ি বিক্রি স্থগিত হয়ে যায়। বাবা তখন নানা জায়াগায় ঘুরে হাজার তিনেক টাকা জোগাড় করতে পেরেছিলেন।

নিরু বাবার অবস্থা দেখে সব বুঝতে পেরেছিল। বাবার কৃত্রিম হাসি দেখে মেয়ের বুক ফাটত। বাবাকে সান্ত্বনা দিতে নিরুর মন বাপের বাড়ি যেতে চাইলেও কোনো উপায় ছিল না। বাবা মেয়েকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলার অধিকারটুকু হারিয়েছে যেন বরপণের টাকার জন্য। অনেক হীন-অপমান সহ্য করে অতি কষ্টে রামসুন্দর হাজার টাকার তিনটি নোট সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু বেহাই বাড়িতে সেই অল্প টাকা নিয়ে হাজির হলে অপমানিত হতে হয়। তিন হাজার টাকার নোট দেখে রায়বাহাদুর বলেন সামান্য কারণে তিনি হাত দুর্গন্ধ করতে চান না। তাই মর্মাহত হয়ে রামসুন্দর বাবু বাড়ি ফিরে এলেন। মেয়েকে তারা বাপের বাড়ি আসতে দিলেন না।

বহুদিন হল বাবা আর নিরুকে দেখতে যান না। লোক পাঠালেও কুশল জানতে পারেন না। রামসুন্দর মনের আঘাত দূর করতে প্রতিজ্ঞা করলেন, এবার আশ্বিনে মাকে ঘরে আনবেন। পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর দিনে গুটি কতক নোট নিয়ে মেয়েকে আনতে যাবেন; এমন সময়ে নাতি নাতনীরা এসে তাদের জামা, খেলনা কিনে দেবার কথা জানায়। রামসুন্দর সব জেনেও বুকে কঠিন বেদনা নিয়ে রায়বাহাদুরের বাড়িতে হাজির

হয়েছেন। পূর্বেকার সংকোচ ভাব এবার নেই। নিরুপমাকে বললেন, "এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।" বাবার বাড়ি বিক্রির কথা জানতে পেরে বড় ছেলে হরমোহন এখানে এসে হাজির। ক্রুদ্ধ বাবা অগ্নিমূর্তি ধারনা করে নিজের শর্ত পালনের কথা ছেলেকে জানান। ভাইপো ভাইঝিদের আবদার ও বাবার অবস্থা দেখে নিরুপমা বাকরুদ্ধ। সব বুঝতে পেরে নিরু বাবাকে বলল, "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।" সে বাবাকে টাকা নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

রামসুন্দর টাকা এনেছিলেন এবং নিরুপমার বারণে তা ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন—একথা শুনে নিরুর শাশুড়ি প্রবল ক্রুদ্ধ হলেন। এদিকে বিবাহের পরে স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তাই বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে নিরুপমার সাক্ষাৎ বন্ধ। শরীরের প্রতি অবহেলা শ্বশুর বাড়ির নির্যাতন এখন চরমে উঠেছে। নিরুপমা গুরুতর রোগে আক্রান্ত হলেও চিকিৎসা হয়নি। শেষে একদিন সে শাশুড়িকে বলেছে, 'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।' বউয়ের একথায় কেউ পাত্তা দেয়নি। শরীরের প্রতি অবহেলা অযত্নে অসুস্থ নিরুর অন্তিম অবস্থায় প্রথম ও শেষবার ডাক্তার দেখেছিল। এরপর বাড়ির বড় বউয়ের মৃত্যু হল। অনেক ঘটা করে শ্রাদ্ধ করতে রায়বাহাদুরের কিছু ঋণ পর্যন্ত হয়েছিল। অনেকে রামসুন্দরকে মেয়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের ঘনঘটার বর্ণনা শোনালেন। যখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী নিরুপমাকে নিজের কাছে পাঠানোর চিঠি দিলেন, সে সময়ে মা ছেলেকে নতুন সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাবার কথা লিখলেন। শীঘ্র ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে বলেছিলেন। চিঠিতে একথা বলতে ভুললেন না যে, 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়'। এভাবে 'দেনাপাওনা'র কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে।

৫.৬ 'দেনাপাওনা' : বিষয় বিশ্লেষণ

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ প্রথম গল্প লিখেছিলেন 'ভারতী' ও 'নবজীবন' পত্রিকায়। সেগুলি ছোটগল্প কিনা এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে। 'হিতবাদী'তে তিনি প্রথম 'ছোটগল্প' লিখতে শুরু করেন। সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকায় ছয় সপ্তাহে ছয়টি গল্প লিখেছিলেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্প 'দেনাপাওনা'। এটি 'গল্পগুচ্ছ' প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। তখন রবীন্দ্রনাথ পল্লিপ্রকৃতি ও পল্লির মানুষের মাঝে ফিরে গেছেন। তাদের স্বচক্ষে দেখেছেন। সেই মানুষদের দেখে অতি সাধারণ সুখ-দুঃখের কথা তুলে এনেছেন ছোটগল্পে। গ্রামবাংলার জনপদ, মানুষ ও প্রকৃতি, পদ্মা নদী এই নতুন ধারার সাহিত্যচর্চার যথার্থ ক্ষেত্র। আলোচ্য 'দেনাপাওনা' গল্পে আমরা এক সাধারণ নারীর পণপ্রথার বলি হবার কথা জানতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সমস্যামূলক একটি সার্থক ছোটগল্প দেনাপাওনা। পণপ্রথা আমাদের সমাজের একটি নিদারুণ অভিশাপ। অন্যদিকে নর-নারীর জীবন যৌবনের সবচেয়ে আনন্দ মধুর সম্পর্ক বিবাহ।

প্রেম ভালোবাসার জীবন 'পণপ্রথা' নিষ্ঠুর প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হয়েছে। বিবাহ দুটি তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের মিলন ও দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন তৈরি করে। কিন্তু পণপ্রথা এই শুভ সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। শেষ পর্যন্ত নববধূকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর অতল গহ্বরে। ভালোবাসার হৃদয়-বিনিময় টাকাকড়ির দেনাপাওনাতে পরিণত হয়। সভ্য, শিক্ষিত, বিত্তবান বাড়ির অভিভাবকরাও এই কু-প্রথার বশবর্তী হয়ে নববধুর সঙ্গে যে কত নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে, রবীন্দ্রনাথ গল্পটিতে তার বাস্তব ছবি এঁকেছেন। স্নেহ ভালবাসার মানবিক দাবি উপেক্ষা করে অর্থবিত্তের দানবিক দাবি এখানে বড় হয়ে উঠেছে এমনই একটি করুণ রসের গল্প 'দেনাপাওনা'।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিরুপমা, বাবা-মায়ের আদরের কন্যা। পাঁচ ছেলের পর এই মেয়েকে পেয়ে রামসুন্দরের আনন্দের শেষ ছিল না। স্নেহে যত্নে একে বড় করেছে রামসুন্দর। বিবাহযোগ্যা হলে নিরুপমার যোগ্য পাত্র মিলেছে। পাত্রের পিতা রায়বাহাদুর দশ হাজার টাকা ও অন্যান্য জিনিস দাবি করেছেন। কন্যার পিতা ভালো পাত্র বলে হাতছাড়া করতে চাননি। কিন্তু টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে সে বিপাকে পড়েছে। চড়া সুদে যে লোকটি ধার দিতে রাজি হয়েছিল, বিয়ের দিন সে পিছিয়ে গেছে। পণ নিয়ে বিয়ের আসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নগদ টাকা হাতে না পেয়ে রায় বাহাদুর বেঁকে বসলেন। এই সংকটে পাত্র নিজে পিতার অবাধ্য হয়ে পিতার অমতে নিরুপমাকে বিয়ে করেছে। সকলে বুঝেছিল এর ফল ভালো হবে না। বিয়ের পর নিরুপমাকে বাবা মায়ের কাছে রেখে তার স্বামী কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। এদিকে শ্বশুরবাড়িতে চলল নিরুপমার উপর মানসিক নির্যাতন। বেয়াই বাড়িতে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে রামসুন্দর কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্য দেখা পায়, কোনোদিন দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হয়। এভাবে নিরুপমার জীবনের নিপীড়নের মাত্রা বাড়তে থাকে।

বরপণের টাকা না পেয়ে রায়বাহাদুর এই সম্পর্ক প্রায় অস্বীকার করতে চান। একবার ধার করে হাজার তিনেক টাকা দিতে এসে রামসুন্দর অপমানিত হয়ে ফিরে আসেন। তাই অপমানিত রামসুন্দর স্থির করেন টাকা শোধ না দিয়ে মেয়েকে আর আনতে যাবেন না। অসহায় স্নেহকাতর পিতার মর্মযন্ত্রণা লেখক সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এদিকে চতুর শাশুড়ি নিরুপমার উপর নির্মম মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে চলেছেন। নববধু যেন তাদের গৃহে অনধিকার প্রবেশ করেছে। শাশুড়ির প্রশ্রয়প্রাপ্ত বাড়ির দাস-দাসীরা তাকে কৃপার চোখে দেখে। সকলের উপেক্ষা ও বিরূপ মনোভাবে বন্দী-জীবন নিরুর পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। সে নিয়মিত আহার করে না। তীব্র মানসিক কষ্টে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমতী শাশুড়ি বধূর অসুস্থতাকে নিছক সাজানো ভান বলে কটাক্ষ করেছিলেন। নিরুপমা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা হয়নি।

নিজের চোখে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের অবস্থা ভেবে রামসুন্দর উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হলেন। মেয়ের দুঃখ ঘোচাতে রামসুন্দর গোপনে বসতবাড়ি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করলেন। পণের বাকি টাকা নিয়ে তিনি রায়বাহাদুরের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। রামসুন্দরের বড় আশা, এবার অন্তত কিছু দিনের জন্য মেয়েকে

নিজের কাছে এনে রাখতে পারবেন। কিন্তু সত্য গোপন রইল না। বাড়ি বিক্রির কথা জেনে দাদারা একেবারে ভেঙে পড়ল। তারা পিতাকে বাধা দেবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু ফল কিছু হল না। নিরুপমা পরিবারের সকলকে নিরাশ্রয় করতে বাধা দিল। সে স্পষ্ট বলল, সে এই বাড়ির বধু টাকার থলি মাত্র নয়। অর্থের বিনিময়ে তার প্রাণের মূল্য নির্ধারিত হতে পারে না। মেয়ের যুক্তির কাছে হার মেনে রামসুন্দর হতাশ হয়ে ফিরে এল। এই কথা দাসীদের মাধ্যমে শাশুড়ির কানে তা পৌঁছাল। উৎপীড়ন বৃদ্ধিতে নিরুপমার রোগ বৃদ্ধি পেল। শেষে একদিন বাড়িতে ডাক্তার এল— সেই প্রথম এবং সেই শেষ। বিনা চিকিৎসায় নিরুপমার অকাল মৃত্যু ঘটল। রায়বাহাদুরের মর্যাদা রক্ষা করে ধুমধাম করে বধুর অন্তেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হল। জীবিতকে যত লাঞ্ছনাই করা হোক, মৃতের প্রতি অমর্যাদা শাস্ত্রবিরুদ্ধ মহাপাপ। গল্পের উপসংহার এই ভয়ঙ্কর সমাজ-সমস্যার কদর্য রূপটি উদঘাটিত হয়েছে। স্বামী নিরুপমাকে নিজের কাছে নিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাড়িতে চিঠি দিয়েছিল। উত্তরে নিরুপমার শাশুড়ি বলেছিল পুত্রকে ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে। শীঘ্র তার বিবাহ হবে। সেই বিয়েতে নগদে বিশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। গল্পের শেষ বাক্যে রবীন্দ্রনাথ পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও শৈল্পিক প্রতিবাদ উচ্চারণে শেষ করেছেন।

গল্পটিতে জীবনের খণ্ডাংশের প্রকাশ পেয়েছে। দেনাপাওনার বিষময় পরিণতি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। পণপ্রথা মেয়েদের জীবনকে কীভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দের তার ছবি এঁকেছেন। নিরুপমা নামের নারীর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আসলে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বাপের বাড়িতে নিরুপমার আদর যত্ন থাকলেও বিয়ের আসর থেকে তার কপালে শুরু হল লাঞ্ছনা। দরিদ্র পিতা সর্বস্বান্ত হয়েও কন্যাপণের হাত থেকে মুক্তি পেলেন না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির মৃত্যুতে এই অবস্থার অবসান হল। গল্পের কাহিনিতে একমুখীনতা আছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পণপ্রথার নিষ্ঠুর দিক বর্ণিত হয়েছে। নাটকীয় চমকে গল্প শেষ হয়েছে। এখানে লেখকের সামাজিক অভিপ্রায় শিল্পের শাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বর্ণনার কোনো অতিরেক গল্পে নেই। অনেকগুলি চরিত্র থাকলেও গল্পের একমুখী গতি রক্ষিত হয়েছে। কাহিনির সমাপ্তি ও নিরুপমার মৃত্যু গল্পের ট্র্যাজিক রসের স্বাদ দিয়েছে। বিষয় ও আঙ্গিকের সার্থক রূপায়নে ছোটগল্পটি অনন্য সাধারণ। সমাজ-সমস্যার জ্বলন্তরূপ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের অনন্যতাকে মনে করিয়ে দেয়।

৫.৭ 'দেনাপাওনা' : রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনা বা সমাজ-সমস্যার শিল্পরূপ

ভারতীয় সমাজে দীর্ঘদিন থেকে 'পণপ্রথা' বহু নিন্দিত হলেও প্রচলিত রয়েছে। এই প্রথার কারণে ফুলের মতো কোমল স্বভাবের মেয়েদের জীবন তিলে তিলে ধংস হয়ে যাচ্ছে। পণপ্রথা আজ সতীদাহের মতোই সামাজিক ব্যভিচারে পরিণত হয়েছে। বহুকাল প্রচলিত এই পণপ্রথা নামক সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'দেনাপাওনা' গল্পটি। সমাজের গুরুতর সমস্যার শিল্পসৃষ্টি করে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন। আমাদের দেশে এই 'বরপণ' এক অলিখিত ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। তার বলি

হচ্ছে হাজার হাজার নববধূরা। পরিণাম হয় মৃত্যু নয় লাঞ্ছনা। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতা ‘বরপণ’ দিতে না পারলে মেয়েকে যে যন্ত্রণা সহ্য করতে হত তার নিখুঁত বাস্তব চিত্র গল্পকার উপস্থাপন করেছেন।

রামসুন্দর মিত্রের অত্যন্ত আদরের কন্যা নিরুপমা। তার বিবাহ হয়েছে বনেদী রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলের সঙ্গে। বরের বাবা দশ হাজার টাকা নগদ ও অন্যান্য দান-সামগ্রী নেবেন বলে বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু সব চেষ্টার পরেও রামসুন্দর হাজার ছয়-সাত টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি। বিয়ের দিনে একজন বাকী টাকা দেবার আশ্বাস দিলেও যথাসময়ে সেই সুদখোর মহাজন বাকী টাকা দেয়নি। পাত্র পিতার অমতে দরদামের কথা না ভেবে বিবাহ করতে সম্মত হলে খানিকটা সুবিধা হয়। এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হবার পর নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে একরকম নির্বাসিত হল। বাবা পুরো টাকা দিতে পারেনি বলে শাশুড়ির কোনো স্নেহ ভালোবাসা বা আদর সে পায়নি। মেয়ের কষ্ট দেখে বাবা পণের টাকা শোধ করার দৃঢ় শপথ নিলেন। একবার হাজার তিনেক টাকা নিয়ে গিয়ে বেয়াই রায়বাহাদুরের কাছে অপমানিত হয়েছিলেন। তাই গোপনে বসতবাটি বেচে টাকা শোধ করতে চাইলেন। ক্রমশ গোলযোগ বৃদ্ধি পেল।

দুর্গাপূজা আসন্ন। রামসুন্দর এবার মেয়েকে ঘরে নিয়ে যাবেন বলে গোপনে বাড়ি বিক্রি করে বকেয়া সব টাকা নিয়ে রায়বাহাদরের বাড়ি উপস্থিত হলেন। কিন্তু সেখানে হঠাৎ বড় ছেলে হরমোহন দুই ছেলেকে নিয়ে হাজির। রামসুন্দর নির্বাক। নিরুপমা বাবার এই কাজকে নিজের অপমান বলে মনে করে টাকা সহ ফেরৎ পাঠাল। রামসুন্দর মেয়ের কথায় নীরবে বিদায় নিলেন। শাশুড়ি পুত্রবধূর এই কাজের কথা শুনে অতি ক্রুদ্ধ হলেন। বাড়িতে নিরুর উপর চাকর-চাকরানীর অবহেলায় ও শাশুড়ির নির্যাতন বাড়তে থাকল। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষে নীরবে মৃত্যু বরণ করল নিরুপমা। বড় বউয়ের শ্রাদ্ধের পর রায়বাহাদুর মহিষী পুত্রের পুনরায় বিবাহের আয়োজন করলেন বিশ হাজার টাকা পণের বিনিময়ে। এখানেই কাহিনি শেষ হয়েছে।

নিরুপমার এই করুণ পরিণতি গল্পের মূল বিষয়। এর বিষয়বস্তুতে আমাদের নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। বিবাহে পণ দেওয়া ও নেওয়ার প্রথা মানুষের জীবনে যে ট্র্যাজেডির কালো ছায়া ঘনিয়ে তোলে গল্পের পরিণতিতে আমরা তা দেখেছি। গল্পে নিরুপমার বাবা নিজের সামর্থের কথা না ভেবে ভালো ছেলে পেয়ে দশ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু সময় মতো পণের টাকা জোগাড় করতে না পারায় গোলমালের সূচনা। বরের শুভচিন্তায় বিয়ে সম্পন্ন হলেও পণের টাকার কারণে শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর উপর চলে নানা মানসিক পীড়ন ও আশান্তি। নিরুপমাকে আদর যত্ন তো দূরের কথা ভালো করে খেতে পরতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। দিনরাত তাকে বাপের বাড়ির নিন্দা শুনতে হত। মেয়ের অপমান ঘোচাতে নিজের বসতবাড়ি বিক্রয় করেও শেষ রক্ষা হল না। ভাইদের পথে বসিয়ে নিরুপমা বাবাকে টাকা দিতে দিলেন না। তাই নিরুপমার বাপের বাড়িও যাওয়া হল না। কন্যার প্রতি পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার তা যেন পণের টাকায় বন্ধক রাখা হয়েছে। পিতার এই অনুভূতির মধ্যে বর্তমান অর্থনির্ভর সমাজের যান্ত্রিকতা ও অমানবিকতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামাজিক পণপ্রথার পীড়নে মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে সমগ্র গল্পে। নির্মম নিষ্ঠুর সমাজপতিরা, সমাজের ধারক-বাহকেরা

যেভাবে প্রতিনিয়ত মনুষ্যত্বকে পদদলিত করছে সেই ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস দেখা গেছে আলোচ্য গল্পে। রবীন্দ্রনাথের মতো মানবতাবাদী কবি নিরুপমাদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেও আধুনিক সমাজের বিবেকবোধশূন্যতা সেই নিষ্ঠুর প্রথাকে সমর্থন করে চলেছে। এখানেই গল্পটি অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।

৫.৮ নামকরণ ও চরিত্র-বিচার

- **নামকরণ :**

শিল্প প্রকরণের শিরোনাম নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছোটগল্পের নামকরণের নানা রীতি লক্ষ করা যায়। কাহিনি, ঘটনা, চরিত্র আবার কখনো ব্যঞ্জনাকে প্রাধান্য দিয়ে শিল্প প্রকরণের নামকরণ করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেনাপাওনা' গল্পের নামকরণে নিরুপমার বিয়ের ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিয়েতে বরপণের দশ হাজার টাকা নিয়ে নিরুপমার বাবা রামসুন্দরের সঙ্গে রায়বাহাদুরদের পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। রায়বাহাদুরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলে বিবাহ সভায় বেঁকে বসলে বিবাহ হয়েছে দুটি যুবক যুবতীর। এই সময়ে পণের টাকা বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। কিন্তু অভিবভাবকদের অসম্মতি যে নববধুর জীবনে দুঃখ দুর্দশা ডেকে আনবে বিবাহ-সভাতেই সে ইঙ্গিত মিলেছিল। সুতরাং গল্পকার এখানে নামকরণে ঘটনার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঘটনানির্ভর এই নামকরণে লেখক সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-বিদ্রূপ করেছেন। দেনা না করেও নিরুপমার পিতা রামসুন্দর মিত্র এখানে দেনাদার। গল্পের শুরুতে পাঁচ ছেলের পর মেয়ের জন্ম দিয়ে পিতা হিসেবে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি পুরুষ-শাসিত সমাজের চোখে দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার সমাজে রায়বাহাদুরের মতো বাবারা ছেলের জন্ম দিয়ে পাওনাদারে পরিণত হয়েছিলেন। তাই সমাজের চোখে কন্যার পিতা বলে রামসুন্দর দেনাদার আর রায়বাহাদুর পাওনাদার। সুতরাং যে ঘটনা লেখক এখানে বর্ণনা করতে চেয়েছেন সেদিক থেকে নামকরণ প্রাসঙ্গিক।

বরপণের দশ হাজার টাকা বিবাহের দিনে রামসুন্দর জোগাড় করতে পারেনি বলে গোলমাল বাধে। বর স্বয়ং পিতার কথার অবাধ্য হয়ে নিরুপমাকে বিবাহ করে। দুঃখ ভয় চিন্তা নিয়ে নিরুপমা কেঁদেকেটে শ্বশুরবাড়ি গেল। রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখতে গেলে বুঝতে পারেন পণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের অযত্ন ও অনাদর হচ্ছে। শ্বশুরবাড়িতে নিরুপমাকে দিনরাত বাবার বাড়ির নিন্দা শুনে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে। মেয়েকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে বহু জায়গায় ঘুরে হাজার তিনেক টাকা জোগাড় করে শেষ রক্ষা হল না। অপমানিত রামসুন্দর প্রতিজ্ঞা করলেন নিজের বসতবাড়ি বেচে দেনা শোধ করবেন। সব ব্যবস্থা পাকা করে টাকা নিয়ে বেয়াই বাড়িতে এলে বাবা মেয়েতে দেখা হল। আনন্দ অশ্রুতে ভাসলেন দুজনে। কিন্তু বাড়ি বিক্রির খবর শুনে বড় ছেলে হরমোহন উপস্থিত হলে সব আনন্দ মাটি হয়ে গেল। নিরুপমা বাবার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে তাকে পণের টাকা না দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। এ কথা শুনে শাশুড়ির ক্রোধ বেড়ে যায়। অবহেলা ও অত্যাচারে মৃত্যু হয় এক

নিরীহ মেয়ে নিরুপমার। কিন্তু শাশুড়ি আনন্দিত মনে আবার বেশি পণের বিনিময়ে ছেলের বিবাহ ঠিক করলেন। তাদের কোনো অনুশোচনা হল না একটি মেয়েকে পণের দায়ে বলি দিতে।

পণপ্রথার ভয়ঙ্করতা ও সামাজিক ব্যাধি গল্পের নায়িকা নিরপমাকে গ্রাস করেছে। বিবাহ ঠিক করার সময় উভয় পক্ষ বসে স্থির করেছিলেন দেনাপাওনার হিসেব। এর অপর নাম 'বর-পণ'। এই নামকরণে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আছে। বরপক্ষের পাওনা মেটাতে কন্যাপক্ষকে দেনা করতে হয়েছে। দেনা করে পাওনা মেটাতে হয়েছে বলে বর-পণের অপর নাম দেনাপাওনা। গল্পে রামসুন্দর দেনা করে বরপক্ষের সমস্ত পাওনা মেটাতে চেয়েছে। কিন্তু পাওনার প্রতি অতি আকর্ষণ পুত্রবধূকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। দ্বিতীয়বার হাতে-হাতে বর-পণ বিশ হাজার টাকা আদায়ের লোভ সামলে উঠতে পারেননি রায়বাহাদুর এবং তার পত্নী। পণের জন্য মৃত্যু এবং পুনরায় পণ পাবার জন্যে দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা গল্পে পণপ্রথার সর্বগ্রাসী রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। সুতরাং ঘটনা ও বিষয়ের ব্যঞ্জনাধর্মিতায় 'দেনাপাওনা' গল্পের নামকরণ সার্থক হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে।

● চরিত্র বিচার : নিরুপমা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ-সমস্যামূলক 'দেনাপাওনা' গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র নিরুপমা। সে গল্পের নায়িকা চরিত্রও বটে। সমাজব্যবস্থার নির্মম প্রথা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। একসময় হিন্দু সমাজে বিবাহে দান নেওয়া অবৈধ ছিল। মধ্যযুগের কোনো এক সময় বিয়েতে বর-পণের প্রথা আরম্ভ হয়। পরে তা সমাজে ভয়ঙ্কর ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি ঘরের সাধারণ মেয়ে নিরুপমা এই প্রথার শিকার।

গল্পের নিরুপমা ছিল রামসুন্দর মিত্রের আদরের কন্যা। পাঁচ ছেলের পরে কন্যার জন্ম হলে সকলে খুশি, তাই নাম তার নিরুপমা। এখন তাঁর বিয়ের বয়স হয়েছে। বাবা অনেক দেখেশুনে রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু এতে বর-পণ হিসেবে দশ হাজার টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী দেবার কথা হয়। বিয়ের দিন পর্যন্ত সব কিছু বিক্রি করে মাত্র তিন চার হাজার জোগাড় করতে পেরেছিলেন রামসুন্দর মিত্র। পাত্রের পিতা রায়বাহাদুর টাকা না পেলে বরকে বিবাহ সভায় যাবার অনুমতি দেবেন না। তখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বরপণের টাকার প্রসঙ্গ নস্যাৎ করে বিয়ে করতে রাজি হন। এতে ক্ষণিকের জন্য সুবিধা হলেও নিরুপমার জীবনে নেমে আসে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার ও অবিচার। একপ্রকার গোলযোগের মাঝে কন্যাদান সম্পূর্ণ হল। নিরুপমা কান্নায় ভেঙে পড়লেও, শেষে শ্বশুরবাড়ি যেতে বাধ্য হল। গল্পের নিরুপমা উনিশ শতকের বাংলার সমাজে পণপ্রথার নৃশংসতার এক মূর্তপ্রতীক হয়ে উঠেছে।

নিরুপমা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে নববধূর প্রাপ্য সম্মানটুকু পায়নি। আত্মীয়-পরিজন থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি কারো কোনো সহানুভূতি পেল না। এর প্রধান কারণ হল বাবা রামসুন্দরের পণের টাকা দেবার অক্ষমতা। বাপ পুরো দাম দিতে পারেনি বলে মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে কোনো মর্যাদা পায়নি। রবীন্দ্রনাথকে মধ্যযুগের এই বর্বর প্রথা যেভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল তারই শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে নিরুপমা চরিত্রে। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ির উদাসীনতায়, গঞ্জনা ও অবহেলায় ফুলের মত কোমল নিরুপমা দিন দিন

শুকিয়ে যেতে থাকল। মেয়ের দুঃখের কথা জেনে বাবা ছেলেদের বঞ্চিত করেও বাড়ি বিক্রির টাকায় দেনা মেটাবার সিদ্ধান্ত নেন। নিরু জানত বাপের বাড়ির অভাব অনটনের কথা। সহৃদয় নারী নিরু তাই বাবার অবস্থা বুঝতে পেরে মুখে কোনো শব্দটি করেনি। পিতার সঙ্গে ক্ষণিকের সাক্ষাতে নিজের সুখের ভান করেছে। কেবল মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি যাবার প্রবল আকুতি বাবার প্রাণে আঘাত হেনেছে। সেদিক থেকে বলতে গেলে নিরুপমা উপমাহীনই বটে।

বিয়ের পরে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। সেদিক থেকে সে এক সর্বংসহা নারী। কিন্তু বাবাকে বারবার শ্বশুরবাড়িতে অপমানিত হতে দেখে নিরুপমা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যেমন নিরুপায় হয়ে যায় তেমনি বসতবাড়ি বিক্রির টাকায় নিজের বিয়ের পণ শোধ করতে চাইছে দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। বাবাকে সে বলেছিল, 'বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।' কিন্তু পিতা মেয়েকে বুঝিয়ে বলেছিল যে, টাকা না দিতে পারলে বাবার অপমান। তখন নিরুপমা প্রতিবাদী নারীর মতো কঠিন ভাষায় বাবাকে বলেছে 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি। যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।' তখন আমরা নিরুপমার মধ্যে এক সমাজ-সচেতন নারীকে খুঁজে পেয়েছি।

নারীর এই প্রতিবাদ সমাজের কানে পৌঁছায়নি। বরং এই সোচ্চার প্রতিবাদ নিরুর পারিবারিক অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রতিদিনের অনাহার, অশান্তি, অত্যাচার থেকে মুক্তি হল বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে। মৃত্যুই, পুনরায় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহে পণ নেবার ব্যবস্থা পাকা করে দিয়ে গেল। এখানে সামাজিক প্রথার নিদারুণ শিকার হয়েছে নিরুপমা। নিরুপমার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অর্থলোলুপ সমাজে নারীর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সমাজ নিরুপমাকে বাঁচতে দিল না। তার জীবনের করুণ অসহায় অবস্থা আমাদের মনে বেদনার সঞ্চার করলেও আমরা নিরুপায়।

নিরুপমার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী অনেকে। পিতা রামসুন্দর এই দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না। নিজের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা না ভেবে তিনি অবিবেচকের মতো ধনীর ঘরে কন্যাদানের চিন্তা করেছেন। রায়বাহাদুরের ঘরে কন্যাদান না করে সমঅবস্থাপন্ন ঘরে নিরুর বিয়ে দিলে হয়তো তাঁকে আদরের কন্যার মৃত্যু দেখতে হত না। রামসুন্দর আর্থিক সঙ্গতির কথা না ভেবে বনেদি বংশের ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ভুল করেছেন। পাত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তার পরোক্ষ মদতে নিরুপমার উপর বাড়ির লোকেরা অত্যাচারের সুযোগ পেয়েছে। অর্থ-পিপাশা মানুষকে কতখানি মনুষ্যত্বহীন করে তোলে রায়বাহাদুরের স্ত্রীর মধ্যে সে দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। নিরুপমার মৃত্যুর জন্য শাশুড়ি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। সর্বোপরি এই নিষ্পাপ নিরীহ মেয়েটির মৃত্যুর জন্য দায়ী প্রচলিত সমাজব্যবস্থা।

লেখকের সামাজিক অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেছেন নিরুপমার মধ্যে দিয়ে। আধুনিক কালে বিয়েতে বরপণ নিয়ে যে কেনা-বেচা দর-দাম চলে তার জীবন্ত উদাহরণ নিরুপমা চরিত্র। পণপ্রথা দেশের

মেয়েদের জীবনকে কীভাবে লোভের করাল গ্রাসে ফেলে দিচ্ছিল তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ অর্থকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার অমানবিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন বাঙালি সমাজের নারী নিরুপমার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং কঠিনে-কোমলে নিস্তেজ প্রতিবাদে এই সর্বংসহা নারী চরিত্রটি এক অনন্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

৫.৯ অনুশীলনী

৫.৯.১ সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. 'এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল।'—এখানে কোন্ দুর্ঘটনার কথা বলা হয়েছে? অন্তঃপুরে কার কান্না পড়ল? কার কথায় কীভাবে কান্না থেমে গেল?

২. 'আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।'—বক্তা কে? কোন্ ঘটনায় বক্তার এইরূপ উক্তি? বক্তার এই উক্তির কোন্ সামাজিক মূল্য আছে কি?

৩. 'তাঁহার কোনো জোর নাই নিজের কন্যার উপরে পিতার স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখতে হইয়াছে।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্তব্যটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৪. 'সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।'—সপ্রসঙ্গ ব্যখ্যা করো।

৫. 'সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বঁধুর এখানে কোন অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।'—ব্যখ্যা করো।

৬. 'এবারে বিশহাজার টাকা পণ হাতে হাতে আদায়।'—বক্তব্যটিতে বক্তায় মানসিকতা বিশ্লেষণ করো।

৫.৯.২ বিস্তৃত আলোচনামূলক প্রশ্ন

১. পণপ্রথার মর্মান্তিক চিত্র 'দেনাপাওনা' গল্পে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

২. দেনাপাওনা গল্পের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ সমাজভাবনার যে পরিচয় দিয়েছেন তা গল্পটি বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩. "এবারে বিশহাজার টাকা পণ হাতে হাতে আদায়।" বক্তা কে? প্রসঙ্গ উল্লেখ করা বক্তা একথা কাকে কখন বলেছেন? এই বক্তব্য বক্তার কিরূপ মনোভাবের পরিচয় দেয়? এই প্রথার নিষ্ঠুরতা গল্পে কেমন ভাবে প্রদর্শিত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

৪. 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. 'দেনাপাওনা' ছোটগল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১. *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*—প্রমথনাথ বিশী।

২. *রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ—তপোব্রত ঘোষ।*

৩. *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*—বুদ্ধদেব বসু।

৪. *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*—শ্রী ভূদেব চৌধুরী।

৫. *কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার* মুখোপাধ্যায়।

জেনেরিক ইলেকটিভ কোর্স : ০৪

মডিউল : ২

নির্বাচিত কবিতা পাঠ

একক-৬ ❑ বঙ্গভূমির প্রতি : মধুসূদন দত্ত

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ কবি পরিচিতি
৬.৩ কবিতা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রসঙ্গ
৬.৪ কবিতার বিষয়বস্তু
৬.৫ গীতিকবিতা হিসেবে কবিতাটির গুরুত্ব পর্যালোচনা
৬.৬ মূলপাঠ
৬.৭ সহায়ক গ্রন্থ

৬.১ উদ্দেশ্য

কবিতায় জন্মভূমির প্রতি যে অকৃত্তিম ভালোবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে, পাঠ-বিশ্লেষণের মধ্যে দেশের প্রতি আবেগ-ভালোবাসার কথা জানা যাবে, কবি মধুসূদন নিঃসন্দেহে এমন এক ভাষার প্রচলন করেছেন যা তাঁর পূর্বসুরিদের থেকে পৃথক, পাঠক কবিতাটি পড়ার মধ্য দিয়ে এই পৃথক রূপটি আত্মস্থ করতে পারবে, আলোচ্য কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সনেটের দৃষ্টান্ত। বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মধুসূদন, তিনি কীভাবে শেক্সপিয়ার, পেত্রার্ক প্রমূখ ব্যক্তির আদলে সনেট নির্মাণ করলেন তা এই পর্বের কবিতা পাঠের মধ্যে পাওয়া যাবে।

৬.২ কবি পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের নাবালক দশার মুক্তি ঘটল মধুসূদনের হাত ধরে ,তাঁর সাহিত্যের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ মূর্ত রূপ প্রকাশ পেল। কবিতার নান্দনিক অভিজ্ঞান ধরা দিল তাঁর সাহিত্যে। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা রাজনারায়ন দত্ত আইনজীবী ছিলেন, কবির বয়স যখন সাত তখন পুরোপুরি কলকাতার বাসিন্দা হয়েছিলেন, গ্রামে মাতা জাহ্নবীর তত্ত্বাবধানে শৈশবের শিক্ষা শুরু করেছিলেন, সেই সময় থেকে মায়ের কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি শুনে—এই দুই কাব্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। পরবর্তীকালে তিনি হিন্দু-কলেজের ছাত্র হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৮৩৩ সালে হিন্দু কলেজের জুনিয়র

ডিপার্টমেন্টের সর্বনিম্ন শ্রেণিতে প্রবেশ করেছিলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষার সময় তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি অনাসক্তি ও খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালের ৯ই ফ্রেব্রুয়ারি তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন,পরে তিনি মাদ্রাজে চলে যান। চাকরি নিয়ে পরবর্তীকালে আবার বাংলায় ফিরে আসেন। এবং এই পর্বে তিনি বাংলা সাহিত্যের অমর কাহিনিগুলি লিখেছিলেন, আর্থিক অনটন তাকে আবার বিলাতে যেতে হয়েছিল ব্যবহারজীবী শিক্ষার জন্য যদিও তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন বিদেশি ভাষাগুলি শেখবার জন্য সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে জানবার জন্য। তবে দেশে ফিরে আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয় এমনকি রোগ সারাবার অর্থ ও তাঁর কাছে ছিল না, পরিশেষে ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন পরলোকগমন করেন।

কবি ও নাট্যকার হিসেবে তিনি সমাদর পেয়েছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ— শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯), একেই কি কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড়ো সালিখের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য ১ম (১৮৬১), মেঘনাদ বধ কাব্যয় (১৮৬০), পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), চতুর্দশপদী কবিতা (১৮৬৬), হেক্টর বধ কাব্য (১৯৭১)। এছাড়া তাঁর ইংরেজি রচনা গুলি হল- The captive ladie (1849), The angloéŸésaxon and the hindu (1854), Ratnabali (tr) 1858–Sharmistha (tr)—1859। তাঁর কাব্যবলয় লক্ষ করলে অনুধাবন করা যায় ১৮৫৮-১৮৬১ সালের মধ্যে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাহিনিগুলি রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম পাশ্চাত্যের ধাঁচে কাহিনি নির্মাণ করেছিলেন। বীররসের আধিক্যও কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থের অঙ্গীরস হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তাই বলা চলে শুধু পাশ্চাত্য ভাবনা নয় প্রাচ্যের কাব্যভাবনা তাঁর কাব্যে এসেছিল। দেশীয় বা বিদেশীয় মহাকাব্য— আদি বা সাহিত্যিক মহাকাব্যের ছককে তিনি নব্য রূপ দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যে। ইলিয়ড ওডিসি, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি তাঁর কাব্যের মূল আধার, তবে তার কাব্যের গঠনের ক্ষেত্রে ঈনিড, ভার্জিল, ওভিদ এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে ছন্দ পরিক্রমার দিক দিয়ে তিনি কাব্যে নবরসের সংযোজন করেছিলেন। মিল্টনের Blank verse-এর আদলে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ঘটান। সেই জন্য কবিকে কাব্যের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শব্দ আনতে হয়েছিল। অনেক তদ্ভব এবং সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায় মধুসূদনের কাব্যে। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে অনেক পুরানো ভাবনাকে সরিয়ে, নতুন ভাবনার স্ফূরণ ঘটিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য নিয়ে বলেছেন-People here grumble and say that the heart of the poet in Meghnad is with Rakhasas. And that is the real truth. I despise Ram and his rabble—But the idea of Ravan–elevates and kindles my imagination—he was grand fellow. সুতরাং আঙ্গিক বা ভাবনার ক্ষেত্রে অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে।

৬.৩ কবিতা সম্পর্কিত কয়েকটি প্রসঙ্গ ও ভাবগত অর্থ

মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে প্রতিভাধর মধুকবির জন্ম হয়। যৌবনের প্রথমালগ্নে কবি-মন আচ্ছন্ন ছিল ইংরেজি সাহিত্যে অন্যতম কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কিন্তু ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি। পরবর্তী সময়ে বাংলার সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হন। তবে তার অন্তর থেকে বিদেশে যাবার স্বপ্ন সরে যায়নি, তিনি বিদেশে যাত্রা করেন ১৮৬২ সালের ৯ই জুন। আর কবিতাটি ঠিক এর পাঁচদিন পূর্বে লেখা। সম্ভবত দেশ ছেড়ে চলে যাবার প্রাক-মুহূর্তে কবি মন জন্মভূমির প্রতি কেঁদে উঠেছিল সেই ভাবনায় জারিত এই কবিতা। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাই নিজের ভাষা বা জন্মভূমির প্রতি অকৃত্তিম টান তিনি অনুভব করছেন। তবে তাঁর বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে জীবনীকার জানাচ্ছেন—'মধুসূদন প্রধানতঃ ব্যারিষ্টারি ব্যাবসার শিক্ষার জন্য ইংল্যাণ্ডে গমন করিয়াছিলেন; য়ুরোপীয় ভাষাসমূহে অধিকার লাভও তাঁহার য়ুরোপগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল'। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কবির ওখানে বিভিন্ন ভাষাসমূহের পাশাপাশি নানা দেশের সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করবার জন্য বিদেশ যাওয়া।

তবে সংশ্লিষ্ট কবিতাটি ১৮৬২ সালের ৪ জুন তিনি রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে একটা চিঠি লেখেন ৪ তারিখে সেখানে তিনি জানাচ্ছেন—'Being a poetaster–I would not think of bolting away without rhyming–and I enclose the result–and the I hope the thing is,–if not good-at least respectable. এর পরই তিনি সংশ্লিষ্ট কবিতাটি যুক্ত করেছেন। এর পরে কবিতাটি ১৮৬২ সালের ১৬ই জুনের 'সোমপ্রকাশে' প্রথম প্রকাশিত হয় 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাটি। কবিতাটির শিরোভাগে বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড' আখ্যায়িকা কাব্যের শেষ লাইন সংযুক্ত রয়েছে—My native Land-Good Night!

কবিতাটি কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়নি, বিচ্ছিন্ন—বিক্ষিপ্তভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। মধুসূদনের কাব্যের দিকে যদি লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে তিনি এই রকম প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন যেগুলি নীতিকবিতা বা গীতিকবিতা হিসেবে পাঠক পড়তে পারে, তবে এই সকল কবিতাগুলির সাহিত্যমূল্য কম কিছু নয়। সন-তারিখ মিশিয়ে যদি পড়া যায় তাহলে কবি জীবনের নানা অনালোচিত পর্ব এখানে প্রকাশ পায়। এগুলি মধ্যে এই বিচিত্রমুখী প্রতিভার ও তাঁর সাহিত্যের কাব্যতত্ত্বের সন্ধান মিলতে পারে। আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত, তখন সমাজ মানস থেকে মধ্যযুগের সাহিত্যরুচি নিষ্ক্রান্ত হয়নি ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বাঙালিকে এক নতুন সাহিত্য জগতের সন্ধান দিয়েছেন কবি।

চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছে কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। চতুর্দশপদী কবিতা হয়ে উঠেছে কবির আত্মার বাহন এখানে কবিকে সম্যকভাবে ধরা যায়। কবিতাটি যেহেতু মাতৃসত্র পরিত্যাগের পূর্বে লেখা

তাই কবিতাটির সঙ্গে সমধিক নৈকট্য অনুভুত হয় 'আত্মবিলাপ' নামাঙ্কিত কবিতাটি। দুটি কবিতার গীতোচ্ছ্বাস অনেকটা একসূত্রে গাথা হিসেবে ধরা যেতে পারে, তবে তার এই কবিতাটিও কোনো কাব্যগ্রন্থভুক্ত হয়নি। কবি বারবার আঘাত পেয়েছেন কিন্তু কোনো ভাবে নিজের কাব্যজগত থেকে সরে আসতে পারেননি বরং জীবনের প্রতিটি পর্বে তিনি সাহিত্যের প্রতি এক অমোঘ টান অনুভব করেছিলেন। কবিতাটি যেহেতু গীতিকবিতা, উনিশ শতকের সেই কালজুড়ে বাংলাদেশে গীতিকবিতার প্রচার ও প্রসার ছিল। কিন্তু কাবিতাটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে সমকালীন কোনো বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। গীতিকবিতাকে সমালোচকগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন যথা ক. প্রেমমূলক গীতিকবিতা খ. বিরহমূলক গীতি কবিতা গ. দেশাত্মবোধ গীতিকবিতা— এই তিন ধরনের ভাগ করেছিলেন, যদিও গীতিকবিতার এই বর্গীকরণ অনেকটা আপেক্ষিক তবু ও বলা যায় এই বিষয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য এই বর্গীকরণ খুব আবশ্যক। পাঠ্যাংশের অন্তর্গত 'বঙ্গভুমির প্রতি' কবিতাটি শেষোক্ত বর্গের অন্তর্গত।

কবিতার বিশ্লেষণাত্মক পাঠ-১

সাল ১৮৬২।কবি নিজের ব্যারিষ্টারি পড়াশোনার জন্য বিলেত যাচ্ছেন। সমস্ত বন্দোবস্ত সারা হয়ে গেছে। 'ক্যান্ডিয়া' নামক স্টিমারে তিনি যাবেন সে বিষয়ে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি জানাচ্ছেন-'You will be pleased to hear that I have completed my arrangements–and–God willing–purpose strating on the morning of 9th instant per the steamer 'candia'। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কবির প্রস্তুতি-পর্ব সারা হয়ে গেছে ঠিক এই সময়পর্বে কবির অন্তরে যে হতাশা, মাতৃক্রোড় ছেড়ে যাওয়ার যে যন্ত্রণা তা এখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কবিতাটির অন্তর্বয়ান লক্ষ করলে বোঝা যাবে কবি নিজেকে এই মাতৃকার কাছে স্মরণে রাখার চিরবাঞ্ছিত আশা ভরসার কথা বলতে চেয়েছেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যিনি কৈশোর কালে জন্মভুমি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে কাব্যলক্ষীর আরাধনার জন্য পণ নিয়েছিলেন তিনিই স্বদেশ ছাড়ার প্রাক মুহূর্তে এইরকম মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলেন কেন? এমনকি মানুযের মনে সারা জীবন রয়ে যাওয়ার বর বা চাইছেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে তিনি এই বঙ্গভূমিতে সাহিত্য সেবকের কাজ নিয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত রূপে সফল ও হয়েছিলেন। কবি জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর ভাবনা ছিল একেবারে বিপরীতমেরুতে এ কথার স্বীকারোক্তি কবি অন্য একজাগায় দিয়েছেন—'হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন;-/তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি, /পর—ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ'। কিন্তু এই ভ্রমণ তাকে বেশিদিন করতে হয়নি ফিরে এসেছিলেন যথাযথ জায়গায়। তারপরে সাহিত্যদেবী তাকে ফিরিয়ে দেননি। এখান থেকে কবিজীবনের সংশয়ের সূত্রপাত; কেননা যদি এই বিদেশে যাওয়ার পর কোনো বিপদ যদি ঘটে তাহলে এই দাসের মনে রাখার কথা বলেছেন। কবি নিজেকে যখন 'দাস' বলে উল্লেখ করেছেন তাহলে পাঠক হিসেবে বুঝতে অসুবিধা হয়না। তিনি এখানে দেশমাতৃকার কাছে আকূল মিনতি করছেন কেননা তিনি মানুযের মনের মন্দিরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে চাইছেন। কিন্তু কীভাবে তিনি মনের মন্দিরে স্থান পাবেন? আসলে কবিমনের

সুপ্ত বাসনা তাঁর সাহিত্যকীর্তির মধ্যে মধ্যে অমর হয়ে থাকবেন। সে কারণে দাস সম পুত্র কে যেন বঙ্গমাতা ক্ষমা করে দেন। তবে তারপর কবি মনে একথার উদয় হয়েছে যদি নিজের সাহিত্যসেবার মধ্যে কিছু ভুল ঘটে যায় তাহলে তিনি কোকনদ বা লালপদ্মকে মধুহীন না করার আকুতি জানাচ্ছেন। এখানে কবি নিজেকে লালপদ্মের সঙ্গে সমীকৃত করে দেখেছেন। কিন্তু কবি এখানে কিসের ভুলের কথা বলতে চাইছেন? আসলে সাহিত্যসেবায় তা পূর্বের ভুল তার হৃদয় থেকে নির্বাপিত হয়নি তাই সেই সময়ের কবি হৃদয়ের যন্ত্রণা এখনও সম্ভবত রয়ে গেছে তাই সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেজন্য বঙ্গমাতার কাছে প্রার্থনা করছেন ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য।

তবে দূরে চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো খেদোক্তি নেই, নেই ব্যক্তি জীবনের আকুতি; কবিতার মধ্যে যে সত্যকথন তিনি উপস্থাপন করেছেন সেই কারণে তিনি বলেছেন-‘প্রবাসের, দৈবের বশে/জীবতারা যদি খসে/এ দেহ আকাশ হতে নাহি ক্ষেদ তাহে’। এখানে কবি বোঝাচ্ছেন যদি বিদেশে আমার মৃত্যু ঘটে কোনো দুঃখ নেই এমনকি তিনি বিশ্বাস করেন এ জীবন ভঙ্গুর, জীবনের কোনো স্থিরতা নেই; কেননা জন্ম মানেই ব্যাক্তি মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। তাই এই চিরন্তন সত্যের কোনো অপলাপ হবে না। কবি আহত হবেন যদি তাঁকে ভুলে যাওয়া হয় এবং এরপর কবি বলতে চান যদি তাকে স্মরণে রাখা হয় তাহলে সমস্ত কিছুকে মেনে নিতে রাজি এমনকি তিনি মৃত্যুর শমনকেও ভীত না হয়ে মেনে নিতে রাজি আছেন। তাই তিনি বলেছেন মক্ষিকাও অমৃত হ্রদে পড়লে তার কোনো ক্ষতি নেই এখানে কবি যেন নিজেকে মক্ষিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিমনের এই রকম বাসনা খুব ভালো ভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে তিনি তাঁর সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ সাহিত্য সেবায় ব্রতী হয়েছেন। তাই এই রকম অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে কোনো অতিশয়োক্তি নেই বরং একজন কবির অন্তিম বাসনা প্রকাশ পেয়েছে।

এই অসামান্য গীতিকবিতার মধ্যে কবি আত্মাবিষ্কারের সোপান হিসেবে ব্যবহার করেছেন, এতক্ষণ কবিতার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে বার বার বলেছেন এবার অন্যের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখার কথা বলেন। সেই কারণে তাঁর স্বীকারোক্তি—সেই মানুষ অক্ষয়, অমর যাকে সাধারণ মানুষ সারাজীবন মনে রেখে দেয়। কেননা কবি মনে সংশয় জেগেছে তাকে কি জন্য মানুষ মনে রেখে দেবে? সত্যি কী কোনো গুণ রয়েছে যার ভিত্তিতে তাকে মনে রাখবার কথা। আসলে নিজের সম্পর্কে কবির যেন আত্মবিশ্লেষণ—এই উপলব্ধি প্রতিটি সৃজনশীল বিবেকের। কিন্তু শেষে আবারও তিনি পূর্বের মতন করে বঙ্গমাতার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তাবে একটু ভিন্নভাবে এবার তাঁর বক্তব্য যদি ভুলটাকেও গুণ ধরে নিয়ে ক্ষমা করেন নিজের সন্তানকে তাহলে অমরতা পাবেন। আসলে কবি নিজের কাছে যখন নিশ্চিত হতে পারছেন না তখন নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে চাইছেন নিজের তৈরি করা কোনো এক দেবীর কাছে। কাব্য রচনার মধ্যে সেই দেবী যাতে তাঁর জীবন যাপনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতেন তাহলে জীবনে স্থিতি আসতে পারত। এখানে কবি বলেছেন-‘অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে’—এখানে ‘সুবরদে’ শব্দের মধ্যে পাঠক বুঝতে পারছেন সুন্দর বর—এর কথা বলা হচ্ছে, যা কবির প্রত্যাশা।

'স্মৃতি-জলে' শব্দটি আলঙ্কারিক শব্দ, যা কবি শেষ চরণে ব্যবহার করছেন। এখানে স্মৃতিকে জলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্মৃতিকে এবং জল উভয়েরই গতিময়তা রয়েছে কেউ স্থবির নয়। এমনকি স্মৃতিতে যেমন নতুন নতুন ভাবনার জন্ম হয় তেমনি জলে ও নতুন পদ্মের আগমন ঘটে। সেখানে কালের বা সময়ের বিচার হয় না শরত বা বসন্তকালে যে কোনো মাসে প্রস্ফূটিত হতে পারে। এই পদ্মের আগমণে যে-কোনো পুষ্করিনীর শোভাবর্ধন করে তেমনি কবির কাব্যের মধ্যে যেন সেই সৌন্দর্য থাকে, সময় ভেদে পাঠকের হৃদয়ে সে সৌন্দর্যের স্পর্শ দিতে পারে।

কবিতার শুরুতে মধুসূদন কেন বায়রনের লাইন দিয়ে শুরু করলেন—'My native Land—Good Night'? বায়রনের কবিতাটির সঙ্গে মধুসূদনের কবিতার ভাবে ও রুপে সম্পূর্ণ পৃথক। কেবলমাত্র এই লাইনটির মধ্যে জন্মভূমির প্রতি একটি গাঢ় বেদনা ধরা পড়েছে বাকি সবগুলি লাইনে পৃথক পৃথক ভাবনার প্রকাশ। বায়রনের কবিতা মুলত আখ্যায়িকা যেখানে রাতের অন্ধকারের মোহময়য়তা, মৃদুমন্দ বাতাসের আওয়াজ, সমুদ্রের নীলাভ জলে সূর্যের অস্ত যাওয়া ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির এই রূপকে স্বাগত জানিয়ে কবি জন্মভুমিকে বিদায় জানিয়েছেন। অপরদিকে মধুসূদনের কবিতায় জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কবিতার বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

বাংলা গীতিকবিতার ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। উনিশ শতকের সময়-পর্ব জুড়ে বঙ্গ-মানসে আধুনিকতার প্রভাব পড়েছিল, সেই পথ ধরে সাহিত্যের অঙ্গনে নানাবিধ বিবর্তন দেখা যায়। গীতিকবিতা সেই রকম এক কবিতা-প্রকরণ। কবির আত্মগত ভাবনা—যা দুঃখের সেগুলিকে কবি প্রকাশ করেন নির্দিষ্ট ছন্দোবদ্ধে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলাদেশে যে কজন কবি এই কবিতা প্রকরণ অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম মধুসূদন দত্ত। এখানে কবির নিজস্ব প্রতিবেশের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। মধুসূদন যখন এই নব্যধারার প্রচলন করতে গেলেন তখন যে সমস্ত সমস্যা সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে সাজানো যেতে পারে—

ক। মধুসূদনের পূর্বে যেহেতু বাংলা ভাষার উৎকর্ষ লক্ষ করা যায় না সেহেতু ভাষার ক্ষেত্রে নতুন রুপে পর্যালোচনা করলে প্রকৃত অর্থে কবিতার মূল রস ধরা পড়বে না।

খ। গীতিকবিতার ছন্দ কি হবে তা কি শুধুমাত্র মিশ্রবৃত্ত ছন্দে রচিত হবে নাকি অন্য কোনো ছন্দে? পয়ার না মহাপয়ার এই রীতিতে বাংলা ছন্দের প্রকাশ ঘটবে, কেননা এটুকু তিনি জানতেন যে ইউরোপীয় ভাবনা সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করলে তার পরিণতি খুব সুখকর হবে না।

গ। কত অক্ষর বা মাত্রার উপর নির্ভর করে বাংলার গীতিকবিতার বিন্যাস সম্ভব, কেননা চরণের মিলের ক্ষেত্রে যদি শ্রুতি মাধুর্যের প্রকাশ না-ঘটে তাহলে সার্বিকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

বস্তুতপক্ষে মধুসূদনের কাব্যভাবনার মধ্যে রয়ে গেছে এই বিতর্কগুলি ছিল। তিনি কাব্যের মধ্যে এগুলি নিরসন করেছেন নিপুণভাবে। কখনো আট মাত্রার পয়ার বা দশ মাত্রার মহাপয়ারে। তবে

গীতিকবিতার ফর্ম হিসেবে যদি সনেটকে দেখা যায় তাহলে সেখানে কবি শেক্সপিয়র বা পেত্রার্ক এর পথ অনুসরন করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কবি সব কিছুকে অতিক্রম করে তিনি নিজস্বরীতি প্রয়োগ করেছিলেন এবং সেখানেই মধুসূদনের স্বাতন্ত্র্য।

আলোচ্য কবিতাটি গীতিকবিতার অংশবিশেষ; সমালোচকদের ভাষায় বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিতা যেখানে স্পষ্টাকারে আত্মবিলাপের কথা যথার্থ্যভাবে ফুটে উঠেছে। কবি প্রথম থেকেই এই বিষয়ে পারদর্শী। মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার যন্ত্রণা এখানে বর্ণিত হয়েছে। মধুসূদনের গীতিকাব্যসাহিত্যের মধ্যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ছাড়াও বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতার যেমন 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতাদ্বয় উল্লেখযোগ্য। তবে শেষোক্ত কবিতাদ্বয়ের মধ্যে ছন্দ, মিল, ও বিচিত্র ধরনের স্তবক নির্মিতি চোখে পড়ে। এখানে কোনো একমাত্রিক নিয়ম কানুন নেই, মিল-অমিলের দ্বন্দ্বে কবিতাটি তৈরি হয়েছে-

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ৮ + ৮
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ ৮ + ৮
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে ৮ + ৮

স্বাভাবিকভাবে এই দীর্ঘায়িত চরণের মধ্যে কবির আকুতি তা যেন ছন্দোনির্মিতির মধ্যে নজরে পড়ে। আসলে মধুসূদন যখন জাতীয় জীবনের ছবি আঁকছেন তখন অনেক বেশি মহাকাব্যের রীতিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু গীতিকবিতায় তিনি অনেক বেশি লিরিকের ধাঁচা ব্যবহার করেছেন। আরেকটি দিক আলোচনা করা প্রয়োজন কবি কবিতার ক্ষেত্রে কেবল অক্ষরের মাত্রাকে ভেঁঙেছেন, সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই কবির রয়েছে, তবে দেখতে হবে সেখানে সাহিত্যরসে খামতি ঘটেছে কিনা। উল্লিখিত চরণগুলির দিকে যদি নজর রাখি দেখা যাবে 'ঘটে যদি পরমাদ'—'পরমাদ' শব্দটি প্রমাদের নামান্তর— কবি শব্দটি ভেঙেছেন তবে সেক্ষেত্রে কাব্যসুষমা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ঠিক একইভাবে লক্ষ করা যাবে শেষ চরণে—'মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!' উল্লেখ্য এখানে শুধুমাত্র সনেটের ধাঁচাকে অক্ষুন্ন করতে 'শরতে' লিখলে খুব বেশি ভুল হত না কেননা 'শরতে' বা 'শরদে' দুটি শব্দই তিন মাত্রার কিন্তু কবি পরের শব্দটি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যা শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে— যা গীতিকবিতার বৈশিষ্ট।

মধুসূদন যে সনেটের অন্যতম কবি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর এই সনেট উত্তরকালের বাংলা কাব্যধারার উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলা সাহিত্যের নতুন ফর্ম হিসেবে এটিকে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলতে—'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন' কাব্য দুটি ধরা হয়,কাব্যযুগলের। যে স্তবক ব্যবহৃত হয়েছিল তা মধুসূদনকে অনুকরণ করে সৃজিত। বাংলা গীতিকাব্যসাহিত্যে ত্রিপদী পয়ার সৃষ্টি করে গীতিমাধুর্য দেন মধুসূদন। সেই একই ধারা রক্ষা করেছিলেন বিহারীলাল,পাশাপাশি রেখে তুল্যমূল্য বিচার করলে তা বোঝা যাবে-

এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।

জন্মিলে মরিতে হবে

অমর কে কোথা কবে

চিরস্থির কবে নীর হায়,   রে, জীবন-নদে

বিহারীলাল ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে তৃতীয় সর্গে সারদার যে বন্দনা করেছেন তা হল-

জীবন—কিরণ রেখা

অস্তাচলে দিল দেখা,

এ হৃদি-কমল দেবী ফুটিবে না আর

দুটি কবিতার ভাবের দিক দিয়ে সাধর্ম্য রয়েছে, দুটি কবিতাতেই কবি উত্তম পুরুষে মনের আকুতি প্রকাশ করেছেন। ত্রিপদী ও পয়ারের দিক দিয়েও বলা যায় নৈকট্য এমনকি বাকধর্মের দিক দিয়ে উবয়ে নিকটবর্তী বলে মনে হয়। মধুসূদনের ‘এ দেহ-আকাশ’ এবং বিহারীলালের ‘এ হৃদি-কমল’ একই বাকপ্রতিমার যুগ্মরূপ। আবার বঙ্গভুমির কাছে আবেদনের ক্ষেত্রে ও সাদৃশ্য রয়েছে, মধুসূদন জানাচ্ছেন—

ফুটি যেন স্মৃতিজলে

মানসে, মা, যথা ফলে

মধুময় তামরস   কি বসন্ত, কি শরদে!

‘সারদামঙ্গল’-এ বিহারীলালের বাকপ্রতিমার দিকে নজর দেওয়া যাক—

মানস- সরসী কোলে

সোনার নলিনী দোলে

আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর

মধুসূদনের কল্পিত ‘মধুময় তামরস’ এবং বিহারীলালের ‘মানস-সরসী’ বাকভঙ্গিগত দিক দিয়ে একীভূত হয়ে উঠেছে।

৬.৪ মূলপাঠ

My Native Land Good-Night!—Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে

সাধিতে মনের সাধ,   ঘটে যদি পরমাদ,

মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনাদে!

প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব—তারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হতে ত্ত নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির করে নীর, হায় রে, জীবন—নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকা ও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন,—
কিন্তু কোনগুণ আছে, যাচিবে যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো শ্যামা—জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে!
ফুটি যেন স্মৃতি জলে, মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্ত, কি শরদে!

৬.৫ প্রশ্নপত্র

ক) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মধুসূদনের কাব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট আলোচনা কর।

২। গীতিকবিতা বলতে কী বোঝ? মধুসূদনের কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

৩। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার সারমর্ম বিচার কর।।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। কবিতার প্রথমে কবি কেন বায়রণের লাইন ব্যবহার করেছেন?

২। মধুসূদনের দুঃখের কারণ কী?

৩। বিদেশে কবি কেন গেলেন?

৪। 'মধুময় তামরস'-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৬.৬ সহায়ক গ্রন্থ

১। *আশার ছলনে ভুলি*; গোলাম মুরশিদ

২। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*; যোগীন্দ্রনাথ বসু

৩। *মধুসূদন রচনাবলী*; ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদিত)

৪। *মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*; ক্ষেত্রগুপ্ত (সম্পাদিত)

৫। *আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা*; জীবেন্দ্র সিংহ রায়

৬। *সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ*; জগদীশ ভট্টাচার্য

একক-৭ ❑ ওরা কাজ করে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

৭.৩ নামকরণের সার্থকতা

৭.৪ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাবিতা হিসেবে বিশ্লেষণ

৭.৫ আধুনিকতার পাঠ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে জনতাভাবনা

৭.৬ মূলপাঠ

৭.৭ প্রশ্নপত্র

৭.৮ সহায়ক গ্রন্থ

৭.১ উদ্দেশ্য

কবিতার সামগ্রিক অনুসন্ধানে জানতে পারা যায় যে কবি এই সময় রোগ থেকে সদ্য মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এই জগত বা পার্থিব বিষয় থেকে আত্মনিবৃত্তি করেননি। পার্থিব জগতের প্রতি অকৃত্তিম মায়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে এখানে শ্রমজীবি মানুষের ভূমিকা কী সে কথা স্মরণ করিয়েছেন কবি, মধ্যবিত্তের অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে যারা পরিচিত তাদের প্রতি কবির পক্ষপাত। তবে তা কোনো আবেগের জন্য নয় বরং যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সভ্যতার মূল মেরুদন্ড যারা তাদের কথা এই কবিতা পাঠের মধ্যে জানতে পারা যায়।

৭.২ কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

কোনো কবিতার যথার্থ্য মূল্যায়ন করতে গেলে কবিতাটির গ্রন্থকাল সম্পর্কে জানাটা জরুরি। এবং এক্ষেত্রে কবিতা সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মত বিপুল জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী ও কাব্যজগতে তার বিপুল সম্ভার থেকে পৃথক করে কোনো কবিতাকে বিচ্ছিন্ন করে, কবিতার সামূহিক বিচার করা যে ভুল, সে কথা পাঠক মাত্রেই জানেন। 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি কবি জীবনের শেষ পর্বে রচিত 'আরোগ্য' কাব্যগ্রন্থটি থেকে সংগৃহীত। কাব্যগ্রন্থটিতে উৎসর্গ—বিষয়ক কবিতা সম্বলিত মোট চৌত্রিশটি কবিতা। কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ করকে। গ্রন্থটির প্রকাশকাল

ফাল্গুন ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে। বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকায় ১৯৪১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রকাশকাল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে সমগ্র কাব্যগ্রন্থের দিকে লক্ষ রাখলে বোঝা যাবে কোথাও কবিতাগুলির পৃথক কোনো নাম নেই। কবিতাগুলি যখন পরবর্তী সময়ে 'সঞ্চয়িতা' বা অন্যান্য গ্রন্থে স্থান পায় তখন কবিতার নামকরণ করা হয়েছে। কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, সদ্য রোগমুক্তির পরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রন্থভুক্ত হওয়ার আগে এই বইয়ের দুটি কবিতা সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয় তবে বাকি সবগুলি কবিতার প্রথম প্রকাশ ঘটে গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

'ওরা কাজ করে' কবিতাটি কাব্যগ্রন্থের ১০নং কবিতা। কবিতাটির নামকরণ পরবর্তী সময়ে হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা' কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে সংকলক সংশ্লিষ্ট কবিতাটির শেষ লাইন উদ্ধৃত করে নামকরণ করেছেন। কবিতাটি ১৯৪১ সালের ১৩ই ফ্রেব্রুয়ারির সকালবেলাতে উদয়নে তিনি রচনা করেছিলেন। অসুস্থতা থেকে আরোগ্যলাভের পর শান্তিনিকেতনে বসে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি—ফেব্রুয়ারি মাসে যে কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন এবং তার সঙ্গে পূর্বতন কয়েকটি কবিতা যুক্ত হয়ে কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ।

কবিতাটি কবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। কবিতাটির মধ্যে ফিরে এসেছে সহজ সরল এক অনাড়ম্বর জীবনবোধ। কোনো জটিল বক্তব্য নেই, মাটির কাছে এসে যেন তিনি নিজেই এই ধূলিময় পৃথিবীর রসাস্বাদন করছেন। কবিতাটিতে একপ্রকার স্বীকৃতি রয়েছে—যারা প্রকৃত অর্থে সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন শক, হূণ এমনকি ইংরেজরা প্রবল প্রতাপ নিয়ে এই ধরাধামে আসলেও তারা কেউ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন না অথবা তারা কেউ সভ্যতার নিয়ন্ত্রক রূপে বিবেচিত হবেন না বরং অঙ্গ-বঙ্গকলিঙ্গের বন্দরে যারা কাজ করছেন তারাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৭.৩ নামকরণের সার্থকতা

যে-কোনো কবিতার নামকরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নামকরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, অনেক সময় নিজেই কোনো কবিতার বা নাটকের ক্ষেত্রে অনেকবার নাম পরিবর্তন করেছিলেন। সুতরাং নামকরণ তাঁর সাহিত্য-ভাবনার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়। শেক্সপিয়র যেখানে মনে করেন 'নামে কি এসে যায়' তার বিপ্রতীপ মেরুতে রবীন্দ্রনাথ নাম বিষয়ে সর্বদাই সজাগ ও সতর্ক থেকেছেন। কবির প্রত্যয়ে বার বার এসেছে সৃজনশীলতার সঙ্গে আপেক্ষিকতার বিরোধ; কিন্তু সেই বিরোধকে সন্তর্পণে এড়িয়ে এক গভীর ও বাস্তবোচিত বার্তা দিয়েছন নামাঙ্কনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে যেহেতু প্রাথমিক প্রকাশের মধ্যে কোনো নামকরণ ছিল না পরবর্তী সময়ে 'সঞ্চয়িতা'-তে সংযুক্ত হওয়ার পর নামাঙ্কিত করা হয়েছিল, তাই নামকরণ কতটা সফল সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। নামকরণ হিসেবে সত্যিই কি এই নাম রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে লগ্ন না কি অন্য কিছু? শেষের চরণ দিয়ে যেহেতু

কবিতাটির নামকরণ তাহলে সেখানে বুঝে নিতে হবে কবিতার সার্বিক ভাবনা উক্ত চরণটিতে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা। এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য 'ওরা কাজ করে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা। কবিতার শরীরে পাঠক পেতে পারেন এক অখন্ড কালচেতনা যা কবিতার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত।

কবিতা পাঠে পাঠক বুঝতে পারবে দুটি ভাগে বিভক্ত কবিতাটি। প্রথম পর্বে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাসচেতনা যা কোনো নির্দিষ্ট খন্ডের মধ্যে সীমায়িত নয়। অশক্ত, অসমর্থ শরীর তাঁর মনকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, তাঁর চেতনাকে জ্বরাগ্রস্থ করেনি বরং এই সময়ের মধ্যেও কবি ভাবছেন যুগের কালগর্ভে কত শাসকের আগমন ঘটেছিল কিন্তু তারা কেউ চিরস্থায়ী হয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের অতীত নিয়ে চিন্তা করেছেন। তাঁর অতীতমুখী মন দেখেছে সাম্রাজ্যবাদী পাঠানের দল কিংবা মোগলরা, যারা এই ভারতবর্ষে বিজয় পতাকা উড়িয়েছে কিন্তু কালের নিয়মে তারা সরে গেছে। তাদের প্রভাবও চিরস্থায়ী হয়নি। এমনকি প্রবল পরাক্রমী ইংরেজরাও এই পথে এসেছে আবার কালের নিয়মে তারাও অপসৃত হয়েছে। সে কারণে তিনি বলেছেন—'শূন্যপথে চাই/আজ তার কোনো চিহ্ন নাই'। 'শূন্যপথ' বলতে সাধারণত আকাশপথ বোঝায়। এখানে 'শূন্যপথ' শব্দটি আভিধানিক অর্থে নয় বরং আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে নিহিত রয়েছে অখন্ড কালচেতনা। মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে, ছায়ামাখা ইতিহাসে কোথাও নেই অগণন জনতা, হয়তো পাথুরে প্রমাণের নিরিখে রাজা বা মন্ত্রীদের নাম মনে রাখা গেলেও তাদের জন্য বলিপ্রদত্ত সাধারণ মানুষের যে ইতিহাস তা জনই বা মনে রাখে। সেই ইতিহাসের ভাঁড়ার কার্যত শূন্য বলা চলে, তাই প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস পর্যালোচনার ধারার অসম্পূর্ণতার দিকে প্রতি কবি আলো ফেলতে চেয়েছেন। তিনি স্মরণ করাতে চেয়েছেন ইতিহাসের যথার্থ পর্যালোচনা করতে গেলে নজর দিতে হবে মাটির প্রতি যেখানে মানুষ নিত্যদিনের সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। তাদের এই নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামী চেতনা কোনো খণ্ড কালপর্বে আবদ্ধ নয় বরং তা সংলগ্ন রয়েছে বিস্তৃত মহাকালপর্বে, কবি খুব স্নেহাষিক্ত হৃদয়ে মাটির পৃথিবীতে সংঘটিত সাধারণ মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবণতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কবিতাটির মধ্যে।

দ্বিতীয় পর্বে কবি এই পৃথিবীর দিকে নজর দিয়েছেন, যেখানে তিনি লক্ষ করছেন বিপুল জনতা অবিচ্ছিন্নভাবে কর্মে নিযুক্ত—কেউ দাঁড় টানে, কেউ হাল টানে, কেউ বা বীজ বপন কিংবা পাকা ধান কাটে। দেশ—দেশান্তরে এই জনগণ দিন-রাত এক করে সভ্যতার দাঁড় টেনে নিয়ে চলেছেন। কৃষক যেমন মাঠে ফসল ফলিয়ে পৃথিবীতে অন্নের সংস্থান যোগাচ্ছে তেমনি শ্রমিক সেই পণ্য বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পাঠানোর মাধ্যমে সভ্যতাকে পরিচালনা করেছে। ক্ষমতার বলে বলীয়ান শাসকের কীর্তিকাহিনি অনতিকাল পরে শিশুপাঠ্যে পর্যবসিত হবে কেননা এদের রাজছত্র একদিন ভেঙে পড়বে, বিজয়রথ একদিন থেমে যাবে কিন্তু তাতে সভ্যতার কোনো ক্ষতি হবে না। এই বিপুল জনতা যারা পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করছে, তাদের ব্যতিরেক বোধহয় সভ্যতা অচল ও অসার। সেই বিপুল জনতা গুজরাট-পাঞ্জাব বা মহারাষ্ট্রের বন্দরে বন্দরে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেদের কাজ করে চলেছে। তাদের

কর্মের মধ্য দিয়ে সর্বদা মুখরিত হয়ে উঠেছে এই পৃথিবী। কবি বলেছেন—'মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি'।

পূর্বেই বলা হয়েছে কবিতাটি দুটি পর্বে বিভক্ত। শেষ পর্বে কবি পার্থিব জগতের সেই বিপুল, অগণন শ্রমজীবী জনতার উপর জোর দিতে চেয়েছেন। 'ওরা' বলতে সেই অগণিত জনতার কথা বলতে চেয়েছে যারা ব্যতীত এই পৃথিবী অর্থহীন। তাদের এই কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে সচল এই জগত। এখানে কবি যে 'মহামন্ত্রধ্বনি'র কথা বলতে চেয়েছেন যা হল জীবনের পরম বস্তু কেবল সভ্যতার সাম্রাজ্যের দখল নয় বা রক্তহানি নয় তার চেয়ে অধিকতর সত্য কর্মের মধ্যে সভ্যতার সেবা করা—যাকে কবি 'মহামন্ত্রধ্বনি' বলেছেন। কবি তাঁর পূর্বতন গ্রন্থ 'রাশিয়ার চিঠি'তে এই জনতাকে তিনি বলেছেন—সভ্যতার পিলসুজ। কিন্তু তারা যে অখ্যাত সে কথা তিনি কবুল করে নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে—'চিরকাল মানুষের সভ্যতায় একদল লোক থাকে, তাদের সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত'। বর্তমান কবিতাটি লেখার প্রায় একদশক আগে লেখা এই গ্রন্থে তিনি সভ্যতার মূল বাহকদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছিলেন তারই প্রসারিত ভাবনা বর্তমান কবিতাটিতে পরিস্ফুট হয়েছে। যাদের উপর আমরা আস্থাশীল তাদেরকে নিয়ে ক'জন ভাবি। কবি তাই অকুণ্ঠভাবে তাদের মহিমাকীর্তন করেছেন; তবে এই ভাবনায় তিনি কোনো ব্যক্তির সীমায়িত ছকে বাঁধা জীবনের সময়সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি বরং আরও গভীর অর্থ সংযোজিত করেছেন। কর্মের ব্যস্ততা যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সংক্রমিত সে বিষয়ে এখানে ঈঙ্গিত দিয়েছেন। কবি অনেক বেশি এই কবিতার মধ্যে জনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেইসূত্রে কবিতার নির্গলিতার্থ বজায় রেখেছেন শেষ চরণ পর্যন্ত—'ওরা কাজ করে'। তাই বলা চলে এই কবিতায় যে ভাবনা বিকশিত হয়েছে তা নামকরণের মধ্যে যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে।

৭.৪ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাবিতা হিসেবে বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতাগ্রন্থ হিসেবে 'রোগশয্যা', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' এই ত্রয়ী কাব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথম দুটির কাব্যভাবনা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবি এলেন কালিম্পং-এ। আর এখানেই কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর তাকে নিয়ে আসা হল কলকাতাতে। এর কিছুদিন পর তিনি শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং উদয়নে বসে যে সকল কবিতা লিখেছিলেন তার অধিকাংশ 'আরোগ্য' এবং কিছুটা 'রোগশয্যা'তে প্রকাশিত হয়। তবে এই পর্বের কাব্যবিচার করতে গেলে বেশ কিছু বৈশিষ্ট পাঠকের ধরা পড়ে। এই পর্বে কবি কোনো দর্শনগত ভাবনাকে আশ্রয় করেননি, কোনো অপার্থিব চিন্তালোকের কথা আনেননি। ঋজু জীবনসাধনাকে পাথেয় করে অগ্রসর হয়েছেন, কবি সৃজনশীল সত্তা কোনো মায়াবী জগতের প্রতি সম্মোহিত নয়। এইপর্বে কবি অনেক বেশি মাটির কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন; কবির ভাষায়—'এ

দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি'-এই ভাবনা আমরা পাবো আরও অনেক কবিতায়। এখানে তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছ, প্রকাশের ক্ষেত্রে ও বোঝা যায় অলঙ্কারবিহীন তাঁর ভাষা। এই পর্বে অনিয়মিত মুক্তছন্দ ব্যবহৃত হলেও চরণের দীর্ঘতা অনেক ক্ষেত্রে দুটি চরণের মধ্যে মিল নেই, শব্দ এখানে কোনো জটিল উত্তর রূপায়ণ করতে প্রচেষ্টা নেয় নি।

সদ্য রোগমুক্তির পর প্রাণের স্পন্দন জেগেছে, তাই সেই প্রাণের বার্তা দিতে চেয়েছেন পৃথিবীর কাছে। কবিতাগুলিতে সেই বার্তাই প্রকাশ পেয়েছে—এই পৃথিবীর মানুষ, পশুপাখি, তরুলতা সবই সুন্দর এ যেন ঔপনিষদিক আনন্দের অভিব্যক্তি। এই সকল ভাবনা পূর্ববর্তী অনেক কাব্যে থাকলেও সেখানে অতীন্দ্রিয় ভাবনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কবি অনেক বেশি অনাড়ম্বর জীবনের মধ্যে সহজ সত্যকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন। মৃত্যুচেতনা নিয়ে তার অপার বিস্ময় এখানে প্রতিফলিত হয়েছে, এছাড়া চাষার ধানকাটা, মাঝির জীবন, নদীর চলমানতা এ সবই এই পর্বে প্রাণ পেয়েছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি অতীতের অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু কবিবচনে যখন মূর্ত হয়েছে—'মাটির পৃথিবীর পানে আঁখি মেলি যবে'—সেখানে তিনি খোঁজ পেয়েছেন কৃষকের দলের মাঠে কাজ করা, শ্রমিকের বন্দরে বন্দরে ঘোরা-ফেরা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এ বার্তা কবি দিতে চেয়েছেন যে সমাজের চালিকাশক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা। ইতিহাস বা মহাশূন্যের দিকে তাকালেও তিনি সেই ভাবনা নিয়ে কোনো ঐশ্বরিক চেতনায় আচ্ছন্ন হননি বরং পার্থিব বস্তুচেতনার মধ্যবর্তিতায় তিনি সভ্যতার মূল স্বরূপকে চিনিয়েছেন। কবিতাটির অন্তর্বয়ানে কোথাও গভীর বা রহস্যময় মৃতুচেতনার কথা বলা নেই বরং রয়েছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের কর্মমুখরতা, যার মধ্যবর্তিতায় এই জগতের জাড্য সুরক্ষিত, ইতিহাসের মহাকালচক্রে অনেকে নৃপতির আগমন ঘটেছে কিন্তু তারা এই ধরণীতে কোথাও কোনো রেখাচিহ্ন নেই রাখতে পারেনি বরং ইতিহাসের গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে অথবা শিশুপাঠ্য গ্রন্থে তাদের স্থান হয়েছে। কিন্তু এই অগণিত জনতার কথা তিনি বক্ষ্যমান কবিতাতে বিশ্লেষণ করেছেন। এই পর্বের অএনক কবিতায় জনতার ছবি পাওয়া যায়।

জীবনের অস্তগোধূলিতে তাঁর ভাবনার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জায়মান বিশ্বে একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভাবনা বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যদি দুটি কবিতাকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে বিষয়ের সারবত্তা বোঝা যাবে—১৯৪১ সালে রচিত হয় দুটি কবিতা—'ঐকতান' এবং 'ওরা কাজ করে'। প্রথমটির কাব্যগ্রন্থ 'আরোগ্য' দ্বিতীয়টির কাব্যগ্রন্থ 'জন্মদিনে'র অন্তর্ভুক্ত। দুটি কবিতার ভাব নৈকট্য ধরা পড়ে। 'ঐক্যতান' কবিতায় প্রথম থেকে তিনি বিশ্বাস করেছেন এই বিশ্ব চরাচরে কতটুকুই বা মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে? মানুষের পক্ষে কি সত্যি আদৌ তা সম্ভব? পৃথিবী জুড়ে মানুষের কত কীর্তি, দুর্গম পথ বেয়ে সভ্যতার আলোক প্রসারণকারী সেই মানুষ, যারা সভ্যতার পিলসুজ তাদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। যে কারণে ওদেরকে দেখেছেন 'উচ্চাসনে' বসে কিন্তু কখনও তাদের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেননি। সেক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতাকে অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। কেননা যে চাষা মাঠে

নিরলসভাবে খেটে চলেছেন তার কাছে তিনি যেতে পারেননি এ ব্যথা তিনি আসন্ন মৃত্যুর সামনে এসে উপলব্ধি করেছেন। তাই সাহিত্যের ভাবনা কী হওয়া উচিত? এ বিষয়ে তিনি বলেছেন—'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,/কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,/যে আছে মাটির কাছাকাছি,/সে কবির বাণী—লাগি কান পেতে আছি'। তিনি প্রত্যাশী ছিলেন এইরকম এক কবির জন্য। যিনি প্রকৃত অর্থে এই বিশাল না-পাওয়া জনতার কথা সাবলীলভাবে কবিতায় স্থান দেবে। এই ভাবনার প্রতিচ্ছবি কি পাওয়া যায় 'ওরা কাজ করে' কবিতায়। কবিতায়দ্বয়ের মর্মার্থও প্রায় এক। শেষোক্ত কবিতাটিতে প্রথম কবিতার প্রায় তিন সপ্তাহে পর লেখা, এখানেও কবির একই ভাবনা উচ্চারিত হয়। মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া সাম্রাজ্যলোভী দলের বিপরীতে আছে সাধারণ মানুষ, যারা এই পৃথিবীর সম্পদকে বৃদ্ধি করেছে। যুগ-যুগান্তর ধরে যাদের উপর ভর করে সভ্যতা এগিয়ে গেছে। তবে এখানে কবি যখন উচ্চারণ করেন-'ওরা চিরকাল/টানে দাঁড়,ধরে থাকে হাল;/ওরা মাঠে মাঠে/বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে/ওরা কাজ করে/নগরে প্রান্তরে'। কবি শুধুমাত্র গ্রামের কৃষকের শ্রদ্ধশীল নয় বরং সেই ভাবনাকে আরো সম্প্রসারিত করে নগর পর্যন্ত এনেছেন। সভ্যতার ধারণ বা বাহন-এর ক্ষেত্রে কৃষক বা শ্রমিক উভয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য সে কথাই কবি কণ্ঠে উচ্চারিত।

৭.৫ আধুনিকতার পাঠ ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'জনতা' ভাবনা

জীবন সায়াহ্নে কবি এসে তাঁর সদূরপ্রসারী ভাবনা ছিল পৃথিবীর অমিত পরিসরে অন্বেষণ করেছেন সাহিত্য রূপ কি হবে? এই সময়পর্বে কবি কোনো এক আধুনিক কবির বই উলটে পালটে পড়লেন এবং বলে উঠলেন—'এরা কবিতায় এত ধরা দেয় কোন সাহসে। অথচ কবিতায় সত্য না থাকলে চলে না। সত্য ফুটে উঠবেই, নয়তো টেঁকে না' এখানে বলা প্রয়োজন এই কয়েকটি শব্দবন্ধে তিনি হাল আমলে কবিতার মূল্যায়নের সঙ্গে কবিতার দর্শন নিয়ে মতামত প্রকাশ করেছেন। কবির সঙ্গে আধুনিক কবিদের ভাবনাগত প্রতর্ক ছিল দীর্ঘদিন ধরে, তাঁর প্রত্যুত্তরও কবি দিয়েছেন সাহিত্যে। স্বঘোষিত আধুনিক কবিরা যেখানে পুর্বের যাবতীয় কাব্যকলা বা সাহিত্যকীর্তিকে অস্বীকার করে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন আধুনিকতার মানদণ্ডে, কিন্তু সাহিত্য যে শুধুমাত্র আপৎকালীন প্রতিক্রিয়া তা নয় তার মধ্যে যদি শাশ্বত কোনো আবেদন না-থাকে তাহলে সাময়িকভাবে স্বীকৃতি পেলেও তা চিরকালের হয় না—কবি এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' নামাঙ্কিত গ্রন্থে যার সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে। কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁর কাব্যে সাধারণ মানুষের কথা নেই, অথবা প্রেমের ভাবনা অনেকটা সেকেলে। সবই তিনি জবাব দিয়েছেন অক্ষরে অক্ষরে। এখানে বলা প্রয়োজন, সাধারণ মানুষের অনুপস্থিতি তাঁর কাব্যে—এই অভিযোগ অবান্তর ও অমূলক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জগতের পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে এই অভিযোগের অসারতা ধরা পড়ে।

আধুনিকতার পাঠক হিসেবে যারা বলতে যান মেঠো বাস্তবতার কথা বা নকল রিয়েলিজমের কথা—তারা যেভাবে সাহিত্য দেখতে চান কালের নিরিখে তা অবান্তর। ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ প্রকাশ করতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু কবির সাহিত্যকীর্তির ঊষালগ্ন থেকেই আমরা দেখব বিশেষত শিলাইদহ-পাতিসর পর্বে তাঁর কাব্যভূমিতে স্থান পেয়েছে অগণিত সাধারণ মানুষের চেনা ছবি। এই সময় পর্বে 'রথের রশি'তে কবি জানান—'যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে/তারা দাঁড়াক মাথা তুলে'। এই রকম বক্তব্য কবির কাব্যভূমিতে এসেছে বারবার, কিন্তু পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হয়নি। এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত যদি লক্ষ করা যায় তাহলে এই ভাবনার সম্প্রসারণ ঘটবে—'আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো—নিরুপায়-তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই'—ছিন্নপত্রের লাইনগুলি কবির পক্ষপাত বুঝতে অসুবিধা হয় না; এছাড়াও যখন তিনি বলেন—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ,যাদের করেছ অপমান/অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'। এইরকম সম ভাববলয়ের শিল্পসম্মত অনুবর্তন প্রায়ই ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। সেই ভাবনার পুরিপুষ্টি যেন একটু আলাদাভাবে এই 'আরোগ্য' কাব্যের মাধ্যমে পুনরায় এসেছে। সেই মাঝিদের সুর, কৃষাণের কর্ম সবই এসেছে কাব্যের মিত পরিসরে।

তবে কাব্যের অন্তর্বস্তু যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে বলতে হবে যে এই সাধারণ মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন করেননি; বরং শ্রমিক বা কৃষককে যুগ-যুগান্তরের অনালোচিত ভাবনা থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ মানুষের চিত্রপট তুলে ধরতে গিয়ে সাহিত্যের যে রুচিবোধের জায়গা থাকে তাকে কখনও অস্বীকার করা যায় না—একথা স্বঘোষিত আধুনিক কবিদের একটা অংশের কাছে যখন মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায় তখনই বিসংবাদের সূত্রপাত। কবি লেখনিতে ধরা পড়ে-'যে আছে মাটির কাছাকাছি/সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি'। এশুধু জনৈক কবির প্রতি নয় তাঁর সাহিত্যরুচির প্রতিও তিনি সমান দৃষ্টি দিতে চান। তাই দেখা যায় কবিভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে অক্ষরমালায়-'ওরা চিরকাল/টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল/ওরা, মাঠে মাঠে/বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে/ওরা কাজ করে/নগরে প্রান্তরে'। এই চিত্রপট নিশ্চিতভাবে সাহিত্যের অন্দরমহলে স্বীকৃত এবং কবির জীবনব্যাপী তাঁর সাধনাভূমিতে ঘুরে ফিরে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। আবার খুব ভালো করে লক্ষ করলে এই ভাবনা উত্তরকালের কাছে অনুসরণীয় হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্রভাবে।

৭.৬ মূলপাঠ : ওরা কাজ করে

অলস সময়-ধারা বেয়ে
মন চলে শূন্য—পানে চেয়ে।
সে মহাশূন্যের পথে ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে।
কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে

সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধোত প্রবল গতিতে।
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল,
এসেছে মোগল;
বিজয়রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাকা।
শূন্যপথে চাই,
আজ তার কোনো চিহ্ন নাই।
নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো
যুগে যুগে সূর্যোদয়—সূর্যাস্তের আলো।
আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ,
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তার ও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাষায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল;
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে
জীবনে মরণে।

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে-প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনিতে থাকে মুখ ঢাকি।
ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পঞ্জাবে বোম্বাই—গুজরাটে।
গুরুগুরু গর্জন গুনগুনস্বর
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।
দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।

৭.৭ প্রশ্নাবলী

ক) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কবিতার মূল বিষয় বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

২। কবি জীবনের শেষ পর্বের কবিতা হিসাবে কতটা সার্থক?

৩। নামকরণ কতদূর পর্যন্ত সার্থক।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। কবিতাটিতে ইতিহাসের প্রসঙ্গ নিয়ে কবির অভিমত ব্যক্ত কর।

২। 'বিপুল জনতা' বলতে কবি কাদের কথা বলতে চেয়েছেন?

৩। 'আজ তার কোনো চিহ্ন নাই'-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৪। 'জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি'-বলতে কবি কী বলতে চেয়েছেন?

৭.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১। *রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড)*; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

২। *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ*; রাণী চন্দ

৩। *রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য*; শিশির ঘোষ

৪। *রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা*; জগদীশ ভট্টাচার্য

৫। *নির্মাণ ও সৃষ্টি*; শঙ্খ ঘোষ

৬। *রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়*; শুদ্ধসত্ত্ব বসু

একক-৮ ❑ বিদ্রোহী : নজরুল ইসলাম

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ কবি পরিচিতি

৮.৩ কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

৮.৪ কবিতার সারমর্ম

৮.৫ কবি নজরুল ও হুইটম্যান

৮.৬ কবিতার পুরাণ অনুষঙ্গ

৮.৭ মূলপাঠ

৮.৮ প্রশ্নপত্র

৮.৯ সহায়ক গ্রন্থ

৮.১ উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যর কবি নজরুলের আবির্ভাব ধুমকেতুর মতন হলেও তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। কবি হিসেবে তাঁর পূর্বজদের কাছে ঋণী হলেও নিজস্ব পথ তৈরি করেছিলেন কবিতা রচনার মাধ্যমে। পাঠ্য কবিতাটির মধ্যে তিনি এনেছেন পুরাণের প্রসঙ্গ আবার নিজেকে স্বাধীনতার পবিত্র যজ্ঞে আহবানের কথা বলেছেন বারংবার। প্রথাগত ছন্দকে ব্যবহার করেও কালোত্তীর্ণ হয়েছিল এই কবিতাটি। পাঠক হিসেবে 'আমি'-র বয়ানে তিনি বিশ্বব্যাপী পরিভ্রমণে কাব্যকে মহিমান্বিত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে 'লোকপ্রিয়' কবি হিসেবে দেখেছেন, কবি হিসেবে তিনি কেন লোকপ্রিয়? এই কবিতা পাঠের মাধ্যমে বোঝা যাবে।

৮.২ কবি পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবির নাম নজরুল ইসলাম। তবে তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে বলা যায় কবিতাগুলি লোকজ পুরাণের আশ্রয়ে নির্মিত এবং একই সাথে শিল্পগুণ সমন্বিত। ১৮৯৯ সালের ২৪ মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালে তাঁর পূর্বপুরুষরা আদি নিবাস বাংলা ছেড়ে বাংলায় চলে আসেন। কবির পিতার নাম ছিল মৌলবি ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম ছিল জাহেদা খাতুন। ১৯০৮ সালে পিতৃবিয়োগ ঘটলে তাঁর

পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। গ্রামের নিম্ন-প্রাইমারি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বর্ধমানের মঙ্গলকোটের মাথারুণ হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, তখন এই স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থার জন্য তাঁকে স্কুল ছাড়তে হয় এবং তিনি কবিগানের দলে যোগ দেন। পরে আসানসোলের একটি রুটির দোকানে মাসিক এক টাকা বেতনে কাজ করেন। আবারও ওই কাজ ছেড়ে দিয়ে এক পুলিশ অফিসারের বাড়িতে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে কাজ করতে হয়। এই পুলিশ অফিসারের বদান্যতায় তিনি রাণী দরিরামপুর বিদ্যালয়ে স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন কিন্তু আবার ভালো রেজাল্ট করার পরও তাকে স্কুল ছাড়তে হয়। এরপর তিনি ১৯১৫ সালে রানিগঞ্জ শিয়ারশোল স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ওই স্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক পাশ করেন। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে এই স্কুলে পড়াকালীন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁদের এই বন্ধুত্ব আজন্ম বজায় ছিল। এরপর আবার কবিকে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হতে হয়, কার্যত পড়াশোনা ত্যাগ করে তিনি করাচিতে চলে যান এবং সেখানে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। এখানে তিনি লেখেন 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি', 'রিক্তের বেদন', 'বাঁধন হারা' প্রভৃতি। ১৯১৮ সালে মুজাফফর আহমেদের সঙ্গে 'সওগাত' পত্রিকাতে যোগ দেন এবং এই পত্রিকাতে তাঁর প্রথম রচনা 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনি' প্রকাশ পায় এবং প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে হলেও অভাব—অনটনের মধ্যেও তিনি এই সময় কবিতা লিখে চলেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশকাল অনুযায়ী নিচে দেওয়া হল-

অগ্নিবীনা (১৯২২), দোলন-চাঁপা (১৯২৩), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ভাঙারগান (১৯২৪), চিত্তনামা (১৯২৫), ছায়ানট (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), পূবের হাওয় া(১৯২৬), ঝিঙে ফুল (১৯২৬), সর্বহারা (১৯২৬), ফণি-মনসা (১৯২৭), সিন্ধু-হিন্দোল (১৯২৮), জিঞ্জীর (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয় শিখা (১৯৩০), নির্ঝর (১৯৩৯), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), মরু ভাস্কর (১৯৫১), শেখ সওগাত (১৯৫৯), ঝড় (১৯৬১)।

দীর্ঘ জীবনে লড়াই তাঁর ছিল বেশ কঠিন। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন এবং গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হওয়া তাঁর মূল্য লক্ষ্য ছিল। সে কারণে তিনি কলমকে বেছে নিয়েছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি মুজাফর আহমেদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করার কাজ শুরু করেন। ওই একই সময়ে মজ্জাফর আহমেদ ওরফে কাকাবাবুর সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'নবযুগ' পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করলেও তিনি কিন্তু রাজনীতিতে থেকে সরে দাঁড়াননি। ১৯২৩ সালে প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগবাণী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেল থেকে ফিরে আসার পর কবিতা ও রাজনীতি যুগপৎ চলতে থাকে এবং ১৯২৪ সালে তিনি প্রমিলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে বিবাহের পরবর্তী সময়ে বড়ো ছেলের অল্প বয়সে মৃত্যু কবিকে গভীর শোকে আচ্ছন্ন করেছিল যার প্রভাব এসেছিল কবিতা ও গানে। ১৯৪২ সালে কবি দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং সেই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাননি। ১৯৭৪ সালে মুজিবর রহমানের আবেদনে তিনি অধুনা

বাংলাদেশে যান এবং ঢাকাতে বসবাস করেন। বাংলাদেশের সরকার সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট সত্তর বছর বয়সে তিনি মারা যান। বাংলাদেশের সরকারে তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিকটস্থ মসজিদে তাঁর মরদেহ সমাধি করা হয়।

বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর এরকম জনপ্রিয়তা লাভ কোনো কবির ভাগ্যে জোটেনি। কবিতাকে তিনি প্রেমের বাণী রূপে প্রকাশ করেননি বরং এক দ্রোহকালের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন কবিতায় ছন্দের সৌকর্যে সত্যেন্দ্রনাথের পর তিনিই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কবিতার মধ্যে তিনি নগ্ন সমাজ-জীবনের ছবি, ব্যক্তিগত পরিসরে আর্থিক-অনটন, হতাশা, নৈরাশ্য ব্যাধি সবই সোজসুজি প্রকাশ করেছেন সেখানে কোনো প্রলেপ লাগাননি। তাঁর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য—

‘বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে বড় কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, সে সময়ে তাঁর প্রভাব বোধহয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয়-কেনই বা থাকবে না—কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন।’ (*কালের পুতুল*)

৮.৩ কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

বাংলা কাব্যজগতে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধুমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব। এই বিদ্রোহ ভাবনার প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা নিঃসন্দেহে ‘বিদ্রোহী’। কবিতাটি কবির সর্বাপেক্ষা ও সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’তে গ্রন্থভুক্ত। কবিতাটি ১৩২৮ কার্তিকের ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। প্রকাশের পরেই কবিতাটির জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে—সেই কারণে বেশ কিছু পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হয়েহিল। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ সাপ্তাহিক ‘বিজলী’তে প্রকাশ পায় এবং ওই সালে মাঘ মাসে সংখ্যায় প্রবাসীতে সংকলিত হয়েছিল। ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ‘সাধন’ পত্রিকায় এবং পরে ‘ধুমকেতু’ পত্রিকাতে পুনরায় প্রকাশ পায়। কবিতাটি সম্পর্কে মুজাফফর আহমেদ জানাচ্ছেন-

> ‘সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানি নে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনালমনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল।’ (*কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*)।

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে কবি নজরুল ইসলাম ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ হয় ১৯২২ সালের কার্তিক মাসে। কাব্যগ্রন্থে মোট বারোটি কবিতা ছিল। ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি পরবর্তীকালে ‘সঞ্চিতা’ কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যসমাজের প্রথম বার্ষিকী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে নজরুল স্বয়ং ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

৮.৪ কবিতার সারমর্ম

কবিতাটি 'আমি' বয়ানে গড়ে উঠেছে, কবিতাটিতে মোট ১৪৭ বার 'আমি' শব্দটি পর্যায়ক্রমে এসেছে, এবং নানান বিশেষণের মাধ্যমে কবিতার ভাব গম্ভীর রূপ দৃষ্ট হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি অবশ্যই কবির বিদ্রোহ চেতনা স্মারক বহন করে। পরাধীন ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের যে দুর্দশা তৈরি হয়েছিল কবি তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তবে প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি হৃদয়ে চিরতরুণ, চির-চপলতার সঙ্গে তিনি এনেছেন পুরাণের প্রসঙ্গ। প্রতিটি স্তবকে কবি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণের মাধ্যমে বিদ্রোহের ভাবটি স্পষ্ট করেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির শাব্দিক ও বাণীর শিল্পসম্মত রূপ বলা যেতে পারে। একই সঙ্গে কবিতার মধ্যে আত্ম-উদঘাটনের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন, সমকালীন সময়ে যুব সমাজকে উদ্বোলিত করার জন্য কবিতার সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

কবি বিশ্বাস করেন মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তাই কবিতায় বীরের শিরোপা পেয়েছে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলে তবেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। এখানে কবির কবিসত্তা বরাবরই দুর্বিনীত, দুর্দম, নৃশংস। একই সঙ্গে তিনি নিজেকে নটরাজ, সাইক্লোন রূপে চিহ্নিত করেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন সমাজের কুসংস্কারকে ছিন্ন করতে পারলে সমাজের মুক্তি ঘটবে তাই নটরাজের মত প্রলয় এই পৃথিবীতে সংগঠিত করতে হবে। তাঁর শির উন্নত, কোনোভাবেই মাথা নত করবেন না, নিজেকে কখনো টর্পেডোর সঙ্গে তুলনা করেছেন যা ঝড়ের মধ্যে সব তরীকে মাঝনদীতে ডুবিয়ে দেবে। কখনো মাইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন যা অল্প সময়ের বিস্ফোরণের মধ্যে সব কিছু শেষ করে দিতে পারে। আরেকটি কথা বলা যেতে এই ধ্বংস আর কিছু নয় নতুনকে গড়ে নেওয়ার জন্য এই ধ্বংস। তিনি যেন ধূর্জটি, অকাল বৈশাখীর প্রভঞ্জন। পরাধীন ভারতবর্ষে এই আহ্বান তিনি দিয়েছেন যার মধ্যে তিনি অন্তর-আত্মাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ভয় পেয়ে কেউ যদি সরে আসে এই আহ্বান থেকে সে সমাজে স্থান পায় না। আসলে কবি তাদের বীর বলে সম্বোধন করেছেন যারা এই জরাজীর্ণ সমাজকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলবে।

তৃতীয় স্তবকে এসে কবি বিপ্লবীকে ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু এখানে সংবৃত সংযমের প্রকাশ ঘটেছে, এখানে তাঁর বিদ্রোহ রয়েছে কিন্তু সঙ্গে রয়েছে জীবনের আনন্দে নেচে যাওয়া—যা ছায়ানট, হাম্বী, হিন্দোল রাগে তিনি গেয়ে যাবেন নব-আনন্দে। তিনি বন্দি থাকবেন না শোষকের কারাগারে, সংগ্রামী শক্তির প্রতীক হয়ে সারা পৃথিবীতে নতুন রূপে বিপ্লবের বাণী প্রচার করবেন। কবির যখন যা ইচ্ছে তাই করবেন, তাকে প্রতিরোধ করবার জন্য কেউ থাকবে না। সামনে সামান্যতম প্রতিরোধের প্রাচীর উঠলে তিনি পদদলিত করে চলে যাবেন সামনের দিকে। মৃত্যকে পদদলিত করে শত্রুকে আলিঙ্গন করেতে দ্বিধা বোধ করবেন না। তবে এখানে বলা প্রয়োজন যে, শত্রুপক্ষকে নিজের পথে তিনি আনতে চান। আসলে কবি অর্থনৈতিক দুর্দশা—যা ভারতবর্ষকে ভয়ানক সমস্যার সম্মুখীন করেছিল সেই সমস্যা সাধারণ মানুষের বাঁধভাঙা আন্দোলন যার দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পারতপক্ষে

বেশি সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করার প্রেরণা থেকে তিনি কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এতেও বীরের আশা মেটে না তাই নিজেকে কখন হোমশিখা, অগ্নি, পুরোহিতরূপে কল্পনা করতে ইচ্ছুক। তিনি যেন ইন্দ্রানীর সূত যার এক হাতে বাঁশের বাঁশরি অন্যহাতে রণতুর্য অর্থ্যাৎ একদিকে প্রেম-প্রীতি মাধ্যমে সবাইকে কাছে টানতে চাইছেন অন্যদিকে তিনি সংহার মূর্তি ধারণ করতে চান। একহাতে চাঁদ অন্যহাতে সূর্য, স্নিগ্ধ আর প্রকট ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ—যা ধ্বংস ও সৃষ্টির রূপরেখা তৈরি করেছে, তিনি কৃষ্ণকণ্ঠ, আবার ব্যোমকেশ। গঙ্গোত্রীর জলধারা বহনই তাঁর বৈশিষ্ট্য। কেননা তিনি না-মানার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। আমির বৃত্তে কবির এই বিন্যাস সম্ভবত আর কোনো কবির ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এত বিচিত্রভাবে 'আমি'কে দেখার সুযোগ পাঠক এই কবিতায় পর্যবেক্ষণ করতে পারে যা অন্য কোথাও নেই।

কবি ষষ্ঠ স্তবকে বলবেন তিনি ক্রোধী, দুর্বাসার ও বিশ্বামিত্রের শিষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করতে চান। তিনি বজ্র, ঈশাণ বিষাণের ওঙ্কার, ইস্রাফিলের মহা হূঙ্কার, ধর্মরাজের চক্র। এখানে তিনি বীর সন্ন্যাসী রূপে প্রকাশ করতে চান। তিনি বেদুঈন, চেঙ্গিস খানকে একমাত্র সমীহ করেন। আসলে কবি চান এদের মত দুর্বার জীবন যাপন করতে। এখানে বীরের নানান প্রাচুর্যপূর্ণ কথা পরিবেশন করেছেন, কিন্তু এর পরের দৃশ্যে পায় একজন বিপ্লবী অথচ রোমান্টিক হৃদয়ের কথা। তিনি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নের বহ্নি, ষোড়শীর হৃদয়ের প্রেমই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। কবি এই আহবানে নারীকে সংযুক্ত করেছেন, বিপ্লবে যা আধুনিকতার পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। তিনি কখন প্রিয়ার চকিত চোখের চাহনি, অভিমানী হৃদয়ের আবেদন, চপল মেয়ের ভালোবাসা অনুপ্রাণিত। এবারে তিনি চিরশিশু প্রসঙ্গ এনেছেন আসলে শিশুর মধ্যে তো থাকে ভুল করার মানসিকতা। তাঁর বর্ণিত বীর তো ভুল করবে আবার এই ভুলের মাধ্যমে প্রকৃত পথ অনুসরণ করে নতুন ইতিহাস করবে। বিদ্রোহীকে বিভিন্ন রূপে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। কখনো তিনি মৃণ্ময়ী, আবার চিন্ময়ী, এই অক্ষয়, অমর, জরা রূপে কল্পনার মাধ্যমে কবি বোঝাতে চাইছেন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালভেদী চির-বিপ্লবী রূপকে তিনি সামনে আনছেন, শুধুমাত্র বাইরের শক্তিকে পরাজিত করা নয় বরং অন্তরের মধ্যে যে গ্লানি হতাশা রয়েছে তাকেও চিরবিদায় জানানো বিপ্লবীর পরম কর্তব্য।

বিপ্লবী শেষতম স্তবকে এসে একই কথা স্মরণ করতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন চির দুর্দমের কথা, না-নত হওয়ার কথা। এখানে যে সকল প্রসঙ্গ এনেছেন, তা কবিতার সার্বিক শিল্পকলার প্রকাশ হয়েছে বলা যেতে পারে। বিদ্রোহী যে উৎপীড়ককে ধ্বংস করে নতুন জগত করতে পারেন তা তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন। নিজের কাজকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সে যেমন পরশুরামের কুঠার হতে রাজি, তেমনি ভগবানের বুকে পদচিহ্ন এঁকে দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব। সামগ্রিকভাবে কবিতার অন্তর্বয়ানে কবিতার যে চিত্রকল্পগুলি ব্যবহার করেছে তা ঈর্ষনীয় মনে হতে পারে, কেননা পড়ার সময় প্রাথমিক অনুমান এই হতে পারে যে অনেক প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু বাস্তব প্রসঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় কবির অন্তরাত্মা যে দোলায়িত হয়েছে এবং হৃদয়জাত উচ্ছসিত আবেগের প্রকাশ করতে গেলে এই সকল চিত্রকল্পগুলির প্রয়োগ আবশ্যক।

৮.৫ কবি নজরুল ও হুইটম্যান

নজরুল ইসলাম অনেক চিঠিপত্রে হুইটম্যানের প্রসঙ্গ এনেছেন সেই থেকে অনুমান করা যায় কবির নজরুল ইসলামের আমেরিকান কবির কাব্যাদর্শের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবে কবিতার দর্শনের জায়গা খেয়াল করলে বোঝা যায় বেশ কিছু মিল দুই কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুই কবি বিশ্বাস করতেন কবিতার কাজ বিশ্বকে জাগানো, কেবলমাত্র নিখাদ প্রেমের রোমান্টিকতার মাধ্যমে কবিতার নন্দন গড়ে উঠতে পারে না। কবিকে হতে হবে জনগণের কবি, কবিকে কখনো কখনো চারণ কবির মতো নিজের মতকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার করতে হবে। একথা কারোর বোধহয় অজানা নয় যে নজরুল ইসলাম একদা লোটো গান, যাত্রার গানের দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। দীর্ঘ জীবনের লড়াই করার ক্ষমতা দুই কবি পেয়েছিলেন তাদের সংগ্রামী জীবনবোধ থেকে। হুইটম্যান যখন বলেন Song of myself এ-

My foothold is not tenon'd and mortes;d in graniete.
I laugh at what you call dissolution
And I know the aplitude of time.

ঠিক এই ভাবনার অনুরণন কি 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে পাই না? এবার অথবা নজরুল যখন বলেন-

'আমি নৃত্য পাগল ছন্দ
আমি আপনার তালে নেচে যাই
আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

—ছত্রটি হুইটম্যানের উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থের—I am satisfied, I see dance, laugh–Sing. একই প্রতিফলন পাওয়া আরও বেশ কিছু লাইনে-

১। আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান— নজরুল

২। I pass death with the dying, and birth with the new washed babe— whitman.

'Song of myself'-গ্রন্থে কবি যখন স্বোচ্চারে ঘোষণা করেন—

'Vivas to those who have fail'd
And to those whose war vessel sank in the sea
And to those themselves who sank in the sea
And to all generals that lost engagements
And all overcomes heroes
And numbers unknown heroes equal to
The greatest heroes knows'

আমাদের কবি বলেন-'সেদিন নিশিথ বেলা

দুরন্ত পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা

প্রভাতে সে আর ফিরল না কুলে। সেই দুরন্ত লাগি

আঁখি মুছি আর রচি গান আজিও নিশীথে জাগি'।

ইংরেজ কবির সঙ্গে নজরুলের ভাবসান্নিধ্য বেশ লক্ষ করার মতো, মিলিয়ে পড়লে মনে হতে পারে যেন একটি কবিতা আরেকটির রূপান্তর মাত্র তবে নজরুল যে হুইটম্যান আদর্শে দীক্ষিত একথা নির্দ্বিদায় বলা যেতে পারে।

৮.৬ কবিতার পুরাণ অনুষঙ্গ

কবি নজরুল মানবতার পূজারি, কবি নিজের কবিতায় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে কাহিনি সংগ্রহ করে কবিতায় তুলে ধরেন। এই রকমভাবে পুরাণের আদিকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি নতুন নতুন ব্যাখ্যা দেন, যে কোনো দেশে এই সকল গ্রন্থসমূহ কাল কালে সাহিত্যের রসদ জুটিয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রচীন পুরাণ থেকে উপকরণকে নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন কবি। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

ক। 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ'—হিন্দুপুরাণ মতে সতীর সামনে পিতা দক্ষ শিবের নিন্দা করলে সতী মনের দুঃখে প্রাণ ত্যাগ করেন এরপর এই ঘটনায় শিব উন্মত্ত হয়ে ওঠেন এবং স্বর্গে তাণ্ডবনৃত্য করেন। কবি এই প্রসঙ্গ এনেছেন কেবল উদ্দীপিত করতে যাতে যৌবনশক্তিকে নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্য করে, যাতে করে সব কিছু ভেঙে নতুন করে সৃষ্টি করা যায়।

খ। 'আমি কৃষ্ণকণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির'—সমুদ্র মন্থন করে দেবতারা একই সঙ্গে অমৃত ও বিষ তুলে আনে। নিজেদের অমর করবার জন্য দেবতারা অমৃত পান করেন এবং বিষ পড়ে থাকে। এদিকে সারা পৃথিবীকে রক্ষার করার উদ্দেশে ব্রহ্মার নির্দেশে শিব বিষ পান করে নীলকণ্ঠ বা কৃষ্ণকণ্ঠ হয়েছিলেন, কবি বলতে চেয়েছেন বীরদের শুধুমাত্র অমৃত পান করলে হবে না একই সাথে গরলও পান করে পৃথিবীকে মুক্ত করতে হবে।

গ। 'আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার/নিক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার'—পরশুরাম হলেন বিষ্ণুর দশম অবতার, মাতার নাম রেণুকা ও পিতার নাম জমদগ্নি। ক্ষত্রিয়রাজা কার্তবীর্য জমদগ্নির অনুপস্থিতিতে আশ্রমে প্রবেশ করে বাছুর চুরি করে নিয়ে যায়, একথা শুনে পরশুরাম রেগে গিয়ে কার্তবীর্যকে হত্যা করে। এরপরে কার্তবীর্যের সন্তানরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জমদগ্নিকে হত্যা করে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবে সেজন্য তিনি একুশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে পঞ্চক প্রদেশে রক্তের হ্রদ তৈরি করেছিলেন। কবি বোঝাতে চাইছেন সুস্থ এবং স্বাভাবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যদি রক্ত নিতে হয় তাহলে পিছু হঠবার কোনো কারণ নেই।

ঘ। 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন'—ব্রহ্মা বরুণের জন্য যে যজ্ঞ করেছিলেন সেখান থেকে ভৃগু জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঘুমন্ত বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করে ভৃগু, ঘুম থেকে উঠে বিষ্ণু তাকে জিজ্ঞাসা করেন তার লেগেছে কিনা। আশ্চর্যভাবে রেগে না গিয়ে বিষ্ণুর এই উবাচ ভৃগুর মনে গেঁথে গিয়েছিল; সেই থেকে বিষ্ণুকে ভৃগু আরাধ্য দেবতা রূপে দেখে এসেছে। কবি বোঝাতে চাইছেন চাইলে নিজেদেরকে ভৃগুর মতো হতে হবে। যে-কোনো শক্তির সঙ্গে লড়তে হবে, সে শক্তি ভগবানের মত অমিত ক্ষমতার অধিকারী হলেও।

৮.৭ কবিতার মূলপাঠ

বিদ্রোহী

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি চির বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললটে রুদ্র-ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!
আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর!
আমি দুর্ব্বার,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার!
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি   দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃংখল!
আমি মানি নাকো কোনো আইন,
আমি   ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম,
ভাসমান মাইন!
আমি   ধূর্জ্জটী আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর!
আমি   বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর!

বল বীর—
চির উন্নত মম শির!
আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণী,
আমি   পথ-সম্মুখে যাহা পাই তাহা চূর্ণী।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি   হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি   চল-চঞ্চল , ঠুমকি ছমকি
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
ফিং দিয়া দিই তিন দোল!
আমি   চপলা-চপল হিন্দোল!

আমি   তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি   শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি   মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি   শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল   বীর—
আমি   চির-উন্নত শির!
আমি   চির-দুরন্ত-দুর্মদ,

আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি, অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম এক হাতে-বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণ-তূর্য্য!
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যাথা-ব্যারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির— উন্নত মম শির!
আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক।
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস,
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্ণিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু-ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ-প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসার-বিশ্বামিত্র-শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন কবির বিশ্ব!
আমি প্রাণ-খোলা-হাসি-উল্লাস,-আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত, -কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী!
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছাস, আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,

আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল-উর্মির হিন্দোল্-দোল্!-

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যাথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে-গতি ফের!
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যাথা সুনিবিড়,
চিত-চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!

আমি গোপনপ্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন-চুড়ির কন-কন।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীণে গান গাওয়া!
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি!-
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব বিজয় কেতন!
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া স্বর্গ-মর্ত্য করতলে,
তাজি বোরবাক্ আর উচ্চৈশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল!

আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথর-কলরোল-কল — কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ি চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা, সঞ্চরি ভূমি-কম্প!
ধরি বাসকির ফণা জাপটি,
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম-ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝঝুম্
মম বাঁশরী টানে পাশরি!
আমি শ্যামের হাতে বাঁশরী।
আমি রুষে উঠে যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি শ্রাবণ-প্লাবন বন্যা, কভু ধরণীরে করি বরণিয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা!
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফণি!
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি!
আমি মৃণ্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয়!
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির দুর্জ্জয়, জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,

আমি তাথিয়া তাহিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতালমর্ত্য!
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !!
আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরামের-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নবসৃষ্টির মহানন্দে।

মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বণিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হত শান্ত!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে-এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন !
আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর-
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

৮.৮ প্রশ্নাবলী

ক) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

ক। কবিতার মূল ভাব নিজের ভাষায় লিখুন।

খ। কবির ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিন।

গ। কবিতাটিতে পুরাণের প্রসঙ্গ কীভাবে কবি ব্যবহার করেছেন।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

ক। কবি নজরুলের সঙ্গে ইংরেজ কবি হুইটম্যানের কবিতার কয়েকটি সাদৃশ্য লিখুন।

খ। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

গ। 'মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ' বলতে কবি কী বলতে চান।

ঘ। 'পরশুরামের কুঠার' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৮.৯ সহায়ক গ্রন্থ

ক। *কালের পুতুল* : বুদ্ধদেব বসু

খ। *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* : মুজাফফর আহমেদ

গ। *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য* : রফিকুল ইসলাম

ঘ। *কবিতার কালান্তর* : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঙ। *নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা* : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

চ। *নজরুলের কবিতা সমগ্র* : কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

একক-৯ ❑ আবার আসিব ফিরে : জীবনানন্দ দাশ

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ জীবনানন্দ দাশের জন্ম ও কবিকৃতি

৯.৩ কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য প্রদান

৯.৪ 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার আলোচনা

৯.৫ কবিতাটি কী সনেটধর্মী?

৯.৬ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ইমপ্রেশনিস্ট প্রভাব

৯.৭ জীবনানন্দ ও ইয়েটস-এর কবিতার তুলনামূলক আলোচনা

৯.৮ কবিতার মূলপাঠ

৯.৯ প্রশ্নাবলী

৯.১০ সহায়ক গ্রন্থ

৯.১ উদ্দেশ্য

কবিতাটির মর্মবস্তু উপলব্ধি করলে বোঝা যাবে গ্রামের নিঃসর্গ প্রকৃতির কথা কবি বলতে চেয়েছেন। নগরায়নের সময়ে হয়তো এই গ্রাম অবলুপ্তপ্রায়, কিন্তু এই পল্লীপ্রকৃতির মধুর রূপ পাঠক ধরতে পারবে কবিতাটি পাঠের মধ্যে; একইসঙ্গে বোঝা যাবে প্রকৃতির বিবর্তনের রূপরেখা। কবিতায় কবি আধুনিক সনেটের রীতি কী হওয়া উচিত তার প্রমাণ রেখেছেন। পূর্ণচ্ছেদ, কমা প্রভৃতি কীভাবে সনেট রচনা করতে গেলে ব্যবহার করতে হয় তা সম্বন্ধে পাঠক অবহিত হবেন।

৯.২ জীবনানন্দ দাশের জন্ম ও কবিকৃতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রবিশ্বের বাসিন্দা হয়েও সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত কবির নাম জীবনানন্দ দাশ। কবিতার এক ভিন্ন বয়ান তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি, শব্দের যথার্থ প্রয়োগের পাশাপাশি কবিতার ক্ষেত্রে গড়ে নিয়েছিলেন নিজস্ব উপনিবেশ। সমালোচকদের ভ্রুকূটি তাঁকে আঘাত দিলেও ত্রস্ত করতে পারেনি। নিজের শব্দ সংযোজন, বাকপ্রতিমা সৃজনের প্রতি তাঁর ছিল অমিত ভরসা,

যা এসেছিল তাঁর ভিতর থেকে যেখানে তিনি একা ও অন্তর্মুখী। অনেকে হয়তো বলবেন যে কবির স্বাভাবই হল অন্তর্মূখী এবং বেদনার গাঢ় সমাচার পাঠকের সামনে হাজির করা কবির একমাত্র দায়। কিন্তু একটা কথা বোধহয় শিরোধার্য যে সেই হাজির করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র্য রীতি বজায় রাখা বেশ সুকঠিন আর জীবনান্দ দাশ এখানেই অনবদ্য। জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৮ই ফ্রেব্রুয়ারি অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বৈদ্য পরিবারের কৌলিক পদবি ছিল দাশগুপ্ত, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর পরিবারের সকলে 'দাশ' পদবি ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সত্যানন্দ দাশ। মাতার নাম কুসুমকুমারী দাশ, যিনি কবি ছিলেন, তাঁর কবিতার দুই স্মরণীয় পঙক্তি এরকম—

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'

স্বাভাবিকভাবেই কবির জীবনে মায়ের প্রভাব ছিল অসীম। কবির শৈশব এবং কৈশোর কেটেছিল বরিশালে। বরিশালের স্কুল-পর্ব শেষ হয়ে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে সাম্মানিক ইংরেজিতে ভর্তি হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর স্তর অতিক্রম করে কলকাতার সিটি কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর দিল্লির এক কলেজে পড়াতে যান পরে আবার ফিরে আসেন বরিশালে সেখানে ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, পরে দেশবিভাগের সময়ে কলকাতায় চলে আসেন সেখানে শেষ জীবন পর্যন্ত কাটান। এখানে তিনি হাওড়ার গার্লস কলেজে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালে এক আকস্মিক ট্রাম দুর্ঘটনায় মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর কাব্যের মধ্যে যুগবৎ প্রকৃতি ও নাগরিক ভাবনার মেলবন্ধন পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে যেহেতু প্রকৃতির নিবিড় ও শান্ত পরিবেশে কাটিয়েছেন তাই তাঁর কাব্যে এসেছে প্রকৃতির প্রভাব আর শেষ জীবনে এসেছে নাগরিক জীবনের ছাপ, তবে সেটা যে খুব স্পষ্ট বিভাজনরেখা তৈরি করেছিল এরকম দাবি করাটা হয়তো ঠিক হবে না। যাইহোক প্রকাশকাল অনুযায়ী তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলি হল-'ঝরা পালক, (১৩৩৪), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৩৪৩), 'রূপসী বাংলা' (রচনাকাল ১৩৩৪-৪৪), 'বনলতা সেন' (রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬) এবং 'মহাপৃথিবী' (রচনাকাল ১৩৩৫-৫০) , 'সাতটি তারার তিমির' (রচনাকাল ১৩৩৫-৫০), এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা (রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬)। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য জীবনের মধ্যবর্তিতায় সমকালীন যুগজীবনের ক্রমান্বয়ী ঘাত-প্রতিঘাতকে শনাক্ত করা যায়। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে কবি পর্যালোচনা করেছেন যুগজীবনের যন্ত্রণা, তবে তাঁর কাব্যগরিমার মূল স্তম্ভ ছিল প্রকৃতির বিবর্তনময় রূপ ব্যক্ত করা। কবিমনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে তিনি তাঁর প্রকৃতিবিশ্ব গড়ে তুলেছিলেন, যে প্রসঙ্গে কবি বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য—

প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়; তিনি জীবনানন্দ দাশ। (*কালের পুতুল*, প্রথম সংস্করণ, পৃ-৪৭)।

তবে তাঁর কাব্যকে শুধুমাত্র প্রকৃতির কবিতা বলে দেগে দিলে কবির কাব্য প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা হবে না। তিনি নিশ্চিতভাবে প্রেমের কবি, একইসঙ্গে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মিষ্টিকচেতনার অন্যতম কবি। প্রেম-সৌন্দর্য-প্রকৃতি কবির কাব্যে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে। তবে বাংলা কবিতায় তিনি যে 'নির্জন কবি' নন এটা তিনি প্রমাণ করেছেন। তাঁর কবিতাভুমিতে এসেছে ব্যাক্তির ক্ষোভ-হতাশা-ক্লিন্নতা, এসেছে ত্রস্ত নীলিমার প্রসঙ্গ এবং উত্তর জীবনে তাঁর কবিতায় এসেছে নাগরিক জীবনের কুৎসিত নগ্নতা—

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব-অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পড়ে লজ্জাবশত। (রাত্রি)

অথবা

সেখানে মাতাল সেনা নায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে
নারীকে জলের মতো। (সময়ের তীরে)

তবে সার্বিকভাবে বলা যায় রূপসী বাংলার মত কাব্যে বাংলার প্রকৃতির অবিস্মরণীয় জলছবি ফুটে উঠেছে—যা চিরকালীন বাংলা কবিতার সম্পদ।

৯.৩ কবিতা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য প্রদান

'রূপসী বাংলা' কাব্যটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষ দিকে লেখা হলেও তাঁর মৃত্যুর পরে তা প্রকাশিত হয়। কবির অনেক উপন্যাসের মতো পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করা যায় মৃত্যুর অব্যবহিত পরে। কবি-অনুজ অশোকানন্দ দাশের তত্ত্বাবধানে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পায়। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে সিগনেট প্রেস থেকে এটি প্রকাশ পায়। উৎসর্গ করা হয়েছে—আবহমান বাংলা, বাঙালি। প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। প্রকাশক দিলীপ কুমার গুপ্ত এই অপরিচ্ছন্ন, অসংলগ্ন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'রূপসী বাংলা'। কবিতার ভূমিকা লিখেছেন কবি ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ, যেখান থেকে কবিতার মর্মবস্তু বুঝে নেওয়া যেতে পারে—কবিতাগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল এই অপরিমার্জিত অবস্থায় পাণ্ডুলিপিকে সাজিয়ে গড়ে নিতে হয়েছিল কবিতাগুচ্ছটি। তবে প্রাথমিক পর্বে কোনো নামকরণ ছিল না এমনকি কবিতাগুলি ছিল অসংলগ্ন। তবে যে পাণ্ডুলিপিটি জমা দেওয়া হয়েছিল তার থেকে প্রকাশিত সংস্করণ বেশ আলাদা, অনেক পরে দেবেশ রায় যখন সম্পাদনা করেন তখন কাব্যগ্রন্থটি একটি সার্বিক বোধের বাহক হয়ে উঠেছিল। দেবেশ রায় ১৯৮৪ সালে সম্পাদনা করেন 'প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রূপসীবাংলা', এখনেই কবিতাগুলির নামকরণ করা হয়েছিল। যার সুত্র ধরে আলোচ্য কবিতার নাম হয়েছে—'আবার আসিব ফিরে'। যাইহোক কবিতাগুলিতে পল্লি-বাংলার চিত্র,বাংলার নদ-নদী, বাংলার পুরাকথা ও মিথ-বাস্তবতার

মিশেলে প্রকাশ পেয়েছে এ বাংলার ইতিকথা। দেশের ঐতিহ্য, সংস্কার কোনো কিছুকে তিনি অবহেলার চোখে দেখেননি। আধুনিকতার বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও উন্নাসিকতায় অস্বীকার করেননি বাংলার পল্লি-প্রতিমাকে। সৌন্দর্যের এক বিশ্বভুবন তৈরি করেছিলেন। তাঁর দেখার দৃষ্টির মধ্যে কোনো যান্ত্রিকতা নেই সবকিছুর মধ্যে রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা।

৯.৪ 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার আলোচনা

'আবার আসিব ফিরে' নামকরণের ভিতর লুকিয়ে রয়েছে কবিমনের অভিপ্রায়। কবি বঙ্গপ্রকৃতির ভিতর যে রহস্যময় দিক উদঘাটিত করতে চেয়েছেন তাতে তিনি সফল হয়েছেন। কবিমনের এক দীর্ঘ সময় জুড়ে ছিল বঙ্গপ্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ নেওয়ার সুযোগ, সেই সময় পর্বে নানা রূপ তিনি ধরেছেন এই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আপাত-অসংলগ্ন কবিতাগুলির মধ্যে। তবে একথা বলা যায় পূর্বসূরিরা যা কিছু প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা লিখেছিলেন তা থেকে ভিন্ন ধারা তিনি তৈরি করেছিলেন। ভিন্ন স্বাদের চিত্রপট তিনি এঁকেছেন। পূর্বতন বাংলা কবিতায় ছিল দেশমাতৃকার জয়ধ্বনি, সমকালীন ভাবজাগরণের সাময়িক প্রতিক্রিয়া কিন্তু জীবনানন্দ সে পথে না হেঁটে অত্যন্ত স্থিতাধীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন এবং শব্দমালার নির্মাণ করেছেন প্রকৃতির এই মহাকাব্য। তবে পাঠক কবিতাগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রকৃতির রূপরেখা খুঁজে পাবেন না, বঙ্গভূমির কোনো ভৌগোলিক সীমানাকে নির্দেশ করেননি কবি তার পরিবর্তে এনেছেন মিথ-পুরাণের চিত্রকল্প, যা বঙ্গভূমির ইতিহাসের সাথে যুক্ত। কাব্যের প্রতিটি কবিতার মধ্যে সাধর্ম্য রয়েছে। জীবনানন্দের অনুজ অশোকানন্দ এই গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে জানাচ্ছেন—'কবির কাছে 'এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী। গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ—প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পর নির্ভর'। (ভূমিকা,অশোকানন্দ দাশ)।

এই সত্যবয়ানের প্রেক্ষিতে বলা যায় কোনো কবিতা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত তাঁর কাব্য প্রকোষ্ঠে রয়ে যায়নি বরং বলা চলে প্রতিটা কবিতার মূলভাবনা একই চালে নির্মিত। কবিতাগুলি যেন এক অবিচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—পাঠক পাঠের মধ্যে এইসত্য উদ্ঘাটিত করবে। প্রকৃতির কথা শোনাতে কবি কোনো ঋণাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেননি বরং নৈর্ব্যক্তিক দিক দিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তবে কোনো এক কবিতাকে প্রতিনিধিস্থানে বসিয়ে সার্বিক পর্যালোচনা করলে অবশ্যই 'আবার আসিব ফিরে' কবিতার নাম সর্বাগ্রে স্মরণে আসবে। কবির ভাষায় যে 'আলুলায়িত প্রতিবেশ' তা বক্ষ্যমান কবিতাভূমিতে ধরা পড়েছে। কবিতার ১৪ চরণে পুরাণ—মিথ মিশিয়ে তিনি ধরতে চেয়েছেন গ্রাম বাংলার এক ইতিহাস। কবি ব্যক্ত করছেন জন্মভূমিতে মরণোত্তর প্রত্যাবর্তনের কাহিনি। উত্তমপুরুষে কবি বক্তা আর পাঠক শ্রোতা, সেখানে এসেছে তার চিরপ্রেমের কথা এই মাটির প্রতি। যদি মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম নিতে হয় তাহলে যেন তিনি এই বাংলায় ফিরে আসতে পারেন। সেই সুযোগে তিনি ফিরতে চান এই বাংলায়-ধানসিড়িটির তীরে। কবির এই তীব্র আত্মঘোষণার মধ্যে জানা গেল সেটা যদি শঙ্খচিল, বা শালিখের বেশে হয় তাহলে সত্যিই কোনো দুঃখ নেই। কবি প্রকৃতিকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যেখানে বাংলার পাখি হয়ে বেঁচে থাকতেও

আপত্তি নেই। কবিতার মধ্যে রয়েছে শঙ্খচিল শালিখের বা ভোরের কাক হয়ে কার্তিকের নবান্নে ঘ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকতে বাসনা। এখানে কবি বারংবার বলতে চেয়েছেন 'হয়তো মানুষ নয়' অর্থাৎ কবি যে মানুষরূপী জন্মান্তরে চিরসংশয়ী তা বলার অপেক্ষা থাকে না কিন্তু কেন? এখানে গ্রাম-বাংলার মিথকে কী কবি ব্যবহার করেছেন। 'নবান্নের দেশ' বলতে এই বঙ্গভূমির লোকজ উৎসব—যা ধান তুলে আনার পর চাষিরা পালন করে সেকথার প্রসঙ্গে এসেছে। কবিতার মধ্যে এইরকম নিখাদ বাঙালি লোকজ উৎসবকে কবি স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে প্রকৃতির প্রতি অকৃত্রিম মায়া পোষণ করেছেন। তিনি কল্পনায় ভেসে যেতে চেয়েছেন বাংলার মাঠ-ঘাট ধরে যেখানে কল্মিশাকের ঘ্রাণ তিনি নেবেন। এই বাংলায় যেমন অন্ধকারে শিমূলগাছে পেঁচা বসে থাকে তেমনি দীর্ঘ আকাশপথ অতিক্রম করে শান্তির বাসাতে আশ্রয় নিয়েছে সাদা বক—এইসব দৃশ্যাবলি তাঁকে মোহিত করে।

কবিতার প্রতিটি চরণে কবি জানান দিচ্ছেন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমির কথা। পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিটি কবিতার মধ্যে একধরনের আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের খতিয়ান দেখে নেওয়া যাক—

ক। 'তখন এ জলসিড়ি শুকায়নি, মজেনি আকাশ
বল্লাল সেনের ঘোড়া—ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হতো এই পথে-আরো আগে রাজপুত্র কতোই না রাশ
টেনে টেনে এই পথে—কি যেন খুঁজেছে, আহা, উদাস;' (কোথাও দেখিনি আহা)

খ। 'হায় পাখি, একদিন কালীদহে ছিলে নাকি—দহের বাতাসে
আষাঢ়ের দুপুরে কলরব করনি কি এই বাংলায়
আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়
চাঁদ সদাগর; তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে' (হায় পাখি, একদিন)

কাব্যভূমির এই চিত্রপটের সঙ্গে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই আমাদের পাঠ্য কবিতাটির বয়ানে। বরং কবিতার মূলসুরের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে এইসব চিত্রকল্পগুলি।

কবিতায় এসেছে প্রকৃতির স্নিগ্ধরূপের কথা, শিমূলগাছের কথা, কল্মীশাকের কথা, কবি আশ্রয় নিতে চাইছেন কোনো একসময়ে কুয়াসার মধ্যে এক কাঁঠাল গাছের তলায়। লক্ষীপেঁচার ডাক, শিশুর ধান ছড়ানোর দৃশ্যপটে কবি নিজেকে খুঁজে চলেছেন। এই কবিতার অন্তর্মুখে রয়েছে শ্যামলিমার প্রচ্ছদ তবে খুব দক্ষতার সঙ্গে কাব্যে যুক্ত করেছেন পুরাণ-প্রতিমাকে। কবির কৃতিত্ব এখানেই যে প্রচলিত শব্দবন্ধের ভিতর বাকপ্রতিমার সম্প্রসারণ ঘটেছে। কবি কল্পনায় বারবার ধরা পড়েছে নিশ্চেতনার শিল্প, যেখানে কবিভাবনা ভবিষ্যমুখী কোনো ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। স্বপ্নে বা কল্পনায় এই চিরসবুজ মনের পরশ বারবার এসেছে কাব্যগ্রন্থে, পাঠকও কোথাও অনুভবে সেই শিল্পিত কাব্যভূমির সাক্ষাত পায়। সামগ্রিকভাবে কবি কল্পনায় কোথাও রূঢ় চেতনা মূর্ত হয়নি এবং রূপসী বাংলার কাব্যকথায় কোথাও কবি একপেশে চিন্তা ভাবনার প্রতিসরণ হয়েছে বলে মনে হয় না, সচেতন পাঠক-হৃদয়ে সেই ছবির প্রকাশও ঘটেছে সুন্দর

রূপে।

কবিতাটিতে কবি-কথকের নির্বিশেষ উপস্থিতিতে চরণগুচ্ছে এসেছে প্রতীক উপমার ব্যাবহার; তবে বাঙালির যৌথ চেতনায় প্রকৃতির অমলিন রূপের কথা পাওয়া যায় তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কবিতায় প্রকৃতির অনুষঙ্গের কথা বারবার আসে। এই পর্বের প্রকৃতির বর্ণনা এসেছিল রূপসী বাংলাতে, আর আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে এক বিপুল স্মরণিকা। কবিতার লাইনে কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই, কমা আর ড্যাস চিহ্নের পুনর্ব্যবহার যার মাধ্যমে কবি যেন এক অবিচ্ছিন্ন কাল প্রবাহের সাক্ষ্য রাখতে চাইছেন। কবির এই ভাবনাকে আরো প্রকট করবার জন্য আনতে চাইছেন, সংস্কার, লোকাচার। কবিতাটির সঙ্গে যদি 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'—কবিতাটি পাঠ নেওয়া যায় তাহলে কবিমনের এক অবিচ্ছিন্ন ও পূর্ণতর সুরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দুটি কবিতা যেন একে অপরের পরিপূরক, যেখানে ইতিহাসের ক্রম যেন এসে হাজির হয়েছে বর্তমান সময়ে, আর বক্ষমান কবিতায় তিনি ভবিষ্যতের কথা শোনাচ্ছেন। সার্বিক কালের মাত্রার পদাঙ্কানুসরণ উত্তরকালের দায়। সেই ভাবনা বোধহয় কবিতা নির্মাণে নেপথ্যচারীর ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বিরাটত্ব তাঁকে টেনেছে—এই গ্রাম-মাঠ—পুকুর বিশিষ্ট বাংলা তাঁর কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তবে কোনো নির্দিষ্ট সময়গ্রন্থিতে তিনি আবদ্ধ থাকতে চান না। কিন্তু এই সময় কি সত্যিই কোনো চাতুরির বা ছলাকলার ছদ্মবেশ—তা নয়, বরং কাব্যের সুর নির্বিশেষ, নির্বিবাদী অনেকটা ওই ইংরেজ কবির মতো—

'Time present and time past
Are both perhaps in the future
And future contained in the past
If all time is eternally present
All time is unredeemable' (Four quarter)।

সময়ের এই নিরবিচ্ছিন্ন ধারাপাত রচনা করতে কবি আশ্রয় নেন কল্পনার, কল্পনার মূলাবলম্বন হয়ে ওঠে দেশ-কাল আসলে কবি কল্পনার মাধ্যমে স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতের এক যৌথ কাঠামো গড়ে তোলেন যা সর্বকালীন ভাবনার দোসর হয়ে ওঠে।

৯.৫ কবিতাটি কী সনেটধর্মী?

উনিশ শতকের এক বিশেষ পর্ব বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষা—নিরীক্ষার পর্ব; তবে সেই পরীক্ষার মধ্যে অবশ্যই বিদেশি ভাবনার ছাপ স্পষ্ট ছিল। বাঙালির এই ভাব বিস্ফোরণের পর্বে মধুসূদনের আবির্ভাব, যিনি বাংলা সাহিত্যের এক নতুন গতিমুখ ঠিক করে দিয়েছিলেন। পুরানো রীত-প্রকরণকে সরিয়ে নতুন আদল বাংলা কবিতার মুকুটে সংযোজন করেছিলেন। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলনের সঙ্গে কবিতায় সনেট—এর আবির্ভাব ঘটেছিল মধুসূদনে হাত ধরে। বাংলা কাব্য-পরিক্রমা এবং ছন্দ-পরিক্রমার সরণীতে এই ভাবনা নিঃসন্দেহে আলোকবর্তিকা। তবে পরে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের হাতে নতুন রূপে

দেখা দেয়। সনেটের বৈশিষ্ট্য হল—চতুর্দশ অক্ষর সমন্বিত চোদ্দ পঙক্তির কবিতা, প্রথম আটটি লাইনকে অষ্টক এবং পরের ছয়টি লাইনকে ষষ্টক বলা হয়, এখানে একটিমাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে।

তবে জীবনানন্দ দাশ সনেটের প্রয়োগ যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছিলেন "রূপসী বাংলা" কাব্যগ্রন্থে, সবমিলিয়ে মোট ষাটটি কবিতা যার মধ্যে একটিমাত্র অষ্টক এবং বাকিগুলি চতুর্দশপদী কবিতা। সনেটগুলি মূলত ইতালির ক্ল্যাসিকাল সনেটের আদলে তৈরি, এই এই সনেটের মূল লক্ষণ হল প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ অষ্টক ও ষষ্টকের ভাব, যা পর্যায়ক্রমে বিবৃত হবে। এখানে কবি আভিপ্রায়িক অর্থে অনেক শব্দ এনেছেন যার ফলে স্তবকের ক্ষেত্রে ক্রম মানা হয়নি, এমনকি কবিতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বোঝা যায় কোথাও কোনো পূর্ণচ্ছেদ নেই। যদিও সনেটের ক্ষেত্রে কবি কবিতাকে চতুষ্টকে ভেঙে দেখাননি, মূলত অষ্টক আর ষষ্টক—এই দুই পর্বে ভেঙেছেন—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায় ক
হয়তো মানুষ নয় ত্ত হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে খ
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে খ
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ক

অষ্টকে মূলত কখ,খক,কখ,খক এবং ষষ্টকে গঘ,ঘগ,ঘঘ এই বিন্যাসে গঠিত হয়, এখানে পেত্রার্কীয় সনেটের প্রভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত কবি নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ করেছেন। এখানে পর্ব বিভাজন হল- ৮ + ৮ + ৬ = ২২ মাত্রার লাইন।

কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে পল্লিবাংলার বিচিত্র চিত্র। একইসঙ্গে মৃত্যুর পরে কবি যে স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন যেখানে কবি ফিরে আসতে চেয়েছেন এই পল্লিবাংলায়। এই বাংলার অপরূপ শোভা তাকে মোহিত করেছে তাই পৃথিবীর কোনো রূপ তাঁকে টানতে পারেনি। এইরকম এক ভাবগম্ভীর ভাবনার অনুবর্তন রয়েছে কবিতাভূমিতে, অক্ষরবৃত্তের ধীর লয়ে কবিতা নির্মিত হয়েছে। সনেটের দীর্ঘায়িত চরণের ভাবনাবলয়ের প্রকাশ পেয়েছে। লোকাচার বা পুরাণের প্রসঙ্গ আনলেও বলা যায় সেখানে অমিত্রাক্ষরের ঝঙ্কৃত পদগুচ্ছ নেই। সংবৃত্ত ও অসংবৃত্ত—দুই অন্ত্যমিল রয়েছে কবিতায়।

৯.৬ জীবনানন্দ দাশের কবিতা ইমপ্রেশনিস্ট প্রভাব

ছবির ইতিহাস চর্চায় ইমপ্রেশনিস্ট আন্দোলন খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে সে দিকে নজর দিলে শিল্পী তুলির টানে এমন এক আলো-আঁধারি প্রতিবেশ তৈরি হয় যা দ্রষ্টার কাছে একটু অধরা থেকে যায়। তবে সময়ের নিরিখে ক্রমশ পাঠক বা দ্রষ্টার কাছে ধরা দেয়। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ফ্রান্সে এই আন্দোলন দানা বাঁধে, পরবর্তীকালে তা বিশ্বের আর্ট-সমালোচনার ইতিহাসে নতুন দিক উন্মোচিত করে। এই আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট হল নিম্নরূপ—

ক। ইমপ্রেশনিস্ট ছবি অনেক সময় কাছে থাকলে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু দূরে গেলে তা অনুভব করা যায়। দেখার সময় কিছু মনে না-হলেও পরবর্তী সময়ে হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। এক্ষেত্রে জীবনানন্দের

কবিতার ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই—যখন পাঠ নেওয়া হয় তখন যেহেতু সহজ ভাষায় কাব্য উপস্থাপন করেন তাই সাময়িক প্রতিক্রিয়া কম হলেও গভীর অনুভবেদ্য হয় পরবর্তীকালে।

খ। ইমপ্রেশনিস্টদের মতো তাঁর কাব্যে রয়েছে খোলা মাঠ, গগনচুম্বী আকাশ, প্রকৃতির রূপ, সন্ধ্যাবেলার আলো-আঁধারি পরিবেশ। 'আকাশ ছায়র ঢেউয়ে ঢেকে/সারা দিন-সারা রাত্রি অপেক্ষায় থেকে'—এইভাবে প্রকৃতির পটপরিবর্তনের নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে কবির লেখনিতে।

গ। অনেক স্বাভাবিক বা তুচ্ছ ও নগন্য জিনিস কবিতায় এসছে যা ইমপ্রেশনিস্টদের গুণ। জীবনানন্দের কবিতাকেও অনেক সাধারণ বিষয় সযত্নে প্রকাশ করেছেন—'জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ'-এই রকম সাধারণ বিষয়কে কবি অতুলনীয় ভাবে প্রকাশ করেছেন।

ঘ। আঙ্গিকের দিক থেকে ইমপ্রেশনিস্টরা ধ্রুপদি আঙ্গিক ভেঙেছেন। জীবনানন্দ দাশ ছন্দের দিক দিয়ে পূর্বজদের রীতি অনুসরণ করেননি, নিজের ভাবনার সংহত রূপ দিতে পয়ারের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যা ধীর লয়ে ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পারে। 'আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়' এই পর্যন্ত এসে কবির পূর্ণচ্ছেদ নেই, ব্যবহার করতে চাননি। কেননা নিজের ভাবনাগুলি যেন আরো অনেক সুদূরপ্রসারী করতে চান তিনি দ্বিতীয় বা তৃতীয় লাইনে এবং প্রতিটি চরণ বা লাইনের মাত্রা সংখ্যা ২২। ছক ভেঙে তিনি কবিতার যে নতুন সংরূপ তৈরি করলেন তা স্বতন্ত্র।

ঙ। এক অদ্ভুত মায়ার জগত তৈরি করতে চান, যেখানে অতীত ঘটনাক্রমের আগমন ঘটতে পারে। তবে তা ভিন্ন আঙ্গিকে, সে জগতে পাঠকের প্রবেশাধিকার অবাধ হয় না। কবি যখন 'হাজার বছর ধরে' পথ চলার কথা বলেন অথবা লাশকাটা ঘরে মানুষের কথা শোনান সেখানে পাঠক নির্বিশেষে উপলব্ধি করেন এক আলো-আঁধারি পরিবেশের কথা। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস ও মিথের সংমিশ্রণে তৈরি হয় কবিতার বয়ান— 'মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে'—এ ভাবেই ইতিহাস নব মূল্যায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়। অলঙ্কারের ক্ষেত্রে স্বভাবোক্তির প্রকাশ ঘটেছে, কবিপ্রসিদ্ধির স্বাভাবিক নিয়মকানুন অতিক্রম করে তিনি কল্পনার মাত্রায় প্রকাশ করেছেন ইমপ্রেশনিস্টদের মতো—

ক। 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়/পৃথিবী ভরে গেছে ভোরের বেলায়'

খ। 'আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল'

এখানে কোনো স্বাভাবিক ভাবনার প্রকাশ হয়নি—আলোকে নরম কচি লেবুপাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন অর্থাৎ তাঁর কাব্য-ভাবনায় এসেছে এক নতুন ভঙ্গি, যা সমকাল থেকে পৃথক বলা যেতে পারে।

৯.৭ জীবনানন্দ ও ইয়েটস -এর কবিতার তুলনামূলক আলোচনা

আমাদের দেশের কবিদের কাছে একপ্রকার অনিবার্য নিয়তি ছিল পশ্চিমিমুখী হওয়া। সাহিত্যের অঙ্গনে এই নজির খুব কম নেই যেখানে কবি বা কথাকার বিদেশিদের কাছে ঋণী, তবে এই ঋণের উপর ভিত্তি করে নিশ্চয় জনৈক কবির মূল্যায়ন করা মূর্খামি, বলা চলে পূর্বজ বা সমকালের কাছে ঋণগ্রস্থ হতেই হয় মহৎ কবিকে। জীবনানন্দের মতো একজন কবি যাকে রবীন্দ্রনাথের মতো এক বিগ্রহের সামনে

নিজেকে দাঁড় করাতে হয়েছিল সেখানে বিদেশি কোনো লেখক বা কবির কাছে ঋণ থাকাটা ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। এক্ষেত্রে সমালোচকগণ বলার চেষ্টা করেন জীবনানন্দ ও ইয়েটস সমোচ্চারিত সাধর্মের কথা। কবিতার বেশ কিছু পঙক্তি ভাবনা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এই অনুপম সাদৃশ্যলেখের কথা—'হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে/তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে-উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে' এই পঙক্তি সাদৃশ্য পাওয়া যাবে-'Because Your crying bring to my mind/passion-dimmed eyes..' অথবা 'আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না' এ যেন রূপান্তর, যা তিনি পেয়েছেন বিদেশি কবির কাছে-'Where time would surely forget us–and sorrow come near us no more'.কবিদ্বয়ের সাদৃশ্যের হেতু লুকিয়ে রয়েছে যুগমানসের অন্ধকারময় সময়গ্রন্থিতে। কোনো কবির পক্ষে সমকালকে নস্যাৎ করা অসম্ভব, সময়পর্বের ছাপ এসেছে দুই কবিরই ভাবনায় ও আঙ্গিকে।

মাতৃভাবনার মধ্যেও দুই কবির মিলের কথা আসে—জীবনানন্দের আত্মঘোষণা 'বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ/খুঁজিতে চাই না আর'। নিজের জন্মভূমির প্রতি এই রকম ভালোবাসার কথা জানান ইয়েটস-'I am of Ireland/and the holy land of Ireland'-কবিতায়। নিজের মাতৃভূমির কথা দুই কবির এসেছে। এই রকমভাবে মিলের কথা অনেক আসতে পারে কিন্তু ইয়েটস ও জীবনান্দের মাতৃভাবনা এসেছে দুই ভিন্ন কল্পবিশ্ব থেকে। আইরিশ কবির ক্ষেত্রে ছিল ইংল্যন্ডের শাসককূলের কাছ থেকে দেশের মুক্তি, অন্যজনের ছিল নিখাদ ভালোবাসা, সেখানে কোনো রাজনৈতিক দর্শনের প্রচ্ছায়া ছিল না। তবে দুজনের ক্ষেত্রেই বলা চলে প্রাচীন লোককথা, সংস্কারকে তাঁরা কবিতায় প্রকাশ করেছেন নান্দনিক ভাবে। ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন দুই কবি। তবে ইয়েটস যেহেতু জাতি পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে স্বভূমির প্রতি মাহাত্ম্যকীর্তন করেছেন তাই তিনি মনে করেছেন যদি কোনো ভুলের তথ্য পরিবেশন করে লোকশিল্পী নিজের শিল্পভূমি তৈরি করেন তাতে কোনো ভ্রান্তি নেই। কবির ভাষায়—'know–that I would accounted be/True brother of that company,/who sang to sweeten Ireland's wrong,/Ballad and story–ran and son/'. নিজের জাত্যাভিমান প্রকাশ করার দায় ছিল ইয়েটসের,জীবনানন্দের সে দায় ছিল না।

৯.৮ কবিতার মূলপাঠ

আবার আসিব ফিরে

আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এই কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হবো—কিশোরীর-ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,

সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায়;

হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে;
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে;
রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায়;—রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে—

৯.৯ প্রশ্নাবলী

ক) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতির প্রসঙ্গ রয়েছে পর্যালোচনা করুন।

২। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'- কবিতার সারমর্ম বিচার করুন।

৩। কবিতায় পয়ার কীভাবে এসেছে- আলোচনা করুন।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। বাংলায় কেন কবি ফিরতে চাইছেন?

২। কি কি রূপে কবি এই বাংলায় ফিরতে চাইছেন?

৩। 'নবান্নের দেশ' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

৪। কবি কল্পনায় শিশুটি কী করবে?

৯.১০ সহায়ক গ্রন্থ

১। *আধুনিক কবিতার দিকবলয়*—অশ্রুকুমার সিকদার।

২। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*—দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৩। *বাংলা কবিতার কালান্তর*—সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। *আলেখ্য : জীবনানন্দ*—ভূমেন্দ্র গুহ।

৫। *প্রসঙ্গ : জীবনানন্দ* শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যয়।

৬। *আমার কালের কয়েকজন কবি*—জগদীশ ভট্টাচার্য।

৭। *প্রবন্ধ সংগ্রহ (৪)*—বুদ্ধদেব বসু।

৮। Yeats's Poetry–Drama–and Prose_James Pethica (ed)।

৯। *জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা*—ভারবি।

একক-১০ ❑ ফুল ফুটুক না ফুটুক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ কবির বংশ পরিচয় ও কাব্য রচনার পেক্ষাপট

১০.৩ কবিতার বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

১০.৪ কবিতাটির আটটি স্তবক

১০.৫ মূল কবিতা

১০.৬ প্রশ্নপত্র

১০.৭ সহায়ক গ্রন্থ

১০.১ উদ্দেশ্য

কবিতার পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা আবশ্যক, সেক্ষেত্রে ভিন্ন স্বাদের কবিতা পাঠক হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলে চিন্তার জগতে নতুন কবিভাষ্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়, কবিতা-ধারার বদল ঘটে, সাহিত্যে নতুন স্বাদের কথা অনুরণিত হয়। বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ যাত্রাপথের ইতিহাসে রোমান্টিক কাব্য, গাথা কাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতি কাব্যের সমাহার দেখা গিয়েছে কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে এসে রাজনৈতিক ভাষ্যকে কাব্যে রূপান্তরের যে প্রয়াস তা কাব্যের ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করতে পেরেছিল। কাব্যের ইতিকথায় একজন পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে কীভাবে কবি তাঁর পূর্বতর কবিদের থেকে পৃথক পথ অনুসরণ করেছেন। আলোচ্য কবিতায় যে কাব্যপ্রতিমা এসেছে সেখানে রোমান্টিক ভাবনা ও বস্তুবাদী ভাবনার পরিমিত মেলবন্ধন ঘটেছে এবং তা কবিতার পরিসরে ব্যক্ত হয়েছে। কবিতা যে শুধু প্রেমগাথা নয়, বাস্তবের নিগূঢ় কাঠিন্য ও কবির ভাষায় অমৃতলোকে স্থান পেতে পারে তা কবিতাভুবনের মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। কবিতায় রয়েছে ভিন্নগোত্রের বিদ্রুপ, যার মধ্যে মৃতপ্রায় সমাজের চেহারা পাঠক চিনতে পারবে। কবি ও কবিতার দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে।

১০.২ কবির বংশ পরিচয় ও কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৯ সালের মাঘী সংক্রান্তিতে কৃষ্ণনগরে, পিতৃনিবাস শান্তিপুর। পিতার নাম ক্ষিতিশ মুখোপাধ্যায়, মাতা যামিনীবালা। কলকাতার মিত্র ইনস্টিট্যুশন থেকে প্রথম

বিভাগে প্রবেশিকা পাশ করেন, পরে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন, আর এই সময় থেকে সক্রিয় ছাত্র আন্দোলনের জড়িয়ে পড়েন। দর্শনে বি,এ অনার্স পাশ করেন স্কটিশচার্জ কলেজ থেকে। তিনি রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হন ১৯৪৩ সালে। যার ফলে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নি। ১৯৪৩ সালে তৈরি হল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ। এই সংগঠনের সম্পাদকও হয়েছিলেন তিনি, পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। চল্লিশের দশকে 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের মধ্যদিয়ে তাঁর আবির্ভাব। সেই সময়ে তাঁর কাব্য নিয়ে নানা মহলে বেশ চর্চা হয়েছিল। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর সরেস মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

'এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেচি, যখন বাঙালি কবির হাতেও কবিতা আর শুধু বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে'।

'পদাতিক' নিশ্চিতভাবে বাংলা সাহিত্যের নতুন ধারার জন্ম দিয়েছিল। তবে সেই ধারা অব্যাহত ছিল পরবর্তী কাব্য সমূহের মধ্যে। তাঁর কাব্যগুলি সময়ের নিরিখে ক্রমান্বয়ে রাখা হল—পদাতিক (১৯৪০), চিরকুট (১৯৪৬), অগ্নিকোণ (১৯৪৮), ফুল ফুটুক (১৯৫৮), যত দূরে যাই (১৯৬২), কাল মধুমাস (১৯৬৬), এই ভাই (১৯৭১), ছেলে গেছে বনে (১৯৭২), একটু পা চালিয়ে ভাই (১৯৭৯), জল সইতে (১৯৮১), চইচই-চইচই (১৯৮৩), বাঘ ডেকেছিল (১৯৮৫), যারে কাগজের নৌকা (১৯৮৯), ধর্মের কল (১৯৯১)।

কবি কৈশোরের শুরুতে যে রাজনৈতিক ভাবনায় দীক্ষিত ছিলেন সেই ভাবনার আশ্রয়ে কাব্যভাবনার প্রকাশ করেছিলেন। জীবনের নানা সময়ে অনেক বাঁক এসেছে ঠিকই কিন্তু কখনই নিজের মতাদর্শগত বিশ্বাসকে তিনি বিসর্জন দেননি। রাজনৈতিক ভাবনার দ্বারা যেহেতু কবিতার মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তাই রসিক মহলে প্রশ্ন ওঠা অবাঞ্ছিত নয় যে কবিতা কি সত্যিই রাজনৈতিক ভাবাদর্শে পুষ্টিলাভ করতে পারে? প্রত্যুত্তরে বলা চলে ধর্ম বা রাজার কাহিনি নিয়ে যদি কবিতা লেখা যায় তাহলে রাজনৈতিক ভাবনায় কবিতা লেখা অস্বাভাবিক নয়, তবে এক্ষেত্রে কবিকে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক হতে হয়, কবিতা কখনো যেন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র না-হয়ে ওঠে, লেখক খুব সন্তর্পণে এই প্রয়াস চালিয়ে যান তাঁর কাব্য ভাবনার মধ্যে। যে ভাবধারার কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার মাধ্যমে পাঠকের সামনে এনেছেন তা হল মার্ক্সীয় ধারা, যার মাধ্যমে কবির স্বপ্নিল চোখ কবিতার মধ্যে নতুন লাল টুকটুকে সকালের প্রত্যাশী। একইসঙ্গে প্রেমের কালজয়ী ভাবনাকে স্থান দিয়েছে এই দর্শনের মাধ্যমে যা বাংলা সাহিত্যের নতুন ভাবসঞ্চারী বলা চলে। তবে এইরকম কবিতার মধ্যে একধরণের নিয়মানুবর্তিতা কাজ করে কিন্তু কবির অলঙ্কার ভাবনা ও ভাষার মায়ামন্ত্রের স্থিতাবস্থাকে অতিক্রম করে কবিতার প্রসিদ্ধি ঘটালেন।

প্রকৃতার্থে বাংলা কবিতায় এক স্বাধীন সুর শোনা গেল যা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। দর্পিত অথচ শিশুসুলভ নৈরাজ্য নেই, পরিণতমনস্কের যে চিত্র তিনি কাব্যভুবনে এনেছেন তা পরিণতির সুচকমাত্র। আশ্চর্যের হলেও সত্য তিনি প্রেমকে কাব্যমূল্য রূপে স্বীকার করতে চাননি, পরিবর্তে এনেছেন সমাজের

ক্লিন্নতার কথা। তাই সদর্পে ঘোষণা করেছেন—'প্রিয় ফুল খেলিবার দিন নয় অদ্য'। অনেকটা রুশ কবি মায়াকোভস্কির কথা স্মরণ করা যেতে পারে—'Now's no time for a lover and his lass'। কবিতা এই বিশেষ পর্বে কালগত অবক্ষয়কে তুলে ধরার পাশে বাচ্য-ব্যাঙ্গের যৌথতায় নতুন বিশ্ব রচনায় মগ্ন। কবি সচেতন ভাবে এক বৈপ্লবিক পথ আবিষ্কার করতে চান তা অতীতচারী কোনো আবেশ—আবিলতার চিন্তাসূত্রে আসে না, সেখানে তিনি ভবিষ্যতের কথা বলতে চান। কিন্তু এই কথা বলতে তিনি কখনো আশ্রয় নিয়েছেন ঘন বাক্যাংশবদ্ধ বাক্যের ('আদালত সচ্চরিত্র'), প্রবাদের ব্যবহারে ('বাহান্ন হাতির শুড়ে হাঁচিগ্রস্ত শকট'), আস্ত বাংলা ইডিয়াম চরণের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ('স্বখাত সলিলে কথিত যখন ধ্রুবনিধন')।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাঁর কাব্যজগতে আবির্ভাব 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে। চোখে সমাজবিপ্লবের স্বপ্ন থাকলেও প্রকাশে রয়ে গেছে সংযম, দলভুক্ত হয়েও তিনি দলের প্রতি কোথাও অনুযোগ পোষণ করেছেন। কবিতার শিল্পভাবনার রসদ যে ক্রমশ বদল হচ্ছে সে কথা উচ্চারিত হয়েছে কবিতা বলয়ে, তবে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো ক্লান্তিবোধ নেই, সেখানে যৌথতার সুর বারবার ধ্বনিত হয়েছে। তবে সেই যৌথ প্রয়াসে কোনো নৈরাশ্য নেই, বরং একধরণের রোমান্টিকতা রয়ে গেছে—

'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি,
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে।
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি।
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে।'

মাত্রাবৃত্তের মধ্যে শুনিয়েছেন কবির সংকল্পের কথা, তিনি যে 'লাল টুকটুকে' দিনের কথা বলতেন তা একক কোনো প্রয়াস নয়, সমবেত কর্ম ছাড়া তা আসবে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে উপেক্ষা করে তিনি কব্যভাবনার খোল-নলচে বদল ঘটাতে উৎসাহী। সেক্ষেত্রে রোমান্টিকতা কোনো প্রেম গাথা নয়, বরং এক বৃহৎ পরিক্রমা, সারাজীবন ধরে কবি তা পালন করেছেন।

১০.৩ কবিতার বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে প্রত্যাশা প্রাপ্তির অসম সমীকরণে বারবার ধ্বস্ত হয়েছে বঙ্গদেশ। কবিতাটি 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। তা এই কাব্যের কবিতাগুলি ১৯৫১-৫৭ সালের মধ্যে রচিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মূলত চল্লিশের দশকের কবি। এই দশকে বাংলা কবিতায় রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে, কবিতার প্রকাশ কোনো জটিল বাকপ্রতিমা নির্মাণের মাধ্যমে তিনি করেননি, লোকজ শব্দের গাঁথুনিতে তৈরি করেছেন কাব্যবলয়। তবে শব্দের কূহক মায়ায় পাঠককে আকৃষ্ট কররার অপরিমিত গুণ তাঁর ছিল। শব্দের

এই মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষকে উদ্ধৃত করে বলা যায়—'নতুন শব্দের সৃষ্টি নয়, শব্দের নতুন সৃষ্টিই কবির অভিপ্রায়'। এক্ষেত্রে বলা যায় সময়ের কাছে কবি দায়বদ্ধ, সময় কবিকে যে ভাষা জোগান দেয়, তাকেই তিনি শিল্পরূপ দেন। পুরানো বাংলা ভাষার প্রয়োগের দিন শেষ, শব্দের স্বাভাবিক ক্রমে রক্ষিত হয় বর্তমানের শিল্পপ্রতিমা। কবির দায়বদ্ধতা শব্দের কাছে, এখানে কবি তাই চেনা বা পরিচিত শব্দের মধ্যে প্রকাশ করেন কাব্য মাহাত্ম্য। কাব্যের মোট ছত্রিশটি কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলির মধ্যে তিনি প্রকাশ করেছেন বিপ্লবের গরিমা ও আগামী দিনের জয়গাথা। তবে প্রকাশভঙ্গিমাতে তিনি কোথাও জটিলতার আশ্রয় নেননি, তাঁর কাব্যভাবনার একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, ফলত ভাষাকে অনেক নীচু তালে বাঁধতে হয়েছে, কোথাও শব্দের বুননে এসেছে গল্পের ভঙ্গিমা—'তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ'। এখানে পাঠক যেন আরো অনেক গল্প শুনতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। কবিও এই সংরূপকে কবিতা ভুবনে সযত্নে স্থান দিয়েছেন।

প্রকাশ ও রচনার কালপঞ্জির বিচারে সংশ্লিষ্ট কাব্য কবিজীবনের চতুর্থ কাব্য। ইতিপূর্বে তিনি পূর্বের কাব্যত্রয়ীর উপাখ্যানে এনেছেন দীপ্ত সমাজ বদলের ছবি, এক সংশয়হীন চিন্তন বিশ্ব কিন্তু এই কাব্যে এসেছে আত্মজিজ্ঞাসা, সংশয়পূর্ণ ভাবনা যা কব্যের জগতকে ঋদ্ধ করেছে। 'ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত'—এই কয়েকটি শব্দ যেন বাংলা কাব্যের প্রবাদের মতন, ইতিপূর্বে ফুলের প্রসঙ্গ এসেছে অন্য কবিতায় যেখানে বিপ্লবের পথে আহবান করছেন—'প্রিয় ফুল খেলিবার দিন নয় অদ্য'- যা কাব্যের অন্দর-মহলের পরিবর্তন সূচিত করে তবে এখানে কবি কল্পনায় ব্যর্থ হলেও প্রত্যয়বাণী রূপে এই ফুলের প্রসঙ্গ এনেছেন। কবিতার প্রাথমিক বয়ানে অনেকটা গল্পের ছলে কবি বলতে চেয়েছেন তাঁর কাব্য ভাবনা। কবিতার প্রথম অংশে প্রকৃত প্রস্তাবে যে ইমেজ তিনি ব্যবহার করেছেন তা খুবই পরিচিত-একটি গাছ শান বাঁধানো রাস্তায় থেকে নিজের বাঁচার রসদ নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, প্রতিকূল পরিবেশ যতই আসুক মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। নগরজীবনের নানা ক্লিন্নতা উপেক্ষা করে সে বাঁচতে চায়, কিন্তু পরের লাইনে এসে পাঠক হতবাক হয়ে পড়ে—'কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে/হাসছে'-এখানে গাছ কেন হাসতে চায়? এ তো অট্টহাসি, নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় যা কিছু অসংগতি, নগরের চাকচিক্যকে যেন উপহাস করে। তবে কবির কোনো হতাশা নেই, বরং রয়েছে একবুক ভালোবাসা। অন্ধকার পথ অতিক্রম করে একদিন রক্তিম দিন আসবে, তারই প্রত্যাশা করে চলেছেন। পূর্বের যে দিনগুলি অন্ধকার পরিবৃত, মৃত লাশে পরিকীর্ণ ছিল সেই রক্তমাখা দিনগুলি যেন ফিরে না আসে। স্বপ্নসন্ধানী কবি প্রতি মুহূর্তে গেঁথে চলেছেন আগামীর 'গায়ে হলুদ মাখা বিকেল'; হলুদের সঙ্গে যে পেলব বিকেলের প্রসঙ্গ এসেছে। এক হরবোলা ছেলে যে কেবল হয়তো পয়সার জন্য বিকেলে কোকিলের ডাক শোনাতে আসত কিন্তু সেখানে ও কবি খুঁজে পেয়েছেন অকালবসন্তের ছবি, সে হয়তো আর আসে না কিন্তু সেই সুরেলা সুর কবিহৃদয়ে পর্যায়ক্রমে ফিরে আসে।

পরবর্তী সময়ে কবি এক আইবুড়ো কালোমেয়ের ছবি আঁকেন, যার ভাবনার মধ্যে কোনো আরোপন নেই, সে ও হরবোলার কোকিলের ডাক ভালোবেসেছে, তার আকশ-কুসুম স্বপ্নে আরো অনেক কিছু এসেছে। কিন্তু সামজিক অবস্থান বা প্রতিবেশ তাকে আইবুড়ো বদনাম ঘুচতে দেয়নি; এখানে কবি—'লাল

কালিতে ছাপা হলদে চিঠির' প্রসঙ্গ এনেছেন যা বিয়ের চিঠি। গায়ের রঙ কালো বলেই কি তার এই আইবুড়ো বদনাম ঘুচল না? কোলাজের পর কোলাজ সাজিয়ে এক জগত তৈরি করতে চাইছেন এবং সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন সামাজিক সমস্যাগুলি। মেয়েটির গায়ে তাই প্রজাপতি বসার সাথে সাথে বলে ওঠে—'আ মরণ'-আর এখানেই প্রকটিত হয় তার করুণ অবস্থা। এরপর আর সে রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। প্রজাপতির স্পর্শ বিবাহের ইঙ্গিতকে বেশি মাত্রায় প্রকট করে কিন্তু এই লোককথার পথ যেন মেয়েটির জন্য অপ্রযোজ্য। সে যেন সব কিছু শুভ আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। সেজন্য জনৈক মেয়েটির একটা কথা 'পোড়ামুখ লক্ষীছাড়া প্রজাপতি' পাঠকমনে অপ্রতিরোধ্য বেদনাবিধুর প্রতিবেশ সঞ্চার করে। কবি অযথা কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি, পরিমিত বাক্যে এবং সঞ্চারণশীল ইমেজের উপর ভর করে কবিতার ব্যাপ্তি দিয়েছেন। তবে এ প্রসঙ্গে অনুজ কবি শঙ্খ ঘোষ মন্তব্য করেছেন—

'প্রজাপতিটির কথা ভেবে দেখা যায়। 'আ মরণ' কথাটি স্বর লক্ষ করলে ধরতে পারি, পোড়ামুখ লক্ষীছাড়া প্রজাপতি কিন্তু 'পদাতিক'এর প্রজাপতি নয়। 'ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া/আমরা তো নয় নই প্রজাপতি সন্ধানী,/অন্তত আজ মাড়াই না তার ছায়া'/' এরকম নিষ্ঠুরভাবে কবি আর বলছেন না, একটু মায়া কোথাও লাগছে'।

শেষ স্তবকে এসে কাহিনিক্রম নতুন রূপে ধরা দিয়েছে, পূর্বের 'পাঁজর ফাটানো হাসি' এখানে হাত চেপে হাসিতে পরিণত হয়েছে। তবুও বলা যায় গাছটি বরং পাঠক বিশ্বের নতুন করে ভাবায় সত্যিই কি তার মনে মায়া আছে? নাকি আইবুড়ো কালো মেয়েটি তার কাছে পরিহাসে পাত্র হয়ে দাঁড়ায়, কেননা তার চাপা হাসির মধ্যে রয়েছে অসংবেদনশীল মনোবৃত্তি। মেয়েটির প্রতি প্রকাশ্য নিন্দাবাদ আর সম্ভব নয় কিন্তু তীব্র কটাক্ষ রয়ে গেছে। মেয়েটির কাছে স্বপ্ন বরাবরই অধরা, অপ্রাপণীয় থেকে গেছে। সহজ সরল বাচ্যে এবং ব্যঙ্গে কবি বিবৃতি দিয়েছেন, কোথাও শব্দের লুকোচুরি নেই। কবি সহজ ভাষ্যে উপস্থাপন করেছেন বিরাট ক্যানভাস, যা প্রতি মুহূর্তে পাঠককে ভাবায়, ভাবতে শেখায়।

১০.৪ কবিতার আটটি স্তবক

দু'লাইনের ছোট্ট স্তবক-'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক/আজ বসন্ত'। কবিতাটির সার্বিক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় এই লাইনে দুটি ধ্রুবপদ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কবিতার মধ্যে কবি মূলত ন্যারেটার বা কথক যেখানে একটার পর একটা ইমেজের সারিতে কবি এনেছেন অলংকারের ছোঁয়া, কবিতার ভাবনাকে কয়েকটি অনুষঙ্গে ভেঙে নিলে দাঁড়ায় এই রকম-

ক। বর্ণনামূলক অধিবাচন (narrative discourse) : কবি এখানে অনেকটা কথকের ভূমিকায় এখানে কোনো বিশ্লেষণ নেই, কথার পাশে কথা সাজিয়ে এগিয়ে যান। এখানে সেই অর্থে কোনো বিশেষ

গল্প নেই কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এসেছে শান বাঁধানো গাছ, আইবুড়ো কালো মেয়ে—যে ইমেজগুলি নিয়ে কবি কেবল সাজিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো নিজের প্রত্যয় ছেড়ে বেরিয়ে আসেননি, এবং কবি খুব সহজ ভাবে বলেছেন-'ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক/আজ বসন্ত'।

খ। সংজ্ঞাপনী অধিবাচন (communicative discourse) : এখানে কবি শুধুমাত্র আর কথক থাকেন না তিনি সমান্তরাল ভাবে পাঠকের বা দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এখানে কবির ভূমিকা অনেক বেশি বলে মনে হয়। তিনি নিজেই দ্রষ্টা আবার শব্দের মধ্য দিয়ে অনেক রীতিনীতি শেখাচ্ছেন পাঠককে। 'লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো/আকাশটাকে মাথায় নিয়ে/' এখানে কবি কোনো পূর্ণচ্ছেদ বা কমা আনছেন না আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে স্বীয় বক্তব্য পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

গ। ব্যাখ্যামূলক অধিবাচন (explanatory discourse) : কবি বিশেষ মুহূর্তে ব্যখ্যাকার বা টীকাকার হিসেবে কাজ করেন। তবে এইরকম এক ইমেজপূর্ণ কবিতার ক্ষেত্রে গীতিকবিতার ছক এখানে অনুপস্থিত। আকার—ইঙ্গিতে তিনি বলতে চান অনেক কিছু সে বিষয়ে তাঁকে অনেক বেশি শব্দকে মাটির কাছাকাছি আনতে হয়—'চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল/আ মরণ! পোড়ামুখ লক্ষীছাড়া প্রজাপতি!' শব্দগুলির লোকায়ত রূপ রয়েছে, যার মাধ্যমে কবিতা লোকত্তর হয়েছে।

তাঁর কবিতায় যেমন সহজ ইডিয়াম (সাতপাঁচ ভাবছিল, পোড়ারমুখ), তেমনি সহজ ব্যাঙ্গার্থবাচক শব্দ (তখনও হাসছে), ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তেমনি উপমার ক্ষেত্রে কবি খুব যত্নবান—'লাল কালিতে ছাপা হলদে চিঠির মতো আকাশটাকে মাথায় নিয়ে'। এখানে হলদে চিঠি প্রকৃত অর্থে দ্যোতনা বহন করে, লাল কালি একদিকে প্রেম এবং বিপ্লবের রঙ যা এখানে সমীকৃত হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রেম পরাগত হলেও তা ধূসর পাণ্ডুলিপিতে পরিণত হয়নি। স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে আবার প্রত্যাবর্তন ঘটবে যা আকাশের নীলিমার মতোন বৃহৎ রূপে প্রকটির হবে। কবিতাটিতে বৈপরীত্যের ছাপও ধরা পড়েছে যে গাছটি প্রথম দৃশ্যপটে পাঁজর ফাটিয়ে হেসে উঠেছিল সে দড়ি পাকাচ্ছে কেন? আবার পরবর্তী সময়ে 'তখনও হাসছে' শব্দে কি কোনো আশার বাণী শোনাচ্ছেন? দ্বিতীয় স্তবকে কবি পাঠককে যেহেতু আশার গান শুনিয়েছেন, অন্ধকারময় দিনগুলি আর কখনও ফিরে আসবেনা তারই রেশ শেষ স্তবকে এনে ভাববস্তু জোরালো করতে চেয়েছেন। একজন মার্ক্সবাদী কবি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসকে হারাননি তাই অকালে স্বপ্ন দেখতেও তিনি পিছুপা হননি—'ফুল ফুটুক আর না ফুটুক/আজ বসন্ত' এই বক্তব্যে তিনি অনড়।

কবিতাটির মধ্যে নাট্যবস্তুর ইশারা মেলে। কবিতার মধ্যে বেশ কয়েকটি চরিত্র রয়েছে, কবি যত্ন করে তাদের মুখে বসিয়েছেন সংলাপ, যে সংলাপ কবিতার ভাববস্তুকে উন্মোচিত করেছে। একটি গাছ যে পাঁজর ফাটিয়ে হাসছে, সেই গাছের বিবর্তন ঘটেছে কবিতার শেষ স্তবকে। অট্টহাসি পরিণত হয়েছে 'চাপা হাসি'তে। একজন হরবোলা যে অকালে কোকিলের আওয়াজ শোনাত পয়সার বিনিময়ে, সময়ের নিরিখে সেও হারিয়ে গেছে। যার কথা হয়তো বা ভেবে দিন গুনছেন সে আইবুড়ো কালো মেয়ে, যার মধ্যে রয়েছে হতাশা, ক্ষোভ যা তার সংলাপ অবয়বের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে প্রতিটি চরিত্র নিজস্ববৃত্তে

বেশ উজ্জ্বল এবং চরিত্রগুলি কখনো স্থবির বলে মনে হয় না, নাটকের মতো চরিত্রগুলি বিবৃতি দিয়েছে, নিজেরাও বিবর্তিত হয়েছে।

১০.৫ মূল কবিতা

ফুল ফুটুক না ফুটুক

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

শান-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।
আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপরে খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।

গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে

যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।
লাল কালিতে ছাপা হল্‌দে চিঠির মতো
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল—
ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ! পোড়ামুখ লক্ষীছাড়া প্রজাপতি!
তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ।
অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দড়ি পাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে।

১০.৬ প্রশ্নাবলী

ক) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

ক। কবিতাটির ভাববস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

খ। কবিতার শৈলী বিচার করুন।

গ। কবিতারটির মধ্য দিয়ে কবিপ্রতিভার পরিচয় দিন।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

ক। 'কচি কচি পাতা পাঁজর' ফাটিয়ে হাসছে কেন?

খ। 'হলুদ দেওয়া বিকেল'-বলতে কী বুঝিয়েছেন?

গ। 'আ মরণ! পোড়ামুখ লক্ষীছাড়া প্রজাপতি'-কে বলেছে? কেন বলেছে?

১০.৭ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। *আমার কালের কয়েকজন কবি*—জগদীশ ভট্টাচার্য।

২। *আধুনিক কবিতার দিগবলয়*—অশ্রুকুমার শিকদার।

৩। শঙ্খ ঘোষের গদ্য সংগ্রহ (৩)—শঙ্খ ঘোষ।

৪। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র (৪)—বুদ্ধদেব বসু।

একক-১১ ❑ যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ কবি-পরিচয়

১১.৩ কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

১১.৪ কবিতার মূল ভাবনা

১১.৫ মূলপাঠ,

১১.৬ শৈলীচিন্তা

১১.৭ প্রশ্নপত্র

১১.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১১.১ উদ্দেশ্য

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যে সকল কবি আপন শিল্প-নৈপুণ্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আলোচ্য কবিতার মধ্যে বার বার ফুটিয়ে তুলেছেন প্রেমের আকুতি। প্রেম যে ভাবে তাঁর কাব্যভূমিকে প্রস্তুত করেছেন-তা পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন কবি। কবিতাটি পাঠের গুরুত্ব এখানে, সৎ ও নির্ভীক ভাবে কবি প্রেমকে আলিঙ্গন করেছেন। কবির কাব্যভূমিতে এসেছে সুররিয়ালিজমের প্রভাব, যা পাঠকের জানা খুব দরকার। কবিতা যে অন্তরের অভিঘাতে সৃষ্ট শব্দ প্রতিমা, কবিতার মধ্যে সেই চিরন্তনী সত্য ফুটে উঠেছে কবির বয়ানে। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণআ এই কবিতাটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা পারেন।

১১.২ কবি-পরিচয়

বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বহড়ুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতার নাম বামানাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা হলেন কমলাদেবী। পিতৃবিয়োগের পরে খুব অল্প বয়সে তিনি বহড়ু ত্যাগ করেন এবং পরে কলকাতার বাগবাজারে মামার বাড়িতে চলে আসেন। সেখানে কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে ভর্তি হন। তবে তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলি জেলাতে, মুণ্ডেশ্বরী নদীর পাশে—কৃষ্ণনগর

গ্রামে, যে গ্রামটি রাধানগর অর্থাৎ রামমোহনের জন্মভিটার পাশের গ্রাম। ফি-বছর বন্যা ও কলেরার উপদ্রবে পরিবারের অনেক সদস্য মারা যান। বাড়িতে টোলের চর্চা ছিল, তবে বিবাহসূত্রে তাঁর পিতা বহড়ুতে চলে আসেন। তিনি আরো জানান কলেরা থেকে বাঁচতে বহড়ুতে চলে আসতে বাধ্য হন তাঁর পিতা। বহড়ুতেও টোলের চর্চা ছিল, দাদামশাইয়ের বাড়িতে তিনি পড়াশোনা শুরু করেন। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় কবি ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। স্কুল শিক্ষক হরিপদ কুশারীর প্রভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হন, কিছুদিন পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। যদিও সদস্যপদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একজন নিখাদ কবির পক্ষে রাজনীতির অলিন্দে আজীবন ঘোরা বেশ মুশকিল তবে তিনি রাজনৈতিক কোনো কবিতা লেখেননি বা নিজেকে কোনো মতাদর্শের ভাষ্যকার ভাবেননি। তবে রাজনীতির ক্ষুদ্রভাষ্য প্রচ্ছন্ন আকারে কবিতায় আসলেও তা কবিতায় মুখ্যবস্তু হিসেবে দানা বাঁধেনি। প্রথমে কমার্স নিয়ে সিটি কলেজে ভর্তি হলেও পরে তা ছেড়ে দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন, ছাত্র হিসেবে মেধাবী হলেও চাকরি করার মানসিকতা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। প্রথম থেকে জীবনে কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

'রূপচাঁদ পক্ষী' ছদ্মনামে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন, স্কুলজীবনে কবিতা লেখার হাতে খড়ি। 'নবোদয়' নামক এক হাতের লেখা পত্রিকাতে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন পরবর্তীকালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে সুনীল গাঙ্গুলি, দীপক মজুমদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই বন্ধুত্বের পরিণতি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী কবিতার সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মূলত কবিতার কাগজ কিন্তু কাব্যজগতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনে—১। সমসাময়িক যুগ যন্ত্রণাকে যথাযথ তুলে ধরতে চেয়েছিল—২। কৃত্তিবাসে কবিরা হাংরি কবিদের চেয়ে এক বিকল্প কাব্যভুবন তৈরি করতে চেয়েছেন—৩। আমেরিকান কবি গিনসবার্গ এর কলকাতা আগমনের প্রভাব পত্রিকাতে পড়েছিল। বিকল্প কবিভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে দুই রথী ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, যারা আজন্ম অকৃত্তিম বন্ধু হলেও দু'জনেই নতুন কাব্য ভাষা তৈরি করেছিলেন নিজেদের মতন করে। শক্তি স্বীকার করেছিলেন যে, পূর্বজদের ও সমসাময়িক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আনন্দ বাগচীর কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

১১.৩ কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

বঙ্গদেশে কবির ও কবিতার সংখ্যাধিক্য নিয়ে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকাতে একদা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যা নিয়ে অনুজপ্রতিম কবিদের অপ্রীতিভাজনেষু হয়ে পড়েছিলেন। সেই সংখ্যার বিচারকে মাথায় রেখে বলা যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সংখ্যা ছিল বিপুল কিন্তু নিঃসন্দেহে কবিতার

কাব্যমূল্য উচ্চকোটিতে বিরাজমান। কবিতা লেখা শুরু করেন হাতে লেখা এক ম্যাগাজিনের মাধ্যমে, পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা 'জরাসন্ধ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্র' পত্রিকায়। কবির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম দেওয়া হল—

ক। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' এটিই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ, ১৯৬১ সালে প্রকাশ পায়, মোট ৭২টি কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি।

খ। 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' মোট ৮৫ টি কবিতা নিয়ে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পায় ১৯৬৫ সালে বীক্ষণ প্রকাশ ভবন থেকে।

গ। 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে' ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত।

ঘ। 'পুরোনো সিঁড়ি'—১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়।

ঙ। 'সোনার মাছি খুন করেছি'—উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ, ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত, ভারবি থেকে, কবিতার সংখ্যা ছিল ২৭টি।

চ। 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান'—১৯৬৯ সালে অরুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত।

ছ। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' মূলত সনেটগুচ্ছ ১৯৭০ সালে প্রকাশ পায়, এটি তিনি উৎসর্গ করেন মধুসূদনকে।

জ। 'অস্ত্রের গৌরবহীন একা' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশ পায়, পুস্তক বিপণি থেকে। ওই বছর বিশ্ববাণী প্রকাশনা থেকে প্রকাশ পায় 'ঈশ্বর থাকেন জলে' (১৯৭৫), 'জ্বলন্ত রুমাল' (১৯৭৫) প্রকাশিত দেজ পাবলিকেশন হাউস থেকে।

ঝ। 'কুমারসম্ভব কাব্য' বিশ্ববানী প্রকাশনা থেকে প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে। এছাড়া ১৯৭৯ সালে প্রকাশ পায় লোরকার কবিতার অনুবাদ, এটি যুগ্মভাবে করেন অমিতাভ দাশগুপ্তের সঙ্গে, মুকুল গুহের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে প্রকাশ করেন 'জিব্রানের কবিতা'। ওই একই ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে করেছেন মায়াকোভস্কির কবিতার অনুবাদ, যা দেজ পাবলিকেশন থেকে ১৯৮১ সালে প্রকাশ পায়। অনূদিত কবিতাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায় কবির নিজস্ব স্বকীয়তা, যা শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ অতিক্রম করে ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের মূল ভাবনাকে উঁচু তারে বেঁধেছেন বলা চলে।

ঞ। 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো'—১৯৮২ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশ পায়। প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুনীল শীল। ১৯৮৩ সালে কবি কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান। কবিতার সংখ্যা ছিল ৫৩। বক্ষ্যমান কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো' কবিতাটি ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ পায়।

এর পরবর্তী সময়ে কবির আরো অনেক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়, ১৯৯৫ সালের ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারি থেকে তিন মাসের কাজ নিয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে শান্তিনিকেতনে যোগ দেন কিন্তু বেশি দিন পড়াতে

পারেননি ওই সময়ে ২৩শে মার্চ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এবং মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করা হয়।

১১.৪ কবিতার মূল ভাবনা

'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?'-কবিতা পাঠকের কাছে অনেকটা মিথের মর্যাদা পেয়েছে, কবির ভাবনায় পূর্বজদের মতোন বারবার প্রেম এলেও, তাঁর আত্মজিজ্ঞাসী মন কবিতার খোল নলচে বদলে দেওয়ার পক্ষপাতী, আলোচ্য কবিতাটি সেই গোত্রের কবিতা যেখানে কবির প্রেম—প্রীতি সব আছে কিন্তু নিজের অবস্থান নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন রাখতে চাওয়ার মধ্যে কবিতার নতুনত্ব লুকিয়ে রয়েছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার পাঠক এটুকু জানেন যে কবিতা-ছককে তিনি ভেঙেছেন, নতুন রূপ দিয়েছেন, তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন-'রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়/আমি স্বেচ্ছাচারী'—প্রিয় এই লাইনের 'স্বেচ্ছাচারিতা' শব্দটি শুধুমাত্র নিজের যাপন প্রণালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সম্প্রসারিত করেছেন নিজের কাব্য ভাবনার মধ্যে, কবিতা ভুবনে এনেছেন চিত্রকল্পের পরিমিত ব্যবহার, ছন্দের ক্ষেত্রে ভেঙেছেন অনেক রীতি -নীতি। আরেকটি কথা বলতে হয় এ কালে বসে আধুনিক সনেট অথবা এপিটাফ তাঁর হাতে সিদ্ধি লাভ করেছিল, তার কবিতাতে ছিল ছবির পর ছবি যা তিনি পরম যত্নে বেঁধেছে। বাংলা কবিতায় কবির পদার্পণ নিয়ে কবি শঙ্খ ঘোষ জানাচ্ছেন—

'কবিতা যাঁরা পড়েন, সপ্তম সংখ্যায় ওই নতুন লেখকের রচনাটি এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় ছিল না তাঁদের, সে রচনা যেন পাঠকের ওপর এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে'। (এই শহরের রাখাল)।

কবিতাটি নামের মধ্যে রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন, যদিও কাব্যগ্রন্থটি একই নামের হওয়ার সত্ত্বেও কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই যা পাঠক হৃদয়ে বেশ কিছু জিজ্ঞসা তৈরি করে। প্রথম লাইনে কবি বলেছে-'ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো' প্রথম থেকে কবিতার মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কটকে উপস্থাপন করতে চান। কবিতার এই বয়ানে বোঝা যায় কবি একটি এপিটাফ রচনা করেছেন যা আত্মজৈবনিক, ধ্বস্ত সময়ে তিনি পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনার জন্য মনস্থির করেছেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতি কি সত্যিই হাতের মধ্যে? নাকি দীর্ঘদীন ধরে বিপথগামী হয়ে রয়েছেত্তু তাই পরিস্থিতি চলে গিয়েছে হাতের বাইরে। কবির সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে বা বলা ভালো তিনি নিতে পারছেন না, সব সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়ে যায় আরোপন যা অন্তর্দাহনের সূতিকাগার, কিন্তু কবির জীবনের প্রতি অনুরাগ আছে, জীবনের সুখ-দুঃখ-হতাশা কোনো কিছুই তাঁর কাছে অপাঙতেয় নয়, কবি মৃত্যুর ডাক শুনলেও জীবনমুখী, আবার প্রশ্নাতুর কবি পরম স্নেহের সাথে উচ্চারণ করেছেন-'কখন তোমার করে, তোমাকে ভাবিনি'। আর এখানেই রয়ে গেছে ভাবনার গলদ-উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা না-করে, গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করলে জনৈক ব্যক্তির

সামূহিক পরিচয় জানা সম্ভব। তখন সামাজিক স্তরে কোনো সমস্যা আর থাকে না। কবি কী পাঠককে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন?

কবি কী নিজের হেরে যাওয়া বা না-পাওয়াকে ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর? যে শব্দ পাঠকের সামনে হাজির করতে চাইছেন তা কি অন্যকোনো ব্যক্তির? কবিতাটি মধ্যে যেহেতু এক সর্বজনমান্য আবেদন রয়েছে তাই বোঝা যায় এই চাপা বেদনার সর্ব্যাপ্তি রয়েছে কিন্তু পরিচিত এই ছককে তিনি রূপ দিয়েছে নানান চিত্রকল্পের মাধ্যমে। কখনো খাদের বরাবর দাঁড়ালে অর্থ্যাৎ মৃত্যুর হাতছানি ডাকলে চাঁদ তাঁকে জীবনের পথে নিয়ে আসে। ঠিক এরপরে জানান দেন কবি গঙ্গার তীরে দাঁড়ালে চিতা কাঠের আহবান, এখানেই কবি দুই বিপরীত ইমেজের মাধ্যমে জীবন—মৃত্যর দ্বন্দ্বকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

কবি সচেতন ভাবে এই চিত্রকল্পগুলি সংরচন করেছেন। কবি-হৃদয় ও দোলাচলে আচ্ছন্ন। যে কারণে চতুর্থ স্তবকে এসে কবি শুনিয়েছেন যে কোনো দিকে তিনি যেতে পারেন এই স্বাধীনতা তাঁর রয়েছে কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলেছেন-'কিন্তু, কেন যাবো?'-এ তো কবির আরেকটি মন, কবির মনে অস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্ব। শেষ পর্যন্ত তাঁর গন্তব্য যদিও অস্তির দিকে যে কারণে সন্তানের চুমো না—খাওয়া পর্যন্ত তিনি কোথাও তিনি যেতে চান না, তিনি সন্তানকে ভালো বাসতে চান। কবিতার মধ্যে রয়েছে জীবন ও মৃত্যুর প্রসঙ্গ যা কবিতার মূল ভাবনাকে পরিপুষ্টি জুগিয়েছে, হাতে গোনা শব্দ সংখ্যা নিয়ে কবিতাকে অনেক বেশি প্রতীকময় করে তুললে ও কোথাও কোনো স্থির চিত্র তৈরি করতে চাননি, সেলুলয়েডের মতো চিত্রগুলি ভাসমান যা পাঠক হৃদয়ে গম্ভীর ভাবনা প্রবেশ করায়। তবে কবি আজীবন যে জীবনকে ভালোবেসেছেন তা নির্দ্বিধায় বলা যায়, জীবনজুড়ে চড়াই-উৎরাই পথকে অতিক্রম করেছেন কিন্তু নৈরাশ্য তাঁকে টানেনি, রবীন্দ্রনাথের মতোন তিনি ও ভেবেছেন মৃত্যু জীবনের অঙ্গ হলেও তা সব নয়, 'শুধু বাঁচতে চাই' কবিতায় জানাচ্ছেন-'চাই, বাঁচতে চাই, বেঁচে থাকতে চাই/শুধু বাঁচা, অহরহ মৃত্যুর ওলোটপালটের/মধ্য বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই।'

শেষ স্তবকে কবির দীপ্ত আত্মঘোষণা, কবি চলে যাবেন তা নিশ্চিত কিন্তু এই 'অসময়ে' নয়। কবি কোন সময়কে অসময় বলতে চাইছেন, তাহলে কি আমাদের বুঝে নিতে হবে যে সময়পর্বের বাসিন্দা তা অস্থির, অনুপযোগী জীবন যাপনের জন্য যাকে কবি হয়তো ভরসা করেন না কিন্তু এই দুঃসময়কে কবি চান সুসময় করতে। তারপর যাবেন কিন্তু একাকী যেতে চান না,সমবেত ভাবে যেতে চান। কবিতার নান্দনিক বিচারে বলা যায় বিশ্বচরাচরে পরিবর্তনের কথা তিনি কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি তাই কবিতাটির মধ্য একধরনের প্রত্যয় রয়েছে।কিন্তু জনৈক ব্যক্তি কেমন? সত্যিই কি হিসেবি জগতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারবে নিজের অস্তিত্বকে। আসলে কবিতা পাঠের ভিতরে বোঝা যায় ব্যক্তিটি কবি ও সন্ন্যাসী। কবি হিসেবে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন অনেক কিছু করবার যে কারণে জীবনের বা প্রাণের স্পর্শে উদ্বেলিত হন আবার পরক্ষণেই এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে বাউণ্ডুলে হতে চান। কবির স্বভাব কি এই সত্য বহন করে না?

১১.৫ কবিতার মূলপাঠ

যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো

ভাবছি; ঘুরে দাঁড়ানোই ভালো।

এত কালো মেখেছি দু হাতে
এত কাল ধরে
কখনো তোমার ক'রে, তোমাকে ভাবিনি।

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

যেতে পারি
যে-কোন দিকেই আমি চলে যেতে পারি
কিন্তু, কেন যাবো?

সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো

যাবো
কিন্তু, এখনি যাবো না
তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো
একাকী যাবো না—অসময়ে।

১১.৬ কবিতার শৈলীচিন্তা

কবিতাটির নামকরণ হয়েছে পাঁচটি শব্দ দিয়ে। মধ্যবর্তী 'কিন্তু' সংযোজক অব্যয় পদ ব্যবহার করে কবি অনেক বেশি প্রশ্নাতুর হয়ে পড়েছেন। কবি এখানে শুরু করছেন 'ভাবছি' শব্দটি দিয়ে যা

বাক্যপ্রতিমার নিস্ক্রিয়তার ইঙ্গিত বহন করে। তারপর নানান চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবিতার মূল ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। শব্দ নির্বাচনে দ্বৈত ভাবনা এসেছে—'কালো' শব্দটি অনেক অসামাজিক বা অসংবেদনশীল কাজকে প্রতীকায়িত করতে চেয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে আহ্বানের ছবি স্পষ্ট তবে একদিকে জীবনের ডাক অন্যদিকে মৃত্যুর ডাক। খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে চাঁদ ডেকেছে—'আয় আয় আয়' অর্থাৎ তিনবার অন্যদিকে চিতা কাঠ ডেকেছে-'আয় আয়'। প্রথমটি জীবনের ডাক অন্যদিকে চিতার কাঠ যা মরণের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে, সেই চিতার কাঠ ডেকেছে দু'বার। এখানে ব্যাচার্থকে সরিয়ে যদি না ব্যাঙ্গার্থকে গ্রহণ করা যায় তাহলে কবিতা পাঠ নিরর্থক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বলা যায় কবি সচেতনভাবে বৈপরীত্যের ছবি এঁকেছেন। একদিকে হাতে কালো মাখার কথা, বা চিতার কাঠের আহ্বান রয়েছে ঠিক অন্যদিকে সন্তানের মুখে চুমু খাবার প্রসঙ্গ, চাঁদের আহ্বানের কথা রয়েছে, তবে এই সকল বৈপরীত্যময় ছবি থেকে কোথাও কবি এক বৈকল্পন বা subtitution এর নিদর্শন আনছেন। কবি চলে যবেন কিন্তু এই অসময়ে ঘূর্ণিপাকে যাবেন না এবং গেলেও একাকী যাবেন না সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কবিতায় মধ্যে 'আমি'র উত্তম পুরুষের মাধ্যমে সমস্ত কবিতাটি সাজিয়েছেন। কবি নিজেই হয়েছেন সর্বজ্ঞ কথক/পাঠক, এখানে কবি আকুতিকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। অক্ষরবৃত্তের ধারাবাহিক শ্লথ প্রবাহে তিনি জীবনের দুঃসহ বেদনাকে তুলে ধরেছেন। ছন্দ ভাবনায় শক্তি ছিলেন অনবদ্য প্রতিটি শব্দকে যত্ন করে নিজের মতন করে তৈরি করতেন, কবি যেহেতু বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন অসামাজিক বা অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাই এই ভাবনাকে আট মাত্রার পূর্ণ পর্বে ভাঙতে হয়েছে—

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে ৮+৬
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয় ৪+৬
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে ৮+৬
চিতা কাঠ ডাকেঃ আয় আয় ৮+২

ভাবনার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই ছন্দের বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। শুধুমাত্র ছন্দ নিয়ে প্রকাশ ভাবনা চিন্তা নয় প্রতীকের ব্যবহার যা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে, অলঙ্কার ও তিনি এনে সচেতন ভাবে—'চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়' বা "চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়" দু'টোই সমাসোক্তির নির্দশন। এছাড়া কবিতার মধ্যে একের পর এক চিত্রকল্পগুলিকে সজিয়েছেন ধীরে ধীরে-

এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়

চিত্রকল্পের মধ্যে রয়ে গেছে জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব রাত্রির প্রসঙ্গে এনেছেন জীবনের প্রতিস্পর্ধী রূপ হিসেবে। সমগ্র কবিতাতে একটি মাত্র বাক্য—'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো' পুনরক্তিময় হয়ে উঠেছে তবে কবিতায় ওটি ধ্রুবপদ। যাকে প্রমুখন বা foregrounding হিসেবে ধরা যেতে পারে, কবি যার মধ্যে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

১১.৭ প্রশ্নাবলী

ক) বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

ক। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?' কবিতার সারমর্ম লিখুন?

খ। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?' কবিতায় কী কবি মৃত্যু অভিমুখে যাত্রা করেছেন-কবিতাটির মূল্যায়ন করে ব্যাখ্যা করুন।

গ। কবিতাটি শৈলী বিচার করুন।

খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

ক। কবিতাটি কবির ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলির পরিচয় দিন।

খ। 'এত কালো মেখেছি দু হাতে'-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ। 'চিতাকাঠ ডাকেঃআয় আয়'—লাইনটিতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

১১.৮ সহায়ক গ্রন্থ

১। *বাংলা কবিতার কালান্তর*—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*—দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৩। *কালের রাখাল*—শঙ্খ ঘোষ।

৪। *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*—দেজ পাবলিশিং।

জেনেরিক ইলেকটিভ কোর্স : ০৪

মডিউল : ৩

নাটক : কালের যাত্রা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একক-১২ ❑ বাংলা নাটকের ধারায় রবীন্দ্রনাট্য

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

১২.২ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের তৎকালীন অবস্থা

১২.৩ রবীন্দ্রনাট্যের বিভিন্ন পর্যায়

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে শিক্ষার্থী রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বাংলা রঙ্গমঞ্চের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা করতে পারবেন। কীভাবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির নাট্য-সংস্কৃতির আবহে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ নাট্যরচনা, অভিনয় এবং নাট্য-আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করলেন সে-বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা পাবেন এই এককটিতে। এখানে রবীন্দ্রনাট্যের বিভিন্ন পর্যায় ও কতিপয় নাটকের মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধেও একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে—যাতে করে শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ করতে পারেন।

১২.২ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তৎকালীন অবস্থা

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যচর্চার এক অবিস্মরণীয় নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা রঙ্গমঞ্চে তখন মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু সেন, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মনোমোহন বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের নাটকগুলির রমরমা অভিনয় চলেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ছিলেন জাত অভিনেতা। তাঁর রচিত নাটকগুলি ছিল রঙ্গমঞ্চের দাবি মেটানোর জন্য। সেজন্য নাট্যরচনাতে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। একশ'র বেশি নাটক তিনি লিখেছেন। গীতিনাট্য ও পৌরাণিক নাটকের পাশাপাশি তিনি তৎকালীন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধক নাটক অবলম্বনে যুবসম্প্রদায়কে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ প্রভুরা সেই উৎসাহের মূলে জল ঢেলে দিলেন। ১৬ ডিসেম্বর ১৭৮৬ সালে ইংরেজরা 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল' পাশ করিয়ে নিলেন। রঙ্গমঞ্চে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কোনও সংলাপ রাখা যাবে না, কোনও অত্যাচারের (ইংরেজদের দ্বারা) দৃশ্য দেখানো যাবে না—নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্যকর্মী এবং দর্শকরা পর্যন্ত শাস্তির আওতায় পড়বেন। শুধু তাই নয় যাবতীয় নাটক অভিনয়ের পূর্বে পুলিশের কাছ থেকে অগ্রিম অনুমোদন নেওয়া আবশ্যিক বলে জারি করা হল। এই নাট্য

নিয়ন্ত্রণ বিল জারি করার পর থেকেই বাংলা নাটকের গতিপথ বদলে গেল—স্বদেশপ্রেমের স্রোত চলে গেল পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, অবতার চরিত্র—এই ধরনের নাট্যধারাকে কেন্দ্র করে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অঙ্গন ছিল সে সময়ের সাহিত্য-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। ঠাকুরবাড়ির 'দক্ষিণের বারান্দা' ছিল কখনও কাব্যপাঠের আসর, কখনও ছোটগল্পের বর্ণনায় মুখর আর কখনও নাট্য সংলাপে ও সুরলহরীর মূর্চ্ছনায় প্রবহমান। অনেক উল্লেখযোগ্য নাটক এই দক্ষিণের বারান্দায় অভিনীত হয়েছে। বাড়িতে অনেক লোকজন, তাঁরা সবাই মিলে 'কমিটি অব ফাইভ' গড়ে তুললেন, যারা নাটক নির্বাচন, অভিনেতা নির্বাচন, সংগীত পরিবেশন, আবহসংগীত পরিবেশন নির্বাচন ইত্যাদি যাবতীয় নাটক-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিমত দেবেন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। এমনকী 'নবনাটক' (১৮৬৬) অভিনয়ের সময়ে দোতলার হলঘরে স্টেজ বানানো হয়েছিল এবং বনদৃশ্যের সিনটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য জোনাকি পোকা আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছিল। এমন সব ঘটনা ঠাকুরবাড়ির নাট্যচর্চার আবহকে স্পষ্ট করে।

এই রকম একটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের মন-মানসিকতার গড়ন তৈরি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ শুধু নাট্যরচয়িতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা, নায়ক, যন্ত্রানুষঙ্গে পারদর্শী, বলা যায় বাংলা নাট্যজগতে তিনি ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান।

১২.৩ রবীন্দ্রনাট্যের বিভিন্ন পর্যায়

নাট্যজগতে রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর লেখনশৈলীতে বাংলা নাটকের সম্ভার যেন বৈচিত্র্যের ডালিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রাক্ রবীন্দ্রপর্বে নাটকের স্থূলরস, অশালীন কথকতা, ভাঁড়ামির অভব্যতা ইত্যাদির যে বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল তা অনেক মুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শোভন শিল্পরূপের বিন্যাসে। একদিকে ইতিহাসের রোমান্সের মায়াময় বর্ণিল জগৎ আবার অন্যদিকে সামাজিক বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষ, জাতপাতের সমস্যা—ইত্যাদি নানান প্রাসঙ্গিক বিষয়ও তাঁর নাটকে স্থান পেয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে অভিনব ও গীতিমণ্ডিত এই নাটকগুলি শুধু বিষয়-বিন্যাসে নয়, রূপবৈচিত্র্যেও কয়েকটি বিভক্ত হয়েছে। যেমন প্রথমেই উল্লেখযোগ্য গীতিনাট্য-এর উদাহরণ বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১), কালমৃগয়া (১৮৮২), প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪), চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), বিদায় অভিশাপ (১৮৯৪) ইত্যাদি। এগুলি সবই রূপের দিক থেকে কাব্যধর্মী নাটক—কাহিনি কখনও রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্য থেকে নেওয়া, কখনও বা পুরাণ ইতিহাসও এই নাটকগুলিতে স্থান পেয়েছে। এই নাটকগুলিতে সংলাপ মুখর হয়েছে সংগীতধর্মিতায়।

দ্বিতীয় শ্রেণির মধ্যে আমরা উল্লেখ করতে পারি 'রীতিভিত্তিক নাটক'—রাজারানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), মুকুট (১৯০৮), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯), তপতী (১৯২০), বাঁশরী (১৯৩৩)—ইত্যাদি বেশ কিছু নাটক এই শ্রেণিতে পড়ে। চিরাচরিত আঙ্গিক ধারায় নাটকীয় উৎকণ্ঠায়, রূপের চমৎকারিত্বে, ভাষার চাকচিক্যময়তায় এই নাটকগুলিতে কাহিনির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই

নাটকগুলিতে ‘লিরিকের বাড়াবাড়ি’ (রাজারানী) অর্থাৎ আতিশয্যকে মেনে নিতে পারেননি। এই পর্বের শেষ নাটক ‘বিসর্জন’। ধর্মের নামে রক্তপাত বা বলি—প্রাণিহত্যা এবং মানবতার অপমান রবীন্দ্রনাথ কখনই সহ্য করতে পারেননি। তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের সংলাপে। তাই নাটকের শেষে ধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়।

তৃতীয় বিভাগে উল্লেখ করতে পারি—কৌতুকরস প্রধান নাটকগুলিকে গোড়ায় গলদ (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), ব্যঙ্গ কৌতুক (১৯০৭), শেষ রক্ষা (১৯২৮), চিরকুমার সভা (১৯৩৬) ইত্যাদি। এই সফল নাটকগুলি হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়েছে। অনাবিল হাস্যরসের পরিবেশন কখনও চরিত্রের মারফৎ কখনও ঘটনার বর্ণনায় উপজীব্য হয়ে উঠেছে। চরিত্রের অসংগতিকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের উৎসার সেই কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রবহমান ধারায় স্থান করে নিয়েছে (ভাঁড়ু দত্ত)। রবীন্দ্রনাথের উক্ত নাটকগুলিতেও হাস্যরসের ধারা চরিত্রের অসংগতি ও আতিশয্য বা ভ্রান্তিজনিত আচরণ, ঘটনার চমৎকারিত্ব ও সংলাপের তির্যক রসিকতা হৃদয়ানুভূতির জাগরণ ঘটিয়েছে।

চতুর্থ বিভাগের পর্যালোচনায় ঋতুরাজের আবাহন। শারদোৎসব (১৯০৮), ফাল্গুনী (১৯১৬), বসন্ত (১৯২৩), শেষবর্ষণ (১৯২৫), নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা (১৯২৮), শ্রাবণ গাথা ইত্যাদি রচনাগুলিকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। প্রকৃতিপ্রীতি ও তার সৌন্দর্যে আত্মহারা কবিমনের উচ্ছ্বাস উপরোক্ত নাটকগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। ঋতুপর্যায়ের নাটকগুলিতে বিভিন্ন ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা ও প্রকৃতিপ্রেম বিবৃত হয়েছে। প্রকৃতি সুন্দর—সেই সৌন্দর্যের স্পর্শে মানুষের মনোলোকও উদ্‌ভাসিত হয়, বর্ণিল রূপ ধারণ করে—অসাধারণ কাব্যময় ভাষায় সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য বিবৃত হয়েছে। এখানে প্রকৃতি শুধু জড় প্রকৃতি থাকেনি, কবিভাবনার স্পর্শে তাতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। সেই মানব প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দধারা বহন করে চলেছে।

পরবর্তী শ্রেণিবিভাগে আসে নৃত্যনাট্যগুলি। তা শুধু নাটক নয়, কাব্য ও নাটকের মেলবন্ধনে এক নতুনের বাণীবহ হয়ে উঠেছে। নটীর পূজা (১৯২৬), শাপমোচন (১৯৩৩), তাসের দেশ (১৯৩৩), চণ্ডালিকা (১৯৩৩), শ্যামা (১৯৩৯) প্রভৃতি নাটকগুলি বিভিন্ন ভাবনার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। জীবনের নানা বাণীবাহক এই নাটকগুলিতে কখনও পুরাণের কাহিনি, অতীতচর্চা আবার বা সমকালের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার জয় ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ঋতুরঙ্গশালায় নটরাজের তাণ্ডবে এই মহাকালের ধ্বংস ও প্রলয়রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। মনের ভিতরে-বাহিরেও এই নটরাজের পদবিক্ষেপে যে প্রলয় এসে উপস্থিত হয় তাতে মনের যোগাযোগ ঘটলে ভালো নইলে মহাকালের প্রলয়নৃত্যকে উপেক্ষা করা মৃত্যুরই সামিল।

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিজীবনের বিস্ময় সৃষ্টিকারী ফসল তাঁর রূপক ও সাংকেতিক নাটকগুলি। বলা বাহুল্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে রূপক সাংকেতিক নাটকগুলিতে। রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২),

অরূপরতন (১৯১৯), মুক্তধারা (১৯২২) এবং রক্তকরবী (১৯২৪) ও কালের যাত্রা (১৯৩২) ইত্যাদি নাটকগুলিতে রূপক ও সাংকেতিক নানা চরিত্রের আড়ালে কবির মনোভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। আসলে উদ্ধৃত নাটকগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাই অনেক সমালোচক এগুলি তত্ত্বনাটক বলে অভিহিত করে থাকেন। প্রথমেই দেখা যাক 'রাজা' নাটকটির বক্তব্যে কোন্ তত্ত্বধারণা প্রাধান্য লাভ করেছে? আপাত দেখা জগৎ ও জীবনের রূপ প্রতিফলিত হয়, তার অন্তরালে থেকে যায় এক অচেনা অজানা অপরিচিত রূপ। রূপক ও সংকেতধর্মিতার মধ্যে দিয়ে অন্তর্নিহিত সেই গভীর 'তত্ত্ব'কে ব্যঞ্জিত করা হয়। বস্তুজগতের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে যে অচেনা জগৎ, নানান রূপক, প্রতীকের মাধ্যমে নাট্যকার তাকে উপস্থিত করেন। রূপক-সাংকেতিকতার এই উপস্থাপন—নাটকের এই শ্রেণিবিভাগটিকে চিহ্নিত করে। প্রাত্যহিকতার গ্লানিতে জীবনের ভাষা যখন ক্লেদাক্ত হয়, তখনই রূপক-সাংকেতিকতার আবরণে আবৃত করে তার অতীন্দ্রিয় রহস্যকে নাট্যকার ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন। 'রাজা' নাটকে যেমন রাজা আছে; রাজার কণ্ঠস্বর আছে কিন্তু রাজা অদৃশ্য, তাকে কেউ দেখতে পায় না। অরূপের মধ্যে রূপের আরাধনা। রানী সুদর্শনার মধ্যে অরূপকে দেখার আগ্রহ আছে, উদগ্র বাসনায় আপ্লুত রানী রাজাকে চর্মচক্ষে দেখতে চান—অপেক্ষা তার সয় না। কিন্তু অহংবোধ অহংকার যতক্ষণ রানী সুদর্শনার মনকে অধিকার করে রেখেছে ততক্ষণ বাসনার পরিতৃপ্তি নেই। অথচ দাসী সুবদনার সেই অহংবোধ নেই; সহজ সরল মনের মুকুরে রাজা স্বয়ং প্রতিবিম্বিত হন। রানীর সেই সরলতা নেই, তাই সে অন্ধকারে হাতড়ে মরে রাজাকে দেখার জন্য।

'রাজা' নাটকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়েছে 'অচলায়তন' নাটকে। অচলায়তনের বাসিন্দারা নিয়মনিষ্ঠ—খোলা রাস্তায় তাদের গা ঘিনঘিন করে, মনে সুখ নেই। কৌণ্ডিল্য, ভবদত্ত এরা অচলায়তনের বাসিন্দা। এরা পুরুষানুক্রমে নিয়ম মেনে চলে। ঊনপঞ্চাশ হাত গণ্ডি মেপে কৌণ্ডিল্যের বাবা জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু মৃত্যুর পর ঊনপঞ্চাশ হাত শবদেহের দাহ করার জন্য যথেষ্ট নয়। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে শাস্ত্রীমহাশয় ঊনপঞ্চাশের (৪৯) শব্দদুটোকে উলটিয়ে চুরানব্বই (৯৪) করে তবে সমস্যার সমাধান করলেন। 'অচলায়তন' নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। ওলট-পালট হবার জো নেই। এখানে আচার আছে, বিচার আছে; নিয়ম আছে, নিষ্ঠা আছে; কিন্তু বিধিনিষেধের অঙ্গুলিহেলনে 'অচলায়তনে'র প্রতিবেশীরা রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রের মতো জীবনধারণে ওষ্ঠাগত প্রাণ। কবি যদিও এই অচলায়তনের নিগড় থেকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন জ্ঞান ও প্রেম এবং কর্ম—এই ত্রিবিধের সামঞ্জস্যই একমাত্র মুক্তির পথ।

'ডাকঘর' নাটকের মর্মবাণী একটু অন্যরকম। রাজা ও অচলায়তনে যেমন ব্যঞ্জনাধর্মিতা মুক্ত বিষয়কে অনেকটাই আবৃত রেখেছে তেমনি 'ডাকঘর' নাটকটি নয়। পুজোর ছুটির পর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন। শিলাইদহেও উদার প্রকৃতি তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল—কিন্তু দায়িত্ব-কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে তিনি বেরোতে পারেননি। শান্তিনিকেতনে এসে তাই মনের উদার প্রাঙ্গণে তিনি বেরিয়ে পড়তে চাইলেন—খোলা আলোয়, খোলা রাস্তায় তাঁর মন ছুটে বেরিয়ে পড়তে চাইল। হয়তো ভেতরে ভেতরে তাঁর মনে মৃত্যুচেতনার হাতছানিও ছায়া ফেলছিল। তাই ডাকঘর নাটকের

গদ্যভাষায় সেই ভাবটি ব্যক্ত করলেন অমল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ডাকঘরের গদ্যভাষায় কিন্তু কোনও কাঠিন্য নেই বরং পদ্যের রস ও কাব্যধর্মিতা পরতে পরতে ছায়া ফেলেছে।

অমল অসুস্থ রুগ্ন—তার বাঁচবার আশা নেই, সে অপেক্ষা করে কবে ডাকঘর থেকে তার চিঠি আসবে—যেখানে রাজামশাই কবে আসবে তার সংবাদটি পাবে। অমলের শরীরে মৃত্যুর ছায়া ফেললেও ইহজীবনের পিছুটান তাকে ছাড়তে চায় না। কখনও দইওয়ালা, কখনও সুধা, কখনও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলার আহ্বান সবই তাকে বড় আকর্ষণ করে। কিন্তু চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে বিশাল ফারাক। রোগ তাকে নিষ্কৃতি দেয় না—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে অমল। তার জীবনের গণ্ডি আর তাকে ধরে রাখতে পারে না—চলে যায় সেই পাহাড় পেরিয়ে দূরে, আরও দূরে যেখানে আকাশ ও পাহাড় মিশে গেছে। নাটকটির শেষে দেখা গেছে মৃত্যুজর্জর এক ছায়াময় বিষণ্ণতা। যদিও কবির ব্যক্তিজীবনের বিয়োগব্যথার এক অন্তর্নিহিত অতীন্দ্রিয় বেদনাবোধ এই নাটকের পরিবেশ ঘনিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই নাটকে ব্যবহৃত গদ্যলিরিকের তন্ময় আবেদন বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে রচিত নাটকদুটি মুক্তধারা (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) ও রক্তকরবী। দুটি নাটকেরই মূল বক্তব্য যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে। প্রথমটি অর্থাৎ মুক্তধারা নাটকে আমরা দেখি মুক্তধারার স্রোতস্বিনী প্রবাহকে রুদ্ধ করেছে যন্ত্রসভ্যতায় বলীয়ান মানুষেরা। শুধু শিবতরাইয়ের জলপ্রবাহই নয়, পিপাসার একমাত্র উৎস মুক্তধারাকে তারা বন্ধন করেনি বরং উদ্ধতভাবে ভৈরব মন্দিরের উল্টোদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে যন্ত্রের চূড়াকে। এটা যন্ত্রসভ্যতার আস্ফালনের রূপক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রের-মন্ত্রের-তন্ত্রের সবার উর্ধ্বে মানবতার স্থান। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-জাপান পরিভ্রমণের পর দেখে এসেছিলেন Humanism-এর অধঃপতন এবং যান্ত্রিক জীবনধারার উদ্বোধন। যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক নীরস মানুষগুলির জন্য গ্লানি অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মুক্তধারা নাটকে মন্দির ও বাঁধের চূড়ার ঔদ্ধত্য যেন পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের দ্যোতক হয়েছে। উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ যখনই যন্ত্ররাজ বিভূতিকে দিয়ে শিবতরাইয়ের মানুষ জব্দ করতে চান না কেন—রবীন্দ্রনাথের নিভৃতবাণী 'সত্য-শিব-সুন্দরে'র আদর্শ এখানে ফলপ্রসূ হয়েছে। জয়ী হয়েছে মানবাত্মা—সেই কল্যাণের পথ মঙ্গলের পথ কাটবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে রাজকুমার অভিজিৎ—যার জন্ম কোনও রাজবাড়িতে হয়নি। যে রাজার সন্তান নয়, পালিত পুত্র—মুক্তধারার ঝরণাতলায় যাকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল। তাই রাজবাড়ির মনুষ্যত্বহীন যান্ত্রিক পরিবেশের চার দেওয়ালের মধ্যে তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারেনি। হঠাৎ করে ভেসে আসা ধন আবার হঠাৎ করে স্রোতে হারিয়ে যায়। বিজ্ঞানের মুন্সিয়ানা তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। এত যান্ত্রিক যন্ত্রদেবতার আবাহন—'নম যন্ত্র নম যন্ত্র নম যন্ত্র'—সবই মানবতা-মানবিকতার জলস্রোতে ভেসে গেল। মানবপ্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমেই মুক্তি পেল পিপাসিত মানবাত্মা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালে সময়ের ছাপ, দেশ-কাল-মানসিকতার পরিবর্তন, মানবতার অপমান ও তার প্রতিশোধ এই নাটকে এক গভীরতর পরিবেশ রচনা করেছে। সমসাময়িক কালে লেখা বহু প্রবন্ধে ধর্মের শুষ্ক আচার-আচরণ; মিথ্যা সংস্কার, মানুষের যুক্তিহীন হৃদয়হীন রীতিনীতি; রাজনীতির ক্রূরতা, হিংস্রতা, যান্ত্রিক মনোভাব মানবতাকে প্রতি

পদে পদে নীচে নামিয়ে ফেলেছে—ধূলায় লুণ্ঠিত আজ মানবাত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে। গল্পে কবিতায়, নানান লেখায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অনুভব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন এই নির্মমতা।

'রক্তকরবী' নাটকটির প্রকাশকাল ১৩৩০ বঙ্গাব্দ। প্রথমে এই নাটকটির নাম ছিল 'যক্ষপুরী', পরে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নাম দেন 'নন্দিনী'। তারপর ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রবাসী পত্রিকায় যখন এটি প্রকাশিত হয় তখন কবি নিজেই এই নাটকটির নাম বদলিয়ে রাখেন 'রক্তকরবী'। সমালোচকরা অনেক যুক্তি সাজিয়েছেন এই নাম পরিবর্তনের কারণ দেখিয়ে। কিন্তু 'যক্ষপুরী' নামটির মধ্যে যে ভাবনাটা প্রথমেই উঠে আসে এবং এমন একটা যেখানে মনুষ্যত্বের উপযোগী ভাবনাটা বিরল। পাশ্চাত্যের জড়বাদ, যন্ত্রসভ্যতা, বৈজ্ঞানিক শক্তি আড়ম্বরতা মানুষকে কীভাবে যক্ষে (ধনরত্নের পাহারাদার) পরিণত করেছে তার একটা প্রত্যক্ষ আঘাত পড়েছে নামকরণের মধ্যে। কবির কাছে সেটি কাম্য নয়, এটি একটি রূপকাশ্রিত সাংকেতিক নাটক—তার নামকরণ এত প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হলে চলে না। কবি তাই নাম পাল্টে দিলেন 'নন্দিনী'। কিন্তু সমস্ত নাটকে নন্দিনী একটি সজীব চরিত্র—গানে, উল্লাসে, হিল্লোলে সে যেন সমস্ত নাটকটিকে মাতিয়ে রাখে। কিন্তু ভাবদ্যোতক কোনও নাম এটি নয়—নাটকের মর্মবাণী তাকেই বহন করেছে 'নন্দিনী'—এরকম ব্যক্তিনাম কবির মনোমত নয়, তাই রক্তকরবী নামটিই কবির মনোসঙ্গত হয়েছে। কেননা নন্দিনী ও রক্তকরবী—এটি খুব সংগত কারণেই একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। সেই ভাবনার বশবর্তী হয়ে রবীন্দ্রনাথ, নন্দিনী ও রক্তকরবীর মধ্যে একটা মর্মগত যোগ লক্ষ করেছেন—তারা রূপে আলাদা হলেও ভাবনার দিক থেকে এক সুতোয় গাঁথা।

কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে দেখিয়েছিল লোহালক্কড়ের স্তূপের মধ্যে থেকে একটা রক্তকরবীর চারা লাল ফুল নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক তেমনি যক্ষপুরীর শত অত্যাচার নিপীড়নের মধ্য দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল নন্দিনী। তার আগমনে নীরস যান্ত্রিক যক্ষপুরীতে আসে এক নতুন হিন্দোল। প্রাণে সাড়া ফেলে দেয় সে—নাচে-গানে-উৎসবে সে যেন এক নতুনত্বের আস্বাদ, উদ্দীপনার বীজমন্ত্র। যক্ষপুরীর রাজার গারদের আড়ালেও যেন ঢোকে সে গানের সুর, সেই রক্তকরবীর রঙের উদ্ভাস আর মুক্তির মন্ত্র। যক্ষরাজের যেন ঘুম ভাঙে—শিকলঘেরা কারাগারের ধনদৌলতের স্তূপীকৃত সম্ভারের মধ্যে ঢোকে সূর্যের প্রথম রশ্মিরেখা। এতদিন যা অধরা ছিল, এতদিন যা গুপ্ত ছিল—তারই বন্ধন ঘুচে গেল—যক্ষপুরীর মানুষের গলায় এল সুর, সুখ ও আনন্দের সুরলহরী।

একক-১৩ ❑ রূপক সাংকেতিক নাটক ও রবীন্দ্রনাথ

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য

১৩.২ রূপক-সাংকেতিক নাটক

১৩.৩ রবীন্দ্রনাট্যে রূপক-সাংকেতিকতা

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে রূপক সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধে একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাটক পাঠ করার পূর্বে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় নাট্য-আন্দোলন ও নাট্য প্রকরণের প্রভাব যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রধান নাট্যকলায় পড়েছিল সেহেতু রূপক-সাংকেতিকতার প্রকরমের ধারণা আবশ্যিক। শিক্ষার্থী এই এককে রূপক-সাংকেতিক নাটকের বৈশিষ্টাবলী সম্পর্কে যেমন জ্ঞাত হবেন তেমনই রবীন্দ্রনাট্য আলোচনায় তার প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারবেন।

১৩.২ রূপক সাংকেতিক নাটক

'কালের যাত্রা' নাটকটির বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা রূপক ও সাংকেতিক নাটকের বিষয়ে কিছু বলার অবকাশ রাখি। আধুনিক যুগে যেমন বিজ্ঞানের প্রাধান্য—যুক্তিতর্কের প্রাধান্য, তেমনি কোনো শিল্প পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক বক্তব্য যেমন থাকে, তেমনি সরাসরি তাকে উপস্থিত করা হয় না। একটা বৌদ্ধিক আবরণে তাকে প্রকাশ করতে হয়—যাকে আমরা ব্যঞ্জনাঋদ্ধ উপস্থাপনা বলতে পারি। অর্থাৎ বক্তব্যকে একটা তত্ত্বের আবরণে বা তত্ত্বের অন্তরালে প্রকাশ করার প্রবণতা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে—যাকে এক রূপক বা allegory এবং সাংকেতিক বা Symbolic সাহিত্য বলে উল্লিখিত করা হয়। রূপক ও সাংকেতিকতা শিল্পমাধুর্যে একটি মুদ্রার দুটি দিক। একটি বস্তুগত আর একটি ভাবগত বা ব্যঞ্জনাগর্ভ। দুটি বস্তুর মধ্যে যখন সাদৃশ্য উপস্থিত করা হয় তখন দুটি বস্তুই থাকে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব বস্তু। যেমন দুটি বস্তুর মধ্যে যখন সাদৃশ্য উপলব্ধি করি তখন তা হয় রূপক (allegory)। অলংকারশাস্ত্রে রূপককে অলংকার হিসাবে মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে—যখন দুটি বস্তুর মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় তখন রূপকের একটা শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। যেমন 'দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়'—এখানে আঁখিরূপ পাখির কথা বলা হয়েছে। আর এক ধরনের রূপকে রূপ-কে অতিক্রম করে অরূপের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে তাকে প্রতীকী রূপক বা সাংকেতিক বলা হয়। যেমন 'তার

জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি মর্মান্তিক ভাবে ঘটল।'—এখানে জীবনের সঙ্গে নাটকের তুলনা করা হয়েছে। জীবনে স্বচ্ছন্দ চলার পথে মৃত্যু এসে পরিসমাপ্তি ঘটাল। এই নাটকীয়তার সঙ্গে জীবনের তুলনা ব্যঞ্জনাধর্মী বা প্রতীকধর্মী—তাই সাংকেতিক। রূপকের ব্যবহার কবিতার আদি-মধ্য যুগ থেকে চলে আসছে—'সীতাহারা আমি যেন মণিহারা ফণি।' সাপের মাথার মণি ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে, তেমনই সীতাহরণের পর রাম যেন অনুজ্জ্বল, হতাশ এবং ম্রিয়মাণ। এই তুলনা অনুভূতিগ্রাহ্য এবং অনুভবযোগ্য।

সংকেতবাদী বা সাংকেতিক আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করে ফরাসিতে। তিনজন ফরাসি কবি—বোদলেয়ার, ভ্যারলেন ও মালার্মে এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেন। সংকেতের গভীর ব্যঞ্জনায় অর্থপ্রগাঢ়তা ধরা পড়েছে বোদলেয়ারের চেতনায়। ভ্যারলেনের কাব্যসৃষ্টিতেও দেখা গেল তার অনায়াস আবির্ভাব আর মালার্মের দার্শনিক ব্যাখ্যায় ও প্রয়োগে সংকেতবাদী আন্দোলনের সগৌরব প্রতিষ্ঠা দেখা দিল। সংকেতবাদী কাব্যশিল্প বা নাট্যশিল্পে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করল এবং ফ্রান্স থেকে ছড়িয়ে পড়ল বহির্বিশ্বে। সাংকেতিকতা যেহেতু ব্যঞ্জনাধর্মী, সেহেতু এরা জনসাধারণের থেকে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং গোষ্ঠীসাহিত্য হিসেবে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। সর্বসাধারণের জন্য এই শিল্প বোধগম্য নয়; তাই সাংকেতিক শিল্প রচনা খুব প্রভাবশালী হিসাবে কাজ করল না। মালার্মের সাংকেতিক শিল্পের বিশেষত নাটকের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

ক. নাটক অন্তর্জীবনের বহিঃপ্রকাশ

খ. নাটক বিশ্বরহস্য ও বিশ্বজগতের বিস্ময়ের উন্মোচন ও প্রকাশ।

গ. নাটকের ভাষা গদ্য নয়, কাব্যভাষা। বর্ণনাত্মক নয়, চিত্তের উদ্বোধক নয়, বিবৃতি নির্ভর নয়, ব্যঞ্জনা নির্ভর।

ঘ. নাট্যমঞ্চকে নাটকীয়তা বর্জিত হতে হবে। এবং অভিনয়কে হতে হবে সাজসজ্জাহীন সরলতম অনুষ্ঠান।

ঙ. রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত নাটকটিকে সন্নিবেশিত করতে হবে একটি কাব্যময় শিল্পরূপের মাধ্যমে।

মালার্মের এই সংকেতবাদী নাট্যতত্ত্বের প্রভাব পরবর্তীকালে সংকেতবাদী নাটকগুলিতে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হল। পরবর্তীকালে সংকেতবাদী বা সাংকেতিক নাট্যরচনার ধারায় যোগ দিলেন মেটারলিংক। এই সাংকেতিক নাট্যরচনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য ইংরেজি সাহিত্যে সাংকেতিক রচনার সূচনা ঘটে ইয়েট্‌স্-এর রচনায়। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে এই সাংকেতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু পরিচিত ছিলেন। বলা যায় উক্ত রচনাকারদের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ রূপক সাংকেতিক নাটক রচনায় উৎসাহিত হলেন। ড. নীহাররঞ্জন রায় রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি রচনায় ইউরোপীয় সাংকেতিক নাট্যকারদের প্রভাবের কথা বলেছেন। 'খেয়া' কাব্যের সময় থেকেই এই অতীন্দ্রিয় রহস্য-ব্যঞ্জনার দ্বারা কবির মানসজগৎ প্লাবিত হতে শুরু করেছিল। অবশ্য একটি কারণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের রসপুষ্ট শিক্ষায় ক্রমবর্ধিত। তাই দেখা যায় সাংকেতিক নাটক

রচনায় সেই পার্থিব জগতের অন্তরালবর্তী যে সূক্ষ্মভাব-ভাবনা তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তীব্র—অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতি কবির ভাবনাকে অধিকার করেছিল। কবির রচনায় ছায়া ফেলেছিল সেই ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম রহস্য-ব্যঞ্জনা। ঋতু পরিবর্তনের ক্রমবিবর্তনে কবি লক্ষ করেছেন পরমসুন্দর ভগবানের আহ্বানগীতি। পাখির গান শুধু গান নয়, সেই গানের অতীত এক আকর্ষণীয় আহ্বান শুনতে পেতেন। প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার আলোকমালায় খুঁজে পেতেন জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে। এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকমালার মধ্যে।

১৩.৩ রবীন্দ্রনাট্যে রূপক সাংকেতিকতা

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে নাট্যমঞ্চে আনয়নে স্বরূপ সম্পর্কে ভেবেছিলেন। এবিষয়ে ইউরোপীয় নাট্যধারার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ আদান-প্রদানের বিসেষ সূত্র পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতকের শেষ থেকে ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে ও প্রযোজনা মঞ্চ-উপস্থাপনায় বাস্তববাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছিল তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন কথা বলা মুশকিল। অশ্রুকুমার সিকদার এমনটাই দাবী করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাঠ্যে ঐক্য ও রূপান্তর' গ্রন্থে। সে সময়ে ইবসেন, শেকভের নাটকগুলি, স্ট্রিন্ডবার্গের নাটক এমনকী ইয়েটস্ ও সিঞ্জের নাটকগুলির গঠনও নির্বস্তুক। জার্মান এক্সপ্রেশনিজমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটলেও তাঁর নাটকের বিবর্তনের ক্ষেত্রে সেগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এঁদের নাটকেও ব্যবহৃত হয়েছিল প্রতীক, রূপক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপকের ব্যবহারের ভিত্তিগত মৌল পার্থক্য হল—ভারতীয় নাট্যকলার সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলাপ থেকে উঠে আসা প্রশ্ন। নিরন্তর প্রস্ন করতে করতে নবনীরিক্ষার মদ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যভাবনাকে পরিমার্জিত করেছেন। এক ঐক্যবোধে উদ্বেজিত হয়েছেন। সংহতি সাধনের নিরন্তর প্রয়াসই তাঁকে নাটকের রূপান্তরে আগ্রহী করেছে। কোনো কোনো নাটকে এই রূপান্তর এতটাই ঘটেছে যে মনে হবে দুটি ভাবনাগত দিক থেকে দুটি পৃথক নাটক। 'কালের যাত্রা' নাটকের ক্ষেত্রেও এমন পরিমার্জন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাজা', 'অচলায়তন', ডাকঘর, রক্তকরবী ইত্যাদি সকল পাঠকেরই পরিচিত। সেগুলিতে কিছু ভাবগত বিষয় বিভিন্ন চরিত্র, মোটিফস বিষয়ের সংস্থাপনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের প্রথম নাটক রথের রশি—এই নাটিকাটি 'রথযাত্রা' নামে প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রথযাত্রা থেকে রথের রশিতে নাম পরিবর্তনের বিবর্তন বুঝতে হলে প্রথমেই লক্ষ্যনীয় কোন বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ নাটকে ইঙ্গিতময় করে তুলতে চাইছেন। রথযাত্রায় রথই প্রধান, রথ সেখানে সমাজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই সমাজের ওপর জোর দেবার পরিবর্তে সমাজকে গতিশীল করে তোলে যে শক্তি তার ওপর গুরুত্বারোপ করতে চান। রথকে গতি দেয়, টানে রথের রশি। তাই রূপক হয়ে ওঠে রথের রশি।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি ভাবপ্রধান, ঘটনাপ্রবাহে ঘনঘটা সেখানে নেই। বরং সংগীতের মূর্ছনা সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। অধিকাংশ নাটকগুলি যেহেতু ভাবের বাহক; তাই সংগীতের মূর্ছনা সেই ভাবেরই দ্যোতনা জাগায়। প্রত্যেকটি সাংকেতিক নাটকে সংগীত ভাবেরই ইঙ্গিতবাহী। যে কথা, যে ভাবনা সরাসরি বলতে ভাবপ্রকাশে ব্যাঘাত ঘটে, তাকেই রবীন্দ্রনাথ সংগীতের ইঙ্গিতবাহী করে তুলতে চেয়েছেন। আর এই সংগীতগুলি অধিকাংশই সমবেত সংগীত—যাকে জনতা চরিত্র প্রাধান্য পায়। কালের যাত্রা নাটকেও একাধিক সংগীত সংযোজনা রয়েছে। ব্যক্তিচরিত্র যেখানে গৌণ হয়ে যায়, সাংকেতিক নাটকের বক্তব্যকে জোরালো করে তুলতে পারে না—সেখানে এরকম জনতা চরিত্র তাদের বক্তব্য নিয়ে কখনও সংগীতের আকারে, কখনও গদ্যভাষায় সমবেত বক্তব্যকে প্রকাশ করে।

একক-১৪ ❑ কালের যাত্রার বিষয়বস্তু ও চরিত্র

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ বিষয়বস্তু

১৪.৩ নাটকের চরিত্র

১৪.৪ কবির দীক্ষা

১৪.২ নাটকের বিষয়বস্তু

এবারে 'কালের যাত্রা' নাটকের কাহিনিটি জেনে নেওয়া যাক। কালের যাত্রা নাটকের দুটি অংশ—একটি রথের রশি অন্যটি কবির দীক্ষা। 'কালের যাত্রা' আসলে ঠিক পঞ্চমাঙ্ক নাটক নয়, নাটিকা। অর্থাৎ মাপে ছোট একরকম নাটক। এটির কোনও অঙ্কবিভাগ নেই—একাঙ্কিকা। এই নাটকে দিনবদলের, পালাবদলের, সমাজতান্ত্রিক পটপরিবর্তনের কথা ধরা পড়েছে। কাহিনিটি এইরকম— রথযাত্রার উৎসব—বহু লোকজনের আগমনে মুখর হয়ে উঠেছে চারিদিক। সকলেরই মনের একান্ত ইচ্ছে রথযাত্রা দেখে জীবন ধন্য করবে। কিন্তু রথকে নাড়ানো যাচ্ছে না—পুরোহিতমশাই অনেক মন্ত্র পড়লেন, কিন্তু রথ চলল না। ক্ষত্রিয় মহাপুরুষরা এলেন, সমাজের বণিক সম্প্রদায় রথ টানলেন, তবু রথ অচল। গ্রামের মেয়েরা ছুটে এল, মানত করল, কত তুকতাক করল, কত পুজোর আয়োজন করল—কিন্তু রথ চলল না। শেষপর্যন্ত রথের রশিকে (মোটা দড়ি) পুজো করল, পুজোয় আহুতি দিল ফলমূল সমেত ঘি, গঙ্গাজল, দুধ দিয়ে রশিকে পুজো করল, পথ কর্দমাক্ত হয়ে গেল। বেলপাতায়, পুষ্পার্ঘে পথ ঢেকে গেল, তবু রথ নড়ানো গেল না। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি হল, তবু রথ অনড়। সন্ন্যাসী তখন মন্তব্য করলেন মহাকালের যে পথে রথ চলবে, তা বড় এবড়ো-খেবড়ো—কোথাও উঁচু কোথাও নীচু, কোথাও বা গভীর গর্ত। পথ সমান করতে হবে, তবেই বিপদ কেটে যাবে, রথও চলবে গড়গড়িয়ে।

এমন সময় শূদ্রের দল এসে রথের রশি টানতে উদ্যত হল। এতদিন যা হয়ে এসেছে তাই তো হবার কথা। পুরোহিত ক্ষত্রিয়দের রথ টানতে নিষেধ করল। চিরকালীন যে প্রথা এতদিন ধরে নির্বিঘ্নে চলে আসছে—তা আর খাটল না। ব্রাহ্মণের হাতে, বণিক সম্প্রদায়ের হাতে আর রথ চলবে না। সনাতন প্রথার অবলুপ্তি ঘটছে দেখে, পুরোহিত সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ শ্রেণি এমনকি সমাজের ধনিক সম্প্রদায়ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এতকালের নিয়ম-প্রথার কি অবলুপ্তি ঘটল? চিরকাল সমাজের ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের হাতের টানে রথ ছুটেছে। এবারে কি সমাজের অপাংক্তেয় শূদ্র সম্প্রদায়ের হাতে রথ চলবে? এমন অনাসৃষ্টি কীভাবে ঘটবে।

সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মানুষেরা যখন চিরকালীন প্রথার এই অবলুপ্তি ঘটছে দেখে চিন্তিত, তখন শূদ্রেরা বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে রথের রশি ধরে রথ টানতে শুরু করল। এটুকুই কাহিনি।

— তারপরে কোন্ এক যুগে কোন্ একদিন
আমার উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।

নাটকের একদম শেষে সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি করে বলে—'জয় মহাকালনাথের জয়!'

অর্থাৎ চিরকাল যে মহাকালের রথ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে আজ তাকে সমাজবিন্যাসের উপর নির্ভর করে চলতে হবে। মহাকাল রথচক্রের পেষণে কোনো জাতি, কোনো প্রথাবদ্ধ নিয়ম চিরকাল বহাল থাকবে না—সমাজবিন্যাসের এই নিয়ম চিরকালীন— পরিবর্তনের মধ্যেই চিরপ্রবহমান।

রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংজ্ঞায় কাহিনির উপস্থাপনা এমনই। ঘটমান কাহিনির রূপকে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতটি এখানে ধরা পড়েছে। রথ এখানে মহাকালের প্রতীক— তার চালনার দায়িত্ব মহাকালের রথীদের। এই রথচালকেরা কখনও চিরকালীন হয় না। যেমন ইতিহাসে রাজ-রাজড়াদের পালাবদল হয় তেমনি পুরোহিত-ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রেরা অধিকার পায় সমাজচালনার। সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই ইতিহাস গড়ে ওঠে— ইতিহাস তার পারম্পর্য রক্ষা করে।

১৪.৩ নাটকের চরিত্র

এবারে নাটকের চরিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। ৩৮ পাতার এই নাটিকায় নানা চরিত্রের কথা উঠেছে—বলা বাহুল্য সমাজবিন্যাসের ছবিটি ফুটে উঠেছে। প্রথমেই আছে রথযাত্রার মেলায় মেয়েদের কথা—মেয়েদের কোনো নাম নেই—তাই সমবেত চরিত্র হিসেবেই এদের নেওয়া যায়, ব্যক্তিবিশেষ নয়, সমষ্টিবাচক এঁরা। কিন্তু সংলাপের মাধ্যমে যেখানে চরিত্র প্রকাশিত হয় সেখানে সংলাপ তো প্রয়োজন। সেজন্য সংলাপের জন্য চরিত্রগুলি প্রথমা, দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া—এভাবে পরিচিত করা হয়েছে। আসলে তারা সমবেত চরিত্র—যারা রথের মেলা দেখবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে—কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তারা জানতে পেরেছে—সর্বনাশের ঘনঘটা ঘটতে চলেছে। মানুষ আজ আর শ্রেণিবৈষম্য মানতে চাইছে না, কারণ সমাজের সমস্ত মানুষ একসঙ্গে যোগ না দিলে মহাকালের রথও চলবে না। সমাজরূপী রথ টানতে গেলে এতকাল যারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের কাছে অস্পৃশ্য ছিল, এখন তাদের দলে টানতে হবে, সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সমাজের রথ তবেই চলবে। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করতে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে একটা যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে—'সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে'— এটাই ঐক্যের বন্ধন, সমাজনীতি। চরিত্র হিসেবে সন্ন্যাসী আছেন, যিনি ভয়ঙ্কর সব ভবিষ্যৎবাণী করেছেন—'ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।' কিংবা 'দেউলে করে দিয়েছে

যুগের বিত্ত।' এরপর নাগরিকবৃন্দের প্রবেশ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নাগরিক এসে সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ে। মেয়েদের পুনরাগমন ঘটে তারা শাঁখ বাজিয়ে ঘি নিয়ে, দুধ নিয়ে, গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে, পঞ্চগব্য নিয়ে, পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছে বাবাদড়িরূপী নারায়ণকে প্রসন্ন করতে। এরপর নাগরিকরা মহাকালনাথের জয়ধ্বনি দিতে থাকে। কিন্তু মেয়েদের দল অনেক বাস্তব চরিত্র—তারা মহাকালনাথকে চোখে দেখেনি, কিন্তু দড়ি নারায়ণকে চোখে দেখেছে। দড়িঠাকুরের জন্য পুজোর জোগাড় করেছে। কিন্তু সন্ন্যাসী তাদের কোনো মন্ত্র পড়তে দেয় না—মহাকালের দুর্গম উঁচু নীচু পথকে সমান করতে হবে, তবেই রথ চলবে। এরপর সৈন্যদলের প্রবেশ—তারা জানাল রাজা এসেও রথ টানবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। প্রথম নাগরিক, সৈন্যদল সবাই এখন জনতা চরিত্রে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক নানা চরিত্র, নানা ঘটনার প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে শূদ্রদের এতকাল অবজ্ঞা করে এসেছে সমাজ— আজকে সমাজরূপী রথ তাদের হাতেই সচল, গতিশীল হবে। ধনিক শ্রেণির মানুষেরাও এসেছে রথ টানতে (ধনিক সম্প্রদায়)। এরাও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। এরপর এসেছে নর্মদাতীরের বাবাজির কথা। রাজার চর তাঁকে আনতে গিয়ে দেখে তিনি চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বুকে দুই পা আটকে। পঁয়ষট্টি বছর চলাফেরা না করে তিনি উঠতে পারেন না। দশজন জোয়ানে তাঁকে রথতলায় বহন করে নিয়ে এল, কিন্তু রথের দড়িতে হাত দিতেই রথ আরও বসে যেতে লাগল। আবার মেয়েদের প্রবেশ, নানা তুক্-তাক্ খাটিয়ে দড়ি-ঠাকুরের পুজো দিয়ে তারাও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত চর এসে মন্ত্রীমশাইকে বলে 'দলে দলে ওরা ছুটে আসছে।' বলছে 'আমরা রথ চালাব।' মন্ত্রী বাধা দিতে পারেন না। কেননা 'বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে।' শূদ্রদলের দলপতিরা এসে জানায়—'আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।' সমাজবদ্ধ মানুষদের মধ্যে ওদের এই জাগরণ মনে করিয়ে দেয় বিবেকানন্দ রচিত 'শূদ্রজাগরণ' প্রবন্ধটির কথা। পুরোহিত, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, ক্ষত্রিয় সমাজের এতকাল মহাকালের রথ চলেছে—এবার শূদ্রদের পালা—শূদ্র সম্প্রদায়ের জাগরণ।

এ ছাড়াও আরও একটি কবিচরিত্র এই নাটিকায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কাব্যিক ভাষায় নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য এই কবি চরিত্রটি কবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র কবিসমাজের হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। তিনি আসলে যে চরিত্রগুলির মাধ্যমে সমাজকে উপস্থাপনা করেছেন—সেখানে পুরোহিত আছে, সন্ন্যাসী আছে, রাজা আছে, মন্ত্রী আছে, সৈনিকদল আছে, মহিলাদের আগমন আছে, ধনিক সম্প্রদায় আছে, নর্মদাতীরের বাবাজি আছে— মোটামুটি সমাজবিন্যাসের সকল স্তরগুলির প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে কবি-দার্শনিকদেরকেও স্থান দিতে হবে? আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে নোবেল বিজয়ী সেখানে রূপক-সাংকেতিক নাটকে কবিত্বের মর্মবাণী থাকবে না? তাই নিয়ে এক কবি চরিত্র—যার দার্শনিক কাব্যময় বাক্য নাটকে উপলব্ধির অন্য এক মাত্রা সংযোজন করেছে। পুরোহিত যখন কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়—'ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত্র জানে কী।' কবি সে-কথার যে উত্তর দেন তা বলা বাহুল্য বুদ্ধিগ্রাহ্য—সবাই বুঝতে পারে না—ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—নীচের দিকে নামল

না চোখ। রথের দড়িটাকেই করল তুচ্ছ।' ওদের বলতে সমাজের রাজা-পুরোহিত-সন্ন্যাসী-সৈনিকবৃন্দ-ধনিক সম্প্রদায়- ক্ষত্রিয়রা—ওদেরই কথা বলা হয়েছে। তাদের শাসনে এতকাল সমাজ চালিত হয়েছে। কিন্তু এখন দিন বদলের সময় এসেছে—শূদ্রের জাগরণই সেই দিনবদলের সূচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। কবি চরিত্রের সংযোজনার গূঢ় রহস্যটিও এখানে কবি ব্যক্ত করেছেন—'রথযাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে/কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌঁছতে।' শুধু তাই সমাজবদলের পালায় বা দিনবদলের পালায় কবি-দার্শনিকেরও প্রয়োজন আছে। নইলে পট পরিবর্তনের বাণী বা দর্শন কীভাবে মানুষকে পথ দেখাবে? তাই পুরোহিত যখন জানতে চায়—'রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো?' তখন কবি জানায়—'গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে—আমরা মানি ছন্দ।...আমরা মানি সুন্দরকে, তোমরা মান কঠোরকে—অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।' আরও এক বড় দার্শনিক তত্ত্বকেও কবি এখানে ব্যক্ত করেছেন। সৈনিক যখন তাকে বলছে—'তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,/ওদিকে যে লাগল আগুন।' কবি উত্তরে যে দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করলেন তা রূপক-সাংকেতিক নাটকের এক সংগত, সামাজিক সত্য—'যুগাবসানে লাগেই আগুন।/যা ছাই হবার তা ছাই হয়,/যা টিঁকে যায় তাই নিয়েই সৃষ্টি হয় নব যুগের'—'কালের বার্তা'—এই মর্মবাণীই দার্শনিক সত্য—যা উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই নাটকটি পরিণতি লাভ করে।

১৪.৪ কবির দীক্ষা

কালের যাত্রা নাটকটিতে সংযোজিত ভিন্নতর আর এক অংশ 'কবির দীক্ষা'। এই নাটিকাটি মাত্র পাঁচ পাতার। দুইজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, সংলাপ বিনিময়ের মাধ্যমে একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এটি নাটিকা হিসাবে সংযোজিত না দার্শনিক তত্ত্ব ও সত্যকে কবি প্রকাশ করেছেন—সেটি আলোচনার মাধ্যমে জেনে নেওয়া যেতে পারে।

এইখানে দুটি চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে শিব সম্পর্কে যে পৌরাণিক মহিমা এতকাল প্রচলিত ছিল, তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে। জীবনের জড়তা থেকে মুক্তির দীক্ষা এই অংশে ব্যাক্ত হয়েছে। এখানে কোনো নাটকীয় ঘটনা নেই, লিরিকধর্মিতাই এই অংশে প্রাধান্য লাভ করেছে। ঐশ্বর্যের পূর্ণতা থেকেই যে ত্যাগের দীক্ষা নেওয়া সম্ভব সেই বক্তব্যই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। গতিময়তাই যে জীবনের ধর্ম—তা 'বলাকা'র গতিতত্ত্বের মধ্যে যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি এখানেও। সংলাপ নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সেইজন্য 'কবির দীক্ষা' নিঃসন্দেহে নাটিকা। কাদের মধ্যে এই সংলাপ বিনিময় তা কবি উহ্য রেখেছেন—বোধহয় কবির সঙ্গে তাঁর অন্তরতম সত্তার কথোপকথন। কবি বলেছেন কালিদাস (প্রাচীনতম কবি হিসেবে উল্লিখিত) ছিলেন শৈব তাই কবি মাত্র শৈবধর্মে দীক্ষিত। আর শিবের মন্ত্রশক্তি ভোগে নয় ত্যাগে। তাই মহেশ্বর হয়েও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। শিব নটরাজ—অর্থাৎ নাচ-গান-আনন্দই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, তেমনি কবিদের মূলমন্ত্র নাচ-গানের পালা-আনন্দ-আনন্দরসই তার মূলধন। শিব

ত্রিলোকেশ্বর হয়েও শ্মশানবাসী—দেবাদিদেব মহাদেব হলেও ত্যাগের মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত। যেমন ঝরণা অত্যন্ত জলের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়, তেমনি ত্যাগের মন্ত্রে কবিরা আত্মনিয়োগ করবে। এই ত্যাগের ঘড়াটাকে উপুড় করে দেওয়া নয় বরং পূর্ণতাকে অন্তর থেকে শূন্যতায় রূপান্তরিত করাটাই ত্যাগ। শিবের এই ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে অন্নে-বস্ত্রে। কাজেই ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করার সাধনাতেই হয় মানুষের বরলাভ। আর সেই জন্য শিবভক্ত রাবণের হয় সোনার লঙ্কাপুরী। কিন্তু শিবের বরে যখন লঙ্কাপুরী সোনার হয়, তখন তা পুড়ে ছাই হয় কেন? এ যেন কবির কাছে তাঁর নিজেরই জিজ্ঞাসা। শিবের বরে রাবণের সমৃদ্ধি আবার শিবের অপমানে অর্থাৎ রাবণের ঔদ্ধত্যে নিজের সর্বনাশ। রাবণের জমানো ধনে ঔদ্ধত্য আছে; দাতার ভূমিকা নেই। কবি ইতিমধ্যে য়ুরোপ ভ্রমণ করে এসেছেন—তুলনা দিলেন 'য়ুরোপ খণ্ড'কে শিবের চেলা বলে। নব নব সম্পদে 'ধনে-প্রাণে-জ্ঞানে-মানে তারা মহাসম্পদশালী। এই প্রসঙ্গে লেখক ভারতবর্ষের সঙ্গে তার তুলনা দিতেও ভুললেন না। ভারতবর্ষের সম্পদে অত্যন্ত টান বলে শিবকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়; ভিক্ষা পায় না। য়ুরোপ ধনতান্ত্রিক দিক থেকে অনেক সমৃদ্ধ—জ্ঞানে বিজ্ঞানে অধ্যবসায়ে তারা অনেক সুপরিকল্পিত সমৃদ্ধ জাতি—কবির ভাষায় 'শিবের চেলা'। তবে কবি এখানে সমৃদ্ধির উল্টো দিকটাও দেখিয়েছেন। সমৃদ্ধির নেশা যখন পেয়ে বসে তখনই উল্টোপথে হাঁটে তারা। শিবের স্থান দখল অশিব। ত্যাগের ধন তখন ভোগের ধন হয়ে দাঁড়ায়—যা জোগাড় করতে ধরতে হয় চুরির পথ। অশান্তি বাধে জাতিতে জাতিতে। আর ভারতবর্ষের মানুষ লেখকের মতে অকর্মণ্য—গাফিলতি, কুঁড়েমি তাদের রসাতলে পাঠাচ্ছে। তাই খেতের ফসলের দেখভাল হয় না, শুকিয়ে মরে যায়, পুকুরের জলসম্পদ নিঃশেষিত হয়, দেহে-মনে জমে নানান রোগ-ব্যাধি আর ক্লান্তি, অবসাদ। আর এই অবনমনে বিদেশি রাজারা এসে মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসে। যেদিন শিবের ভিক্ষার ঝুলি আমরা ভরতে পারব সেদিনই আমরাও নিজেরা ভরপুর হয়ে উঠব। গাছে যে ফল ধরে—গাছ দুহাত ভরেই সেই ফল মানুষকে দেয়—মানুষ ফলের রস খেয়ে রসস্থ হয়। এই রসই তো আনন্দ—আনন্দরস। প্রাণের সঙ্গেই তার যোগাযোগ। আর যেখানে রসের অভাব—সেখানে কমণ্ডলুটাও খালি থাকে। বিষকে কাটাবেন বলে শিব বিষপান করেছিলেন। মৃত্যুকে জয় করবেন বলে তিনি শ্মশানচারী। ধনে মানে পূর্ণ মানুষের কাছে তিনি ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আবির্ভূত হন। ঝরণার স্রোতধারায় জল যখন নোংরা হয়ে যায়, তখনই তা হল পঙ্কিল, কলুষিত। তীব্র গতিধারা হয় ম্লান, ক্লান্ত। ধনে মানে গরিব মানুষের কাছে শিব তাই ভিক্ষা চেয়ে যখন খালি হাতে ফিরে যান তখনই তার তৃতীয় নেত্রে আগুন জ্বলে উঠে।

এই ভাবে 'কবির দীক্ষা' নামে সংযোজিত অংশটিতে 'কবির দীক্ষা' কীরকম হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন কবির ত্যাগ ভিক্ষুকের ত্যাগ নয়; পূর্ণতার ত্যাগ। কবির দীক্ষা এখানে প্রলয়ের দীক্ষা নয়—নবজীবনের বাণীবাহকের দীক্ষা। কবির দীক্ষা ত্যাগের দীক্ষাকে ছাড়িয়ে গ্রহণের দীক্ষা হয়ে উঠবে। কবির দীক্ষা নিষ্কাঞ্চন হওয়ার দীক্ষা নয়, সমৃদ্ধশালী হবার দীক্ষা। কবির দীক্ষা তাই মৃত্যুবিলাসের পথ নয়—মৃত্যুঞ্জয়ের দীক্ষা। যেহেতু কবি মাত্রই দার্শনিক, জীবনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বাণীবাহক। তাই 'কবির দীক্ষা' অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অর্থাৎ কবি সম্প্রদায়কে শিবমন্ত্রের পূজারী হবার দীক্ষা দিয়েছেন।

একক-১৫ ❑ নাটকের সংলাপ

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ সংলাপ

১৫.৩ 'কবির দীক্ষা'—সংলাপের শিক্ষা

১৫.৪ প্রশ্নাবলী

১৫.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককে কালের যাত্রা নাটকের সংলাপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এককটির উদ্দেশ্য হল নাটকের সংলাপ উদ্ধৃত করে শিক্ষার্থীকে নাটকটির নাট্য-সংলাপের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া। শিক্ষার্থী কোনো নাটকই সংলাপ ব্যতিরেকে পাঠ করতে পারেন না। নাট্য-সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র ও নাটকের মূল ভাববস্তু দর্শক ও পাঠকের সামনে আসে। এই এককে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারায় 'কালের যাত্রা' নাটকের ভাববস্তুকে যে বুঝতে চাওয়া হয়েছে—তা সম্ভবপর হয়েছে নাট্যসংলাপের যথাযথ বিন্যাসে। এককটির উদ্দেশ্যই হল নাটকটির সংলাপের গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে অবগত করানো।

১৫.২ সংলাপ

নাটকের মধ্যমণি হয়ে আছে সংলাপ। প্রকৃতপক্ষে বলা যেতে পারে, সংলাপ ছাড়া নাটকের কোনো অস্তিত্বই হয় না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে মূকাভিনয়—এও তো একধরনের নাটক বা অভিনয় যেখানে সংলাপবিহীন—শুধু অভিনয়। শারীরিক কলাকৌশল ও অভিব্যক্তি দিয়েই অভিনয় করে বিষয়কে, বক্তব্যকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেটা একটা আলাদা নাট্যকলা। কিন্তু মঞ্চে অভিনীত নাটকের প্রধান অবলম্বন হল সংলাপ। সংলাপের মাধ্যমেই তো অভিনীত বক্তব্য দর্শকের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, সংলাপই নাটকের প্রাণ, সংলাপের মাধ্যমেই নাটক পরিপূর্ণতা লাভ করে।

'কালের যাত্রা' নাটকটিতেও সংলাপের বহুল ব্যবহার আমরা লক্ষ করেছি। নাটকীয় চমক সৃষ্টির মাধ্যমে সংলাপের ব্যবহার করেই নাট্যকার নাটকের সূচনা করেছেন। যেমন 'কালের যাত্রা' নাটকের রথযাত্রার মেলায় মেয়েদের সংলাপ

(প্রথমা)—

''এবার কী হল, ভাই।
উঠেছি কোন ভোরে, তখনও কাক ডাকেনি।
কঙ্কালিতলায় দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল;
রথের দেখা নেই। চাকার নেই শব্দ।''

দ্বিতীয়া

''চারিদিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্ করছে গা।''

তৃতীয়া

''দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে,
কেনাবেচা বন্ধ।....'' ইত্যাদি

সংলাপে ভরপুর এই অংশে নাটকীয়তা টানটান উত্তেজনায় ভরপুর। ফলতঃ কাহিনির শুরুতেই এই উত্তেজনা, এই কৌতূহল ক্রমশ চরমে পৌঁছে যেতে থাকে এবং নাটকের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে নাটকের সংলাপ বাংলা নাটককে ভাষার ঐশ্বর্যে, ভাবের গভীরতায়, গতিময়তায় এক সার্থক নাট্য নিদর্শনে পরিণত করেছে। সংলাপ তো মুখে বলে গেলেই হয় না—তার ভাষা, তার ভাববিন্যাস, ভাবতন্ময়তা সবই প্রকাশিত হতে হয় সংলাপে। সংলাপে চরিত্রের ভাঙাগড়া, চরিত্রের মহিমময় উপস্থিতি, চরিত্রের শ্রেণি, ভাবের আদান-প্রদান এবং সর্বোপরি নাটকের চরিত্র উদ্ঘাটনে, গতিময়তার সঞ্চারে পরিণতির দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে। সে হিসাবে সংলাপেই নাটকের সার্থকতা, চরিত্রের শ্রেণি নির্বাচন সবই জড়িয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকই হোক আর রূপক-সাংকেতিক নাটকই হোক—সংলাপ রচনায় বরাবরই তিনি চরিত্র নির্বাচনের দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন আলোচ্য নাটকে রবীন্দ্রনাথ সংলাপ ব্যবহার করেছেন চরিত্র অনুযায়ী—গ্রামের মেয়েরা যখন রথের মেলায় যাবে বলে এসেছে তখন তাদের কোনো নাম ব্যবহার করেননি। একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণি হিসাবেই তারা চিহ্নিত। তাই তাদের কোনো নাম নেই অর্থাৎ একক প্রাধান্য নেই। তারা প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত। কথার মধ্যে মেয়েলি ধরনটাকে ছাঁচে ফেলে রেখেছেন। 'ভাই', 'এলুম', 'ছম্‌ছম্ করছে গা', পুরুত ঠাকুরের মন্ত্র 'বিড়বিড়' করা, 'গা শিউরে ওঠা'—এরকম প্রায় সংলাপে মেয়েলি ভাষার প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই।—

প্রথমা

''বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—

রথ না চললে কিছুই চলবে না।

চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।"

এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি

তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।"

এরকম হাঁড়ি চড়ানো, বুলবুলির ধান খেয়ে যাওয়া, মেজো ছেলের চাকরি যাওয়া, বউটা জ্বরে শুষছে ইত্যাদি মেয়েলি সংলাপে ভরপুর 'কালের যাত্রা' নাটকটি।

এরপর সন্ন্যাসীর প্রবেশ—সন্ন্যাসী গৃহী মানুষ নন, তপস্বী। তপস্বী মানুষের তপস্যায় উপলব্ধ দার্শনিকতায় তাঁর সংলাপ হয়েছে গভীর, গম্ভীর। নাটকে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উক্তি—

'সর্বনাশ এল।

বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী;

ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।'

—ভবিষ্যদ্রষ্টা এই সন্ন্যাসীর সংলাপে ভয়ংকরতা ফুটে উঠেছে। তাঁর তপস্যাক্লিষ্ট শরীরের মতোই তাঁর উপলব্ধি উচ্চারিত সত্য বড়ই ভয়ংকর—যা শুনে মেয়েদের দলের রথের মেলা দেখা মাথায় ওঠে—'অকল্যাণে'র চিন্তায় তারা শিউরে ওঠে। সন্ন্যাসীর কথায় জগৎ ও জীবনে তথা সভ্যতার অন্তর্দর্শনের কথা ফুটে উঠেছে—

'তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,

কিছুই করনি শোধ,

দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।

তাই নড়ে না আজ আর রথ।'

সন্ন্যাসীর মুখেই শোনা গেল,

'হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।

পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।'

মেয়েরা ভয় পেয়ে রথের দেবতা নয়, দড়ি-দেবতার পুজো আনতে প্রস্থান করল।

মঞ্চে এবার প্রবেশ করল নাগরিকবৃন্দ। এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই ভাবেই তাদের সংলাপ পরিবেশন করেছেন। এখানেও তাদের গোষ্ঠী বা সমবেত জনতা চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কিছু কিছু সংলাপের মধ্যে নাট্যকার সমাজজিজ্ঞাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। জয়ধ্বনি দিতে হয় তো কোনো দড়ি-দেবতার জন্য নয় 'মহাকালনাথে'র জন্য। কিন্তু সাধারণ নাগরিক 'মহাকাল' শব্দটাই ভালো করে জানে না, তারা আবার 'মহাকালনাথ'কে কীভাবে বুঝবে? এখানেও সেই রবীন্দ্রনাথের

কবিতা স্মরণে আসে—'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি/মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।' তাই নাগরিকবৃন্দের বক্তব্য তারা দড়ি-প্রভুকে দেখেছে, কিন্তু মহাকালনাথ? তাকে তো কেউ চেনেই না, দেখেও নি। সন্ন্যাসী তাদের বোঝান—

'কালের পথ হয়েছে দুর্গম।

কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।

করতে হবে সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।'

শেষে সন্ন্যাসী বিদায় নেয় এই কথা বলে—'সরে যাও, সরে যাও, ওর পথ থেকে।'

এরপর হাজির হলেন অনুচরবর্গের সঙ্গে ধনপতি (যিনি তৎকালীন ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতীক)। তারা রথের দড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে। কিন্তু দড়িকে দেবতা বলে মানে না। পুজোও করে না। ধনপতি শেঠেরা শেষপর্যন্ত রাজার ডাক পায় কেননা তিনি শেঠজিকে ডেকে পাঠিয়েছেন রথ চালাবার জন্য। এখানে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত 'শেষের কবিতা'র পংক্তি—'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?' রাজা শুনতে পেয়েছেন, তাই ডাক দিয়েছেন ধনপতি শেঠজিকে। তাদের হাতেই এবার তুলে দিতে হবে সভ্যতার রথের রশি। সৈনিক তাদের কাছে তার হাতের জোর তরোয়াল দেখিয়ে নিজের অহংবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু পারে না। এরপর নর্মদাতীরের বাবাজির প্রসঙ্গ আসে। সে অসাড়, বদ্ধ জীবনের প্রতীক। পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও তিনি চলাফেরা করেননি। দশ জন জোয়ানে মিলে তাকে রথের কাছে নিয়ে এসেও কোনো কাজ হল না, রথের চাকা আরও বসে যেতে লাগল। মন্ত্রী এলেন ধনপতির ডাকে। কিন্তু অন্যসব শক্তি যেখানে অর্থহীন—সেখানেও রথ চলল না, কোষাধ্যক্ষ এলেন 'সিদ্ধিরস্তু' বলে রথ টানলেন, কিন্তু বিফল হন। এরপর মেয়েদের দল এল—উচ্চারণ করল সেই বাক্য, যা আধুনিক যুগেও বীজমন্ত্র হয়ে রয়েছে—'কলিকালে ভক্তি নেই যে'। আবার তিনকড়ির মায়ের সংলাপে মেয়েলি ভাষা ও বাক্যবিন্যাস (সংলাপ) ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে অন্ধবিশ্বাসের মেয়েলিপনা। সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ের ক্রিয়াকলাপে কীভাবে প্রভুর টনক নড়বে তারই জল্পনা-কল্পনা। এখানে মেয়েলি অন্ধবিশ্বাসেরই জয়জয়কার। মন্ত্রীমশাই আবার ফিরে আসেন। শূদ্রপাড়ায় গোল বেঁধেছে—ওরা সবাই দলে দলে ছুটে আসছে। এরকম ভাবেই সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত ধরা পড়েছে মন্ত্রীমশাইয়ের সংলাপে—'নীচের তলাটা হঠাৎ ওপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়।' এই প্রলয়ের বাহন হল শূদ্র সম্প্রদায়। যারা এতদিন নীচের তলার অধিবাসী বলে অপাংক্তেয়, অচ্ছুৎ বলে অবজ্ঞার অন্ধকারে পড়ে ছিল তারাই এখন জেগে উঠেছে—সমাজের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে। শূদ্রদের দলপতি এসে জানায়—'আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে। কেননা এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রথের রশি ধরতে।' তাই রথে টান দেবার জন্য তারা দলে দলে ছুটে আসছে বাবার ডাকে সাড়া দিয়ে। শুধু তাই নয়, দলপতির সংলাপে সভ্যতার মোড় ঘুরে যাওয়ার ইঙ্গিতটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—'আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ; আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।' সৈনিক অবাক হয়ে ভাবে—'তোমরাই আমাদের

অন্নবস্ত্রের মালিক।' দলপতি তখন আহ্বানবাণী শোনায়—'আয়রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।' ওদিকে পুরোহিত আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে—'ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি, ছুঁলো শেষে, রশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা।' আসলে সভ্যতার অগ্রগতি নির্ভর করে না জাতপাতের ওপর। যারাই শক্তিমান তাদের হাতে পড়ে দেশ চালানোর ভার বা রথের রশি। বাধা প্রতিবন্ধকতা আসবেই, তার প্রতীক হিসেবে পুরোহিত, সৈনিক, মন্ত্রী তাদের নানা সংলাপে তা প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের শেষে দেখা যায় একজন কবির আবির্ভাব ঘটেছে। যাকে সৈনিক দেখার পরেই জিজ্ঞাসা করেছে পুরোহিতকে, যে 'ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা—শাস্ত্র জানে কি?' কিন্তু কবি তো ত্রিকালদর্শী তাই তাঁর সংলাপে উঠে আসে জীবনদর্শন—'মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে বাঁধন তাকে ওরা মানেনি। রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।'

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংলাপ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সাধারণ নাটকের সংলাপ সরাসরি দর্শকের মনে বা পাঠকের মনে গিয়ে আঘাত করে, প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংলাপ একটু গুরুগম্ভীর, কখনও রসিকতাময়—কিন্তু তাতে সংলাপের কোনো হানি হয় না। বরং সংলাপের অন্তরালে প্রবহমান যে বক্তব্য তা সহজে ধরা পড়তে চায় না। একটু নিদর্শন দেওয়া যাক—

ক. 'রথ যাত্রায় কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারেনি সে পৌঁছতে'

খ. 'আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।'

গ. 'যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিকে যায় তাই নিয়েই সৃষ্টি হয় নবযুগের।'

ঘ. 'পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি।
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা।'

ঙ. 'তারপর কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।'

উপরের এই পাঁচটি সংলাপের উদাহরণে আমরা লক্ষ করি যে, উক্ত সংলাপগুলি শুধু বলা নয়, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটিও বুঝে নিতে হয়। অর্থাৎ শব্দার্থ, নিহিতার্থ দুটিই যেন সংলাপের মধ্যে একটা আড়াল তৈরি করে যা, রূপক-সাংকেতিক নাটকের গূঢ় তাৎপর্যকেই ব্যঞ্জিত করে।

১৫.৩ 'কবির দীক্ষা'—সংলাপের শিক্ষা

'কবির দীক্ষা' অংশটি 'কালের যাত্রা' নাটকটির সংযোজিত অংশ। এই অংশটি মাত্র ৫টি পাতার সংযোজন। এখানে কাল্পনিক দুটি চরিত্রের পারস্পরিক তত্ত্ব বিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক নয় বরং বলা যেতে পারে ছোট্ট একটি নাটিকা। কিন্তু নাটিকাটির সংলাপ বিনিময় কোন চরিত্র দুটির মধ্যে হচ্ছে তা এখানে উহ্য। তবে কবি চরিত্র বলে যে একজন আছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই কবিটিকে ঘিরেই সংলাপ বিনিময়। এই সংলাপের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে লিরিকধর্মিতা। গতিতত্ত্বের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বসংসার তার নিজের নিয়মে বয়ে চলেছে—তারই এক তত্ত্ব কবি খুঁজে পেয়েছেন শিবমন্ত্রে। এই শিবমন্ত্রের দীক্ষা দেন তত্ত্বানন্দস্বামী; যে মন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্য প্রলয় সাধনা। আদিকবি কালিদাস ছিলেন শৈব—তাই কবিমাত্রই শৈব—এই যুক্তিতেই কবি শিবমন্ত্রের নব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেহেতু লিরিকধর্মিতাই 'কবির দীক্ষা'র শৈলী, তাই এই নাটিকাটি তত্ত্বনাটিকা এবং এই তত্ত্বনাটিকাতে শিবমন্ত্রের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেভাবে সংলাপ আদানপ্রদানে একটি নাটক এগিয়ে যায়। এখানে সেই প্রচলিত ব্যবহৃত সংলাপ উল্লেখযোগ্যভাবে ফুটে ওঠেনি। বরং এটি কাল্পনিক দুটি চরিত্রের মুখে বিবৃতিমূলক বিবরণধর্মী কথাবার্তা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত নাটকের মতো সংলাপ ব্যবহৃত হয়নি; চরিত্রের বিকাশেও কোনো সহায়তা দান করেনি। তাই রচনাটিকে নাটক বলে আখ্যা না দিয়ে বিবৃতিমূলক রচনা বলেই গ্রহণ করা উচিত।

১৫.৪ প্রশ্নাবলী

১. রবীন্দ্র কাব্য-নাট্যজীবনে রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির তাৎপর্য আলোচনা করুন।

২. রূপক ও সাংকেতিক নাটকের সংজ্ঞা লেখ। সেই নিরিখে রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটকটির শ্রেণিবিচার করুন।

৩. 'কালের যাত্রা' নাটকটির কাহিনি বিবৃত কর এবং সেইসঙ্গে নাটকের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৪. 'কালের যাত্রা' নাটকটির দুটি অংশের নাম লেখ। শেষ অংশটির সংযোজনার সার্থকতা বিচার করুন।

৫. 'কালের যাত্রা' নাটকের চরিত্রগুলির শ্রেণিবিভাগ কর এবং আলোচনা প্রসঙ্গে চরিত্রগুলির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

৬. 'রথের রশি' নামকরণটির সার্থকতা আলোচনা করুন।

৭. 'একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।'—এটি কার উক্তি? কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হয়েছে? উক্তিটির সার্থকতা বিচার করুন।

৮. ‘রথের রশি’ নাটকে পুরোহিত ও সন্ন্যাসী চরিত্রদুটি কতটা সুপ্রযুক্ত হয়েছে তা আলোচনা করে দেখান।

৯. ‘কালের যাত্রা’ নাটকটিতে জনতা চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

১০. ‘রথের রশি’ নাটকে কবি চরিত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

১১. ‘কবির দীক্ষা’ অংশটি সংযোজনার সার্থকতা আলোচনা করুন।

১২. ‘কবির দীক্ষা’ অংশটি কী ধরনের সংযোজনা। এটি কী ‘কালের যাত্রা’ নাটকের পরিশেষ?— আলোচনা করুন।

১৩. ‘কবির দীক্ষা’ অংশটিতে কোন দীক্ষার কথা বলা হয়েছে? প্রসঙ্গ বিবৃত করে তা আলোচনা করুন।

১৫.৫ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. *কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ* : শঙ্খ ঘোষ

২. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ

৩. *রবীন্দ্র জীবনী : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়,* ২য় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ

৪. *রবীন্দ্র-সঙ্গ প্রসঙ্গ* : বিপিনবিহারী গুপ্ত, সম্পাদনা: দীপান্বিতা সেন

৫. *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ* : নেপাল মজুমদার

৬. *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা* : নীহাররঞ্জন রায়

৭. *রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব* : অরবিন্দ পোদ্দার

৮. *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস,* ২য় খণ্ড : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৯. *রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটক/নব সমীক্ষা* : হিতেন্দ্র মিত্র

১০. *রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা* : ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য

১১. *রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক* : শ্রী কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

জেনেরিক ইলেকটিভ কোর্স : ০৪

মডিউল : ৪

বর্তমান ভারত

একক-১৬ ❑ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 'বর্তমান ভারত'

গঠন

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও গদ্যরচনা

১৬.২খ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত ভাবনার প্রেক্ষাপট

১৬.৩ গ্রন্থ পরিচিতি ও প্রকাশনা তথ্য

১৬.৪ মূলপাঠ

১৬.৫ 'বর্তমান ভারত'-এর আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচী

১৬.৬ সংক্ষিপ্তসার

১৬.৭ অনুশীলনী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য পাঠ্য হিসেবে 'বর্তমান ভারত'-এর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং একই সঙ্গে এই রচনাটির প্রকাশ ও আলোচ্য বিষয়বস্তু নিয়ে প্রাথমিক ধারণা স্বচ্ছ করা। উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম পর্বে বাংলায় রচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের ভিড়ে যে সব কারণে 'বর্তমান ভারত' বিশেষ মনোযোগ দাবী করে সেগুলি হল-

১. পাঠ্য প্রবন্ধটির নাম 'বর্তমান ভারত'। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এখানে তাঁর সমকালের ভারতের কথা বলতে গিয়ে বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস আগাগোড়া উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে।

২. ইতিহাস রচনার সময়ে ঐতিহাসিকেরা কম বেশি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিকেই অনুসরণ করেন। তাঁদের আগে থেকে তৈরি-হওয়া ধারণা, বিশ্বাস ও বক্তব্য মিশে যায় লিখিত ইতিহাসের পাতায় পাতায়। স্বামী বিবেকানন্দের আগে বাঙালিরা অনেকেই ছাত্রপাঠ্য এবং মূল ধারার ইতিহাসের বই লিখেছিলেন। সবাই যে ইংরেজের উপনিবেশবাদের সমর্থন করেছিলেন, এমনটা নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ইতিহাস রচনার কৌশল কম বেশি সকলেই অনুসরণ করেছিলেন। স্বামীজী 'বর্তমান ভারত' রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও ইউরোপীয় দর্শনের প্রশিক্ষণকে কাজে লাগালেও ভারতীয় সমাজ কাঠামোর নিজস্ব গড়নকে তিনিই সর্বপ্রথম সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আনুপূর্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলেন এই লেখায়।

৩. এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের চিরাচরিত বর্ণব্যবস্থাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। সমাজ ও ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে 'শূদ্র জাগরণ'-এর যে তত্ত্বটি এখানে আলোচিত হয়েছে তা নতুন ও তাৎপর্যপূর্ণ।

৪. দেশকে ভালোবাসা ও সম্মান করার যে অভ্যাস সমষ্টিগত স্তরে এক বিশেষ রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দেয়, যাকে বলা হয় জাতীয়তাবাদ, স্বামীজী তার এক বিশেষ চরিত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। 'বর্তমান ভারত'-এ সেই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ এই বইটিকে পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের কাছে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছিল।

৫. কেউ কেউ বলেন, উত্তরকালের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস ছিল 'বর্তমান ভারত'। কাজেই এই রচনাটি পড়লে শুধু যে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত ইতিহাস-জিজ্ঞাসা সম্পর্কে জানা যাবে তাই-ই নয় একটা যুগের ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার হদিশও পাওয়া যাবে।

৬. সর্বকালের সেরা ভারতীয় বাগ্মী হিসেবে বিবেকানন্দ কীভাবে বাংলা ভাষা ও রচনার কৌশলকে ব্যবহার করেন তা-ও জানবার উপায় 'বর্তমান ভারত' পাঠ।

১৬.২ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও গদ্যরচনা

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকাল মাত্র ঊনচল্লিশ বছরের। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই পর্যন্ত এই অনতিদীর্ঘ জীবনে যে বিপুল কর্মপ্রবাহ, পর্যটন, বক্তৃতা ও সাংগঠনিক কাজে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন তার মধ্যে লেখালেখির অবসর খুব বেশি ছিল না। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অসামান্য দক্ষতা ছিল স্বামীজীর। প্রয়োজনে আয়ত্তাধীন যে-কোনো ভাষাতেই বক্তৃতার কাজে নির্ভীক ও আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য স্বামী বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের ভূমি। ভারতবর্ষের চিরায়ত বাণীকে পাশ্চাত্যের জিজ্ঞাসু মনের কাছে পৌঁছে দিতে গিয়েই বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর বিখ্যাত হয়ে ওঠা। একারণে তাঁর রচনার সিংহভাগই ইংরেজি ভাষায় রচিত। সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন কিছু ধ্বনিগাম্ভীর্যময় স্তোত্র। তাঁর বাংলা রচনাগুলি ১৮৯৩ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত। প্রাথমিকভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই লেখাগুলি তাঁর দেহাবসানের পর নানা পর্বে সংকলিত হয়। প্রকাশকালের ক্রম অনুসারে স্বামীজীর বাংলা গদ্য রচনা সংকলনসমূহের তালিকা এই রকম—'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২), 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫), 'পরিব্রাজক' (১৯০৬), 'ভাববার কথা' (১৯০৭) ও 'পত্রাবলী' (১৯০৫ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত)।

গদ্য রচনার শৈলী ও বাংলা রচনার ভাষা বিষয়ে বিবেকানন্দের নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ ছিল যেগুলি পরবর্তীকালে বিশেষজ্ঞগণ যথাযথ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কৃতিত্ব মূলত সিরিয়াস গদ্য রচনায় চলিত ভাষা ও স্বরের প্রয়োগে। যদিও 'বর্তমান ভারত' শুদ্ধ সংস্কৃতানুসারী বাংলা সাধু গদ্যে লেখা, বাগ্মী বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বরের প্রত্যক্ষতা সাধুরীতির সম্ভাব্য মন্থর একঘেয়েমি থেকে একে মুক্ত রেখেছে।

১৬.২খ স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত ভাবনার প্রেক্ষাপট

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের স্বামী বিবেকানন্দ, চেয়েছিলেন জগতের হিতসাধন করতে, মানুষের আশ্রয় হয়ে উঠতে। তাঁর মৌলিক দায়বদ্ধতা ছিল ভারতবাসীর কাছে, যে-ভারতবাসী ব্রিটিশের সর্বব্যাপী আগ্রাসনে নিজেদের বিকাশে ও প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন নয়। ১৮৯৩ এর ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় ভারতের হয়ে জগৎজয়ের পরে স্বামীজী বিশেষভাবে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি নিয়ে চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। বিবেকানন্দ-বিশেষজ্ঞগণ বলেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর শ্রীমতী মেরি হেলকে স্বামীজী যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁর ভারত-বিষয়ক ভাবনার প্রথম সুসমন্বিত প্রকাশ লক্ষ করা যায়। 'বর্তমান ভারত'—এ ওই ভাবনার সূত্রগুলিই বিস্তারের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 'পরিব্রাজক' (১৮৯৯) ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৯০২) বইয়ের লেখাগুলিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্পর্কে স্বামীজী যা লিখেছেন তার দার্শনিক রূপায়ণ সম্পূর্ণ হয়েছিল 'বর্তমান ভারত'-এর মধ্যেই।

ভারতবর্ষ—দেশ ও সভ্যতা হিসেবে, সংস্কৃতির আদি পীঠরূপে আলোচনার পরিসরে আসতে শুরু করে মূলত পাশ্চাত্যের প্রাচ্যসভ্যতা-বিশারদ ভাষাবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের উদ্যোগে। আঠারো শতকের শেষ দিকে এই আলোচনার সূত্রপাত হলেও ভারতীয় শিক্ষিতজনতা এই স্তরের আলোচনার পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে আরো পরে, মোটামুটি উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে। স্বামীজীর আগে যে সব বাঙালি গুণিজন ভারতবর্ষকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক একক ভূ-সত্তা রূপে দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিদগ্ধজন। বিবেকানন্দর চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত-চর্চার ধারায় প্রবেশ করেছিলেন প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় আগে। এঁদের নাম একাদিক্রমে উচ্চারিত হলেও ভারত-ভাবনায় এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পরের ক্ষেত্র ও দর্শন অনুসারে আলাদা। ইতিহাসের সুর অবশ্য এঁদের প্রায় সকলের রচনাতেই লভ্য। তবে ইতিহাসও একইভাবে আসেনি সকলের রচনায়। কিন্তু সকলেই চেয়েছেন দেশের উন্নতি ও অন্ধকার-মুক্তি। কেউ কেউ সরাসরি গেছেন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব-চর্চার পথে দেশের গৌরবের অতীতকে খোঁজবার কাজে। কেউ কেউ ভারতবর্ষে ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়ে নতুন যুগের ভারতবাসীর কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বর্তমানকে অনুবীক্ষণের তলে এনে পর্যালোচনা করার কাজটা 'বর্তমান ভারত' প্রকাশের বেশ অনেকটা আগে থেকেই জারি ছিল।

> **ভারতভাবনা বা ভারতচেতনা কী?**
> ভারতভাবনা বা ভারতচেতনা হল ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের মনে জেগে-ওঠা ভারতবর্ষের অস্তিত্ব, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা। এটি নিছক তথ্যের জ্ঞান থেকে জেগে ওঠে না। এই চেতনাটি চরিত্রগতভাবে দার্শনিক। এই ভাবনায় ভারত একটি মাটিতে গড়া দেশ মাত্র নয়—একটি বয়ে-চলা সংস্কৃতির অন্য নাম।

স্বামী বিবেকানন্দ এই ধারার চিন্তক হলেও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শের অনন্যতা তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্পর্কিত ভাবনাকে বহুমুখী নতুন মাত্রা দিয়েছিল। 'বর্তমান ভারত'-এর সার্বিক অভ্যুদয়ের পথসন্ধান করতে গিয়ে অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন তিনি। অতীতকে নিয়েই মগ্ন থাকা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। দক্ষ সমাজ-বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকের মতো তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সমাজ পরিবর্তনের নিজস্ব সূত্রগুলিকে। ইতিহাস থেকেই তিনি বর্তমান ভারতের সমস্যা ও ব্যাধির সমাধান ও প্রতিষেধক খুঁজে নিতে চেয়েছেন। কাজেই 'বর্তমান ভারত'—এ নিছক ইতিহাসচর্চা রচয়িতার লক্ষ্য নয়, বরং তাঁর উপায়।

স্বামীজীর পূর্বসুরী যাঁরা স্বদেশচর্চার সুবাদে সমকালীন দেশবাসীর অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁদের অনেকেই দেশবাসীর ইংরেজ স্তুতি ও ইংরেজ-অনুকরণ নিয়ে সমালোচনা করেছেন, কখনো বা তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত হেনেছেন। স্বামীজী 'নব্যভারত'-এর প্রসঙ্গে এই পরানুকরণের উপশমকারী ওষুধ আবিষ্কার করেছেন প্রাচীন ভারতের জীবন ও বাণীর মধ্যে। ব্যঙ্গ বা সমালোচনার পথে নয় ইতিহাসের উদাত্ত জাগরণ মন্ত্র শুনিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের ঋষির ভঙ্গিতেই দেশবাসীকে তাদের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছেন। কাজেই উনিশ শতকে বাংলা গদ্যে ভারতচর্চার ধারায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষত্ব এখানেই যে তিনি শুধু ঐতিহাসিক ও সমাজ-সমালোচকের মতো বিশ্লেষণ করেননি এবং বিরক্তি প্রকাশ করেননি। বিবেকানন্দ প্রকৃত অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীর মতো জাতির ইতিহাসে অন্তরাত্মার আবহমান বাণী শুনিয়েছেন তাঁর সমকালীন ভারতবাসীকে।

বিখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মনে করেন, ভারতের আত্মমর্যাদার পুনরুদ্ধারে বিবেকানন্দর চেয়ে বড় ভুমিকা কারো নেই। তিনি যত না সুনির্দিষ্ট কোনো সংস্কার করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি করেছেন জাতির ধারণালোক পরিবর্তনের কাজ, যা সংস্কারকে গ্রহণযোগ্য করেছিল। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিতজনের মানসিক গঠনের বদল শুধু কিছু শূন্যগর্ভ আশ্বাসে সম্ভব হয় না, এমনকি ব্যঙ্গের কশাঘাতেও হয় না। বিবেকানন্দ যুক্তির ধাপ অতিক্রম করে করে।

১৬.৩ গ্রন্থ পরিচিতিও প্রকাশনা তথ্য

'বর্তমান ভারত' পুস্তিকাটি উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। আলোচ্য পাঠ্যটি সম্পর্কে যে-তথ্যগুলো জানা বিশেষভাবে জরুরি সেগুলি হল :

১. প্রাথমিকভাবে, এটি বই আকারে লিখিত হয়নি। এখন যে-'বর্তমান ভারত' বইটি সহজলভ্য তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত গদ্য রচনার সংকলিত রূপ।

২. স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর প্রথম বর্ষের (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০৬-০৭) সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যায় 'বর্তমান ভারত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

৩. বই আকারে প্রকাশের সময় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সাধারণ সম্পাদক তথা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা সুপণ্ডিত স্বামী সারদানন্দ-লিখিত একটি 'ভূমিকা' শুরুতে সংযোজিত হয়।

৪. গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশের সময় এই রচনাটি একটানা গদ্যেই ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীতে পাঠকের সুবিধার কথা ভেবে এতে অনুচ্ছেদের সঙ্গে বিষয় সংক্ষেপ উপশিরোনাম হিসেবে যুক্ত হয়।

১৬.৪ মূলপাঠ

বৈদিক পুরোহিতের শক্তি

বৈদিক পুরোহিত মন্ত্রবলে বলীয়ান, দেবগণ তাঁহার মন্ত্রবলে আহূত হইয়া পান-ভোজন গ্রহণ করেন ও যজমানকে অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। ইহলৌকিক মঙ্গলের কামনায় প্রজাবর্গ, রাজন্যবর্গও তাঁহার দ্বারস্থ। রাজা সোম[১] পুরোহিতের উপাস্য, বরদ ও মন্ত্রপুষ্ট; আহুতিগ্রহণেপ্সু দেবগণ কাজেই পুরোহিতের উপর সদয়; দৈববলের উপর মানব-বল কি করিতে পারে? মানব-বলের কেন্দ্রীভূত রাজাও পুরোহিতবর্গের অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টিই যথেষ্ট সাহায্য; তাঁহাদের আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কর; কখন বিভীষিকা-সংকুল আদেশ, কখন সহৃদয় মন্ত্রণা, কখন কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে। সকলের উপর ভয়—পিতৃপুরুষদিগের নাম, নিজের যশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন। মহাতেজস্বী, জীবদ্দশায় অতি কীর্তিমান্, প্রজাবর্গের পিতৃমাতৃস্থানীয় হউকনা না কেন, মহাসমুদ্রে শিশিরবিন্দুপাতের ন্যায় কালসমুদ্রে তাঁহার যশঃসূর্য চিরদিন অস্তমিত; কেবল মহাসত্রানুষ্ঠায়ী, অশ্বমেধযাজী, বর্ষার বারিদের ন্যায় পুরোহিতগণের উপর অজস্র-ধন-বর্ষণকারী রাজগণের নামই পুরোহিতপ্রসাদে জাজ্বল্যমান। দেবগণের প্রিয়, প্রিয়দর্শী ধর্মাশোক ব্রাহ্মণ্য-জগতে নাম-মাত্র-শেষ; পারীক্ষিত জনমেজয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার চিরপরিচিত।

রাজা ও প্রজার শক্তি

রাজ্য-রক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত রাজরবি প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন। বৈশ্যেরা রাজার খাদ্য, তাঁহার দুগ্ধবতী গাভী।

কর-গ্রহণে, রাজ্য-রক্ষায় প্রজাবর্গের মতামতের বিশেষ অপেক্ষা নাই— হিন্দুজগতেও নাই, বৌদ্ধজগতেও তদ্রূপ। যদিও যুধিষ্ঠির বারণাবতে বৈশ্য-শূদ্রেরও গৃহে পদার্পণ করিতেছেন, প্রজারা রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিতেছে, সীতার বনবাসের জন্য গোপনে মন্ত্রণা করিতেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে

রাজ্যের প্রথা-স্বরূপ, প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনও জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই; সে কৌশলেরও সম্পূর্ণ অভাব, যাহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একীভূত হইয়া প্রচণ্ড বল সংগ্রহ করে।

নিয়মের [যে] অভাব—তাহাও নহে; নিয়ম আছে, প্রণালী আছে, নির্ধারিত অংশ আছে, কর-সংগ্রহ ও সৈন্যচালনা বা বিচার-সম্পাদন বা দণ্ড-পুরস্কার সকল বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম আছে, কিন্তু তাহার মূলে ঋষির আদেশ, দৈবশক্তি, ঈশ্বরাবেশ। তাহার স্থিতিস্থাপকত্ব একেবারেই নাই বলিলেই হয় এবং তাহাতে প্রজাবর্গের সাধারণ মঙ্গলকর কার্য-সাধনোদ্দেশে সহমতি হইবার বা সমবেত বুদ্ধিযোগে রাজগৃহীত প্রজার ধনে সাধারণ স্বত্ববুদ্ধি ও তাহার আয়-ব্যয়-নিয়মনের শক্তিলাভেচ্ছার কোন শিক্ষার সম্ভাবনা নাই।

আবার ঐ সকল নির্দেশ—পুস্তকে। পুস্তকাবদ্ধ নিয়ম ও তাহার কার্য-পরিণতি, এ দুয়ের মধ্যে দূর—অনেক। একজন রামচন্দ্র শত শত অগ্নিবর্ণের[২] পরে জন্মগ্রহণ করেন! চণ্ডাশোকত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকত্ব[৩]—অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজারক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।

হউন যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্র বা ধর্মাশোক বা আকবর, পরে যাহার মুখে সর্বদা অন্ন তুলিয়া দেয়, তাহার ক্রমে নিজের অন্ন উঠাইয়া খাইবার শক্তি লোপ পায়। সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূর্তি কখনও হয় না। সর্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখন স্বায়ত্তশাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্বীর্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত' 'রক্ষিত'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলেসর্বনাশের মূল।

স্বায়ত্তশাসন

মহাপুরুষদিগের অলৌকিক প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন শাস্ত্রশাসিত সমাজের শাসন রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, মূর্খ, বিদ্বান—সকলের উপর অব্যাহত হওয়া অন্ততঃ বিচারসিদ্ধ, কিন্তু কার্যে কতদূর হইয়াছে বা হয়, পূর্বেই বলা হইয়াছে। শাসিতগণের শাসনকার্যে অনুমতি—যাহা আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের মূলমন্ত্র এবং যাহার শেষ বাণী আমেরিকার শাসনপদ্ধতি-পত্রে অতি উচ্চরবে ঘোষিত হইয়াছে, 'এ দেশে প্রজাদিগের শাসন প্রজাদিগের দ্বারা এবং প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত হইবে', [তাহা] যে একেবারেই ভারতবর্ষে ছিল না তাহাও নহে। যবন[১] পরিব্রাজকেরা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখিয়াছিলেন, বৌদ্ধদিগের গ্রন্থেও স্থলে স্থলে নিদর্শন পাওয়া যায়, এবং প্রকৃতি[২] দ্বারা অনুমোদিত শাসনপদ্ধতির বীজ যে নিশ্চিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতে বর্তমান ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সে বীজ যে স্থানে উপ্ত হইয়াছিল, অঙ্কুর সেথায় উদ্গত হইল না; এ ভাব ঐ গ্রাম্য পঞ্চায়েত ভিন্ন সমাজমধ্যে কখনও সম্প্রসারিত হয় নাই।

ধর্মসমাজে ত্যাগীদের মধ্যে, বৌদ্ধ যতিগণের মঠে ঐ স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী বিশেষরূপে পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন যথেষ্ট আছে এবং অদ্যাপি নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে 'পঞ্চে'র ক্ষমতা ও সম্মান, প্রত্যেক নাগার সম্প্রদায়মধ্যে অধিকার ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সমবায়-শক্তির কার্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বৌদ্ধবিপ্লব ও তাহার ফল

বৌদ্ধোপপ্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ।

বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী; মঠাশ্রয়, উদাসীন। 'শাপেন চাপেন বা'[৩] রাজকুলকে পদানত করিয়া রাখিতে তাঁহাদের উৎসাহ বা ইচ্ছা নাই। থাকিলেও আহুতিভোজী দেবকূলের অবনতির সহিত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাও নিম্নাভিমুখী; কত শত ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত নরদেবের চরণে প্রণত এবং এই বুদ্ধত্বে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার।

বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাড়্‌গণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখন ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই, এ যুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্ম ও রাজপুতাদি জাতির অভ্যুত্থান। ইহাদের হস্তে ভারতের রাজদণ্ড পুনর্বার অখণ্ড প্রতাপ হইতে বিচ্যুত হইয়া শতখণ্ড হইয়া যায়। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যশক্তির পুনরভ্যুত্থান রাজশক্তির সহিত সহকারিভাবে উদ্যুক্ত হইয়াছিল।

এ বিপ্লবে—বৈদিক কাল হইতে আরব্ধ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ-বিপ্লবে বিরাটরূপে স্ফুটীকৃত পুরোহিতশক্তি ও রাজশক্তির যে চিরন্তন বিবাদ, তাহা মিটিয়া গিয়াছে। এখন এ দুই মহাবল পরস্পর সহায়ক, কিন্তু সে মহিমান্বিত ক্ষাত্রবীর্যও নাই, ব্রহ্মবীর্যও লুপ্ত। পরস্পরের স্বার্থের সহায়, বিপক্ষ পক্ষের সমূল উৎকাষণ[৪], বৌদ্ধবংশের সমূলে নিধন ইত্যাদি কার্যে ক্ষয়িতবীর্য এ নূতন শক্তিসঙ্গম নানাভাবে বিভক্ত হইয়া, প্রায় গতপ্রাণ হইয়া পড়িল, শোণিত-শোষণ, বৈর-নির্যাতন, ধনহরণাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত হইয়া, পূর্ব রাজন্যবর্গের রাজসূয়াদি যজ্ঞের হাস্যোদ্দীপক অভিনয়ের অঙ্কপাতমাত্র করিয়া, ভাটচারণাদি-চাটুকার-শৃঙ্খলিত-পদ ও মন্ত্রতন্ত্রের মহাবাগজাল-জড়িত হইয়া পশ্চিমদেশাগত মুসলমান ব্যাধনিচয়ের সুলভ মৃগয়ায় পরিণত হইল।

মুসলমান অধিকার

মুসলমান-রাজত্বে অপরদিকে পৌরোহিত্যশক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। হজরত মহম্মদ সর্বতোভাবে ঐ শক্তির বিপক্ষে ছিলেন এবং যথাসম্ভব ঐ শক্তির একান্ত বিনাশের জন্য নিয়মাদি করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান-রাজত্বে রাজাই স্বয়ং প্রধান পুরোহিত; তিনিই ধর্মগুরু; এবং সম্রাট হইলে [তিনি] প্রায়ই সমস্ত মুসলমান জগতের নেতা হইবার আশা রাখেন। য়াহুদী[১] বা ঈশাহী[২] মুসলমানের নিকট সম্যক্ ঘৃণ্য নহে, তাহারা অল্পবিশ্বাসী মাত্র; কিন্তু কাফের[৩] মূর্তিপূজাকারী হিন্দু এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী। সেই কাফেরের ধর্মগুরুদিগকে—পুরোহিতবর্গকে—দয়া করিয়া কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিতে

আজ্ঞামাত্র মুসলমান রাজা দিতে পারেন, তাহাও কখন কখন; নতুবা রাজার ধর্মানুরাগ একটু বৃদ্ধি হইলেই কাফের হত্যারূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন!

এক দিকে রাজশক্তি ভিন্নধর্মী ভিন্নাচারী প্রবল রাজগণে সঞ্চারিত; অপর দিকে পৌরোহিত্যশক্তি সমাজ-শাসনাধিকার হইতে সর্বতোভাবে বিচ্যুত। মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের স্থানে কোরানোক্ত দণ্ডনীতি, সংস্কৃত ভাষার স্থানে পারসী আরবী। সংস্কৃত ভাষা বিজিত ঘৃণিত হিন্দুদের ধর্মমাত্র-প্রয়োজন রহিল, অতএব পুরোহিতের হস্তে যথাকথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতে লাগিল, আর ব্রাহ্মণ্যশক্তি বিবাহাদি রীতিনীতি-পরিচালনেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে রহিল, তাহাও যতক্ষণ মুসলমান রাজার দয়া।

বৈদিক ও তাহার সন্নিহিত উত্তরকালে পৌরোহিত্যশক্তির পেষণে রাজশক্তির স্ফূর্তি হয় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা দেখিয়াছি। বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের বিনাশ ও মুসলমান সাম্রাজ্য-স্থাপন—এই দুই কালের মধ্যে রাজপুত জাতির দ্বারা রাজশক্তির পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা যে বিফল হইয়াছিল, তাহারও কারণ পৌরোহিত্যশক্তির নবজীবনের চেষ্টা।

পদদলিত-পৌরোহিত্যশক্তি মুসলমান রাজা বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, আন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি[৪] সম্রাড়্বর্গের গৌরবশ্রী পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের ভারতাধিকার

এই প্রকারে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর, রাজশক্তির শেষ জয়—ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের নামে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারত-আকাশে প্রতিধ্বনিত হইল। কিন্তু এই যুগের শেষভাগে ধীরে ধীরে একটি অভিনব শক্তি ভারত-সংসারে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

এ শক্তি এত নূতন, ইহার জন্ম-কর্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্ধর্ষ যে, এখনও অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি। আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধনধান্যপূর্ণ ভারতের বিশাল ক্ষেত্র প্রবল বিদেশীর অধিকারস্পৃহা উদ্দীপিত করিয়াছে। বারংবার ভারতবাসী বিজাতির পদদলিত হইয়াছে। তবে ইংলণ্ডের ভারতাধিকার-রূপ বিজয়-ব্যাপারকে এত অভিনব বলি কেন?

অধ্যাত্মবলে মন্ত্রবলে শাস্ত্রবলে বলীয়ান্, শাপাস্ত্র, সংসারস্পৃহাশূন্য তপস্বীর ভ্রূকুটি-সম্মুখে দুর্ধর্ষ রাজশক্তিকে কম্পান্বিত হইতে ভারতবাসী চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে। সৈন্যসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্য ও একাধিপত্যের সম্মুখে প্রজাকুল—সিংহের সম্মুখে অজাযূথের ন্যায়, নিঃশব্দে আজ্ঞাবহন করে, তাহাও দেখিয়াছে; কিন্তু যে বৈশ্যকুল—রাজগণের কথা দূরে থাকুক, রাজকুটুম্বগণের কাহারও সম্মুখে মহাধনশালী হইয়াও সর্বদা বদ্ধহস্ত ও ভয়ত্রস্ত,—মুষ্টিমেয় সেই বৈশ্য একত্রিত হইয়া ব্যাপার-অনুরোধে[১] নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল বুদ্ধি ও অর্থবলে ধীরে ধীরে চিরপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান

রাজগণকে আপনাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা করিয়া ফেলিবে, শুধু তাহাই নহে, স্বদেশীয় রাজন্যগণকেও অর্থবলে আপনাদের ভৃত্যত্ব স্বীকার করাইয়া তাঁহাদের শৌর্যবীর্য ও বিদ্যাবলকে নিজেদের ধনাগমের প্রবল যন্ত্র করিয়া লইবে, ও যে দেশের মহাকবির অলৌকিক তুলিকায় উন্মেষিত, গর্বিত লর্ড একজন সাধারণ ব্যক্তিকে বলিতেছেন, 'পামর, রাজসামন্তের পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে সাহস করিস',—অচিরকাল মধ্যে ঐ দেশের প্রবল সামন্তবর্গের উত্তরাধিকারীরা যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক বণিকসম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়া মানবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান ভাবিবে, [ইহা] ভারতবাসী কখনও দেখে নাই!!

বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতেই সকল সভ্য সমাজে বিদ্যমান আছে। কালপ্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চাতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।

চীন, সুমের,[২] বাবিল,[৩] মিসরি, খল্‌দে,[৪] আর্য, ইরানি,[৫] য়াহুদী, আরাব—এই সমস্ত জাতির মধ্যেই সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত-হস্তে। দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজসমাজ বা একাধিকারী রাজার অভ্যুদয়।

বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ-নেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ড প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যেই প্রথম ঘটিয়াছে।

যে প্রকার প্রাচীন যুগে রাজশক্তির পরাক্রমে ব্রাহ্মণ্যশক্তি বহু চেষ্টা করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল, সেই প্রকার এই যুগে নবোদিত বৈশ্যশক্তির প্রবলাঘাতে কত রাজমুকুট ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, কত রাজদণ্ড চিরকালের মতো ভগ্ন হইল। যে কয়েকটি সিংহাসন সুসভ্যদেশে কথঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠিত রহিল, তাহাও তৈল, লবণ, শর্করা বা সুরাব্যবসায়ীদের পণ্যলব্ধ প্রভূত ধনরাশির প্রভাবে, আমীর ওমরা সাজিয়া নিজ নিজ গৌরববিস্তারের আস্পদ বলিয়া।

যে নূতন মহাশক্তির প্রভাবে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎপ্রবাহ এক মেরুপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্তা বহন করিতেছে, মহাচলের ন্যায় তুঙ্গতরঙ্গায়িত মহোদধি যাহার রাজপথ, যাহার নির্দেশে এক দেশের পণ্যচয় অবলীলাক্রমে অন্য দেশে সমানীত হইতেছে এবং যাহার আদেশে সম্রাটকুলও কম্পমান, সংসারসমুদ্রের সর্বজয়ী এই বৈশ্যশক্তির অভ্যুত্থানরূপ মহাতরঙ্গের শীর্ষস্থ শুভ্র ফেনরাশির মধ্যে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল-পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাড়্‌গণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব

ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা, এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।

এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছি, এটি অতি অভিনব ব্যাপার—ইংলণ্ডের ভারত-বিজয়। এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।

পুরোহিত-শক্তি

পূর্বে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।

পৌরোহিত্যশক্তির ভিত্তি বুদ্ধিবলের উপর, বাহুবলের উপর নহে; এজন্য পুরোহিতদিগের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাচর্চার আবির্ভাব! অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগতের বার্তা ও সহায়তার জন্য সর্বমানবপ্রাণ সদাই ব্যাকুল। সাধারণের সেথায় প্রবেশ অসম্ভব; জড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়সংযমী অতীন্দ্রিয়দর্শী সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষেরাই সে রাজ্যে গতিবিধি রাখেন, সংবাদ আনেন এবং অন্যকে পথ প্রদর্শন করেন। ইহারাই পুরোহিত, মানবসমাজের প্রথম গুরু, নেতা ও পরিচালক।

দেববিৎ পুরোহিত দেববৎ পূজিত হয়েন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আর তাঁহাকে অন্নের সংস্থান করিতে হয় না। সর্বভোগের অগ্রভাগ দেবপ্রাপ্য, দেবতাদের মুখাদি পুরোহিত-কুল। সমাজ তাঁহাকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যথেষ্ট সময় দেয়, কাজেই পুরোহিত চিন্তাশীল হয়েন এবং তজ্জন্যই পুরোহিত-প্রাধান্যে প্রথম বিদ্যার উন্মেষ। দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয়-সিংহের এবং ভয়কম্পিত প্রজা-অজাযূথের মধ্যে পুরোহিত দণ্ডায়মান। সিংহের সর্বনাশেচ্ছা পুরোহিতহস্তধৃত অধ্যাত্মরূপ কশার তাড়নে নিয়মিত। ধনজনমদোন্মত্ত ভূপালবৃন্দের যথেচ্ছাচাররূপ অগ্নিশিখা সকলকেই ভস্ম করিতে সক্ষম, কেবল ধনজনহীন দরিদ্র তপোবলসহায় পুরোহিতের বাণীরূপ জলে সে অগ্নি নির্বাপিত। পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত জড়-চৈতন্যের প্রথম বিভাজক, ইহ-পরলোকের সংযোগ-সহায়, দেব-মনুষ্যের বার্তাবহ, রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু। বহুকল্যাণের প্রথমাঙ্কুর তাঁহারই তপোবলে, তাঁহারই বিদ্যানিষ্ঠায়, তাঁহারই ত্যাগমন্ত্রে, তাঁহারই প্রাণসিঞ্চনে সমুদ্ভুত; এজন্যই সর্বদেশে প্রথম পূজা তিনিই পাইয়াছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে পবিত্র।

দোষও আছে; প্রাণ-স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার আলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে। প্রবল দোষও আছে, যাহা কালে সংযত না হইলে সমাজের বিনাশসাধন করে। স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তির বিকাশ সর্বজনীন প্রত্যক্ষ, অস্ত্রশস্ত্রের ছেদ-ভেদ, অগ্ন্যাদির দাহিকাদি শক্তি, স্থূল প্রকৃতির প্রবল সংঘর্ষ সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু যেখানে শক্তির আধার

ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণবিশেষে, জপবিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে; বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার-ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখন কখন সন্দেহ হয়। যেথায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্যাতন—সমস্তই উপস্থিত বাহুবল ছাড়িয়া, স্থূল উপায় ছাড়িয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থূল-সূক্ষ্মের মধ্যবর্তী এই কুজ্ঝটিকাময় প্রহেলিকাময় জগতে যাঁহারা নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ঐ প্রকার ধূম্রময়ভাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয়! সে মনের সম্মুখে সরল রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মন তাহাকে বক্র করিয়া লয়। ইহার পরিণাম অসরলতা—হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব; আর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতা। যে বলে, আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূতপ্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য, তাহা অন্যকে কেন দিব? আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত! এ ঘটনাচক্রমধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়; সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ববিদ্যার নাশ; যাহা বাকী থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও (নূতন বিদ্যার কথা তো দূরে থাকুক) চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য 'যেন তেন প্রকারেণ' চেষ্টা করেন; অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সংঘর্ষ।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব প্রাণোন্মেষের প্রতিস্থাপনের[১] স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়। এ সংগ্রামে জয়-বিজয়ের ফলাফল পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

উন্নতির সময় পুরোহিতের যে তপস্যা, যে সংযম, যে ত্যাগ সত্যের অনুসন্ধানে সম্যক্ প্রযুক্ত ছিল, অবনতির পূর্বকালে তাহাই আবার কেবলমাত্র ভোগ্যসংগ্রহে বা আধিপত্য-বিস্তারে সম্পূর্ণ ব্যয়িত। যে শক্তির আধারত্বে তাঁহার মান, তাঁহার পূজা, সেই শক্তিই এখন স্বর্গধাম হইতে নরকে সমানীত। উদ্দেশ্য-হারা খেই-হারা পৌরোহিত্যশক্তি উর্ণাকীটবৎ আপনার কোষে আপনিই বদ্ধ; যে শৃঙ্খল অপরের পদের জন্য পুরুষানুক্রমে অতি যত্নের সহিত বিনির্মিত, তাহা নিজের গতিশক্তিকে শত বেষ্টনে প্রতিহত করিয়াছে; যে সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বহিঃশুদ্ধির আচার-জাল সমাজকে বজ্রবন্ধনে রাখিবার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারই তন্তুরাশিদ্বারা আপাদমস্তক-বিজড়িত পৌরোহিত্যশক্তি হতাশ হইয়া নিদ্রিত। আর উপায় নাই, এ জাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না। যাঁহারা এ কঠোর বন্ধনের মধ্যে স্বাভাবিক উন্নতির বাসনা অত্যন্ত প্রতিহত দেখিয়া এ জাল ছিঁড়িয়া অন্যান্য জাতির বৃত্তি-অবলম্বনে ধন-সঞ্চয়ে নিযুক্ত, সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের পৌরোহিত্য অধিকার কাড়িয়া লইতেছেন। শিখাহীন টেড়িকাটা, অর্ধ-ইউরোপীয় বেশভূষা-আচারাদি-সুমণ্ডিত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যে সমাজ বিশ্বাসী নহেন। আবার—ভারতবর্ষে যেথায় এই নবাগত ইউরোপীয় রাজ্য, শিক্ষা এবং ধনাগমের উপায় বিস্তৃত হইতেছে,

সেথায়ই পুরুষানুক্রমে পৌরোহিত্য-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ব্রাহ্মণযুবকবৃন্দ অন্যান্য জাতির বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধনবান হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরোহিত-পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহার একেবারে রসাতলে যাইতেছে।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে সমাজ-শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্ষত্রিয়শক্তি

অপরদিকে রাজ-সিংহে মৃগেন্দ্রের গুণদোষাদি সমস্তই বিদ্যমান। একদিকে আত্মভোগেচ্ছায় কেশরীর করাল নখরাজি তৃণগুল্মভোজী পশুকুলের হৃৎপিণ্ড-বিদারণে মুহূর্তও কুণ্ঠিত নহে; আবার কবি বলিতেছেন, ক্ষুৎক্ষাম জরাজীর্ণ হইলেও ক্রোড়াগত জম্বুক সিংহের ভক্ষ্যরূপে কখনই গৃহীত হয় না। প্রজাকুল রাজ-শার্দূলের ভোগেচ্ছার বিঘ্ন উপস্থিত করিলেই তাহাদের সর্বনাশ; বিনীত হইয়া রাজাজ্ঞা শিরোধার্য করিলেই তাহারা নিরাপদ। শুধু তাহাই নহে; সমান প্রযত্ন, সমান আকুতি,[১] সাধারণ স্বত্বরক্ষার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ পুরাকালের কি কথা, আধুনিক সময়েও কোন দেশে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয় নাই। রাজরূপ কেন্দ্র তজ্জন্যই সমাজ দ্বারা সৃষ্ট। শক্তিসমষ্টি সেই কেন্দ্রে পুঞ্জীকৃত এবং তথা হইতেই চারিদিকে সমাজশরীরে প্রসৃত। ব্রাহ্মণাধিকারে যে প্রকার জ্ঞানেচ্ছার প্রথম উদ্বোধন ও শৈশবাবস্থায় যত্নে পরিপালন, ক্ষত্রিয়াধিকারে সেই প্রকার ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎসহায়ক বিদ্যানিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।

মহিমান্বিত লোকেশ্বর কি পর্ণকুটীরে উন্নত মস্তক লুক্কায়িত রাখিতে পারেন, বা জনসাধারণলভ্য ভোজ্যাদি তাঁহার তৃপ্তিসাধনে সক্ষম?

নরলোকে যাঁহার মহিমার তুলনা নাই, দেবত্বের যাঁহাতে আরোপ, তাঁহার উপভোগ্য বস্তুর উপর অপর সাধারণের দৃষ্টিক্ষেপই মহাপাপ, লাভেচ্ছার তো কথাই নাই। রাজশরীর সাধারণ শরীরের ন্যায় নহে, তাহাতে অশৌচাদি দোষ স্পর্শে না, অনেক দেশে সে শরীরের মৃত্যু হয় না। অসূর্যম্পশ্যরূপা রাজদারাগণও এই ভাব হইতে সর্বতোভাবে লোকলোচনের সাক্ষাতে আবরিত। কাজেই পর্ণকুটীরের স্থানে অট্টালিকার সমুত্থান, গ্রাম্যকোলাহলের পরিবর্তে মধুর কৌশলকলাবিশিষ্ট সঙ্গীতের ধরাতলে আগমন। সুরম্য আরাম, উপবন, মনোমোহন, আলেখ্যনিচয়, ভাস্কর্যরত্নাবলী, সুকুমার কৌষেয়াদি বস্ত্র—শনৈঃ পদসঞ্চারে প্রাকৃতিক কানন, জঙ্গল, স্থূল বেশভূষাদির স্থান অধিকার করিতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ বুদ্ধিজীবী পরিশ্রমবহুল কৃষিকার্য ত্যাগ করিয়া অল্পশ্রমসাধ্য ও সূক্ষ্মবুদ্ধির রঙ্গভূমি শত শত কলায় মনোনিবেশ করিল। গ্রামের গৌরব লুপ্ত হইল; নগরের আবির্ভাব হইল।

ভারতবর্ষে আবার বিষয়ভোগতৃপ্ত মহারাজগণ অন্তে অরণ্যাশ্রয়ী হইয়া অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অত ভোগের পর বৈরাগ্য আসিতেই হইবে। সে বৈরাগ্য এবং গভীর দার্শনিক চিন্তার ফলস্বরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে একান্ত অনুরাগ এবং মন্ত্রবহুল ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত বিতৃষ্ণা—উপনিষদ্, গীতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদের গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রচারিত। এস্থানেও ভারতে পৌরোহিত্য ও রাজন্যশক্তিদ্বয়ের বিষম কলহ। কর্মকাণ্ডের বিলোপে পুরোহিতের বৃত্তিনাশ, কাজেই স্বভাবতঃ সর্বকালের সর্বদেশের পুরোহিত প্রাচীন রীতিনীতির রক্ষায় বদ্ধপরিকর, অপর দিকে 'পাপ ও চাপ'—উভয়হস্ত[১] জনকাদি ক্ষত্রিয়কুল; সে বিষম দ্বন্দ্বের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পুরোহিত যে প্রকার সর্ববিদ্যা কেন্দ্রীভূত করিতে সচেষ্ট, রাজা সেই প্রকার সকল পার্থিবশক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে যত্নবান। উভয়েরই উপকার আছে। উভয় বস্তুই সময় বিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য আবশ্যক, কিন্তু সে কেবল সমাজের শৈশবাবস্থায়। যৌবনপূর্ণদেহ সমাজকে বালোপযোগী বস্ত্রে বলপূর্বক আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে, হয় সমাজ স্বীয় তেজে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয় ও যথায় তাহা করিতে অক্ষম, সেথায় ধীরে ধীরে পুনর্বার অসভ্যাবস্থায় পরিণত হয়।

রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশুসন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে প্রয়োজিত তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার।[২] সমাজ—গৃহের সমষ্টিমাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না? ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, সকল সমাজই এক সময়ে উক্ত যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং সকল সমাজেই সাধারণ ব্যক্তিনিচয়ের সহিত শক্তিমান্ শাসনকারীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধের জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।

ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এ দেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ[৩]। বারংবার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে, কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ। অর্থহীন শব্দনিচয়ের উচ্চারণে যদি সর্বকামনা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কে আর বাসনাতৃপ্তির জন্য কষ্টসাধ্য পুরুষকারকে অবলম্বন করিবে? সমগ্র সমাজ-শরীরে যদি এই রোগ প্রবেশ করে, সমাজ একেবারে উদ্যমবিহীন হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। কাজেই প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকদিগের ত্বঙ্‌মাংসভেদী শ্লেষের আবির্ভাব। পশুমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ ইত্যাদি বহুল কর্মকাণ্ডের প্রাণ-নিষ্পীড়ক ভার হইতে সমাজকে সদাচার ও জ্ঞানমাত্রাশ্রয় জৈন এবং অধিকৃত[৪] জাতিদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিম্নস্তরস্থ মনুষ্যকুলকে বৌদ্ধবিপ্লব ভিন্ন কে উদ্ধার করিত? কালে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রবল সদাচার মহা অনাচারে পরিণত হইল ও সাম্যবাদের আতিশয্যে স্বগৃহে প্রবিষ্ট নানা বর্বরজাতির পৈশাচিক নৃত্যে সমাজ টলটলায়মান হইল, তখন যথাসম্ভব পূর্বভাব-পুনঃস্থাপনের জন্য শঙ্কর ও রামানুজের চেষ্টা। আবার কবীর,

নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ না জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও কৃশ্চীয়ানের সংখ্যা যে ভারতে অনেক অধিক হইত, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেক দিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তের সঞ্চিত মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তমসাচ্ছন্ন পাশবপ্রকৃতি মানুষ আমরা সহস্রবার ঠেকিয়াও এ মহান্ সত্যে বিশ্বাস করি না, সহস্রবার ঠকিয়াও আবার ঠকাইতে যাই—উন্মত্তবৎ কল্পনা করি যে, আমরা প্রকৃতিকে বঞ্চনা করিতে সক্ষম। অত্যল্পদর্শী—মনে করি, যে কোন প্রকারে হউক, নিজের স্বার্থসাধনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য—যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না—গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্বনাশের সূত্রপাত।

প্রজাসমষ্টির শক্তিকেন্দ্ররূপ রাজা অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যান যে, তাঁহাতে শক্তিসঞ্চয় কেবল 'সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং'। বেণ* রাজার ন্যায় তিনি সর্ব দেবত্বের আরোপ আপনাতে করিয়া অপর পুরুষে কেবল হীন মনুষ্যত্ব-মাত্র দেখেন! সু হউক বা কু হউক, তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাতই মহাপাপ। পালনের স্থানে কাজেই পীড়ন আসিয়া পড়ে—রক্ষণের স্থানে ভক্ষণ। যদি সমাজ নির্বীর্য হয়, নীরবে সহ্য করে, রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপস্থিত হয় এবং শীঘ্রই বীর্যবান অন্য জাতির ভক্ষ্যরূপে পরিণত হয়। যেথায় সমাজশরীর বলবান, শীঘ্রই অতি প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার আস্ফালনে ছত্র, দণ্ড, চামরাদি অতি দূরে বিক্ষিপ্ত ও সিংহাসনাদি চিত্রশালিকারক্ষিত প্রাচীন দ্রব্যবিশেষের ন্যায় হইয়া পড়ে।

বৈশ্যশক্তি

যে মহাশক্তির ভ্রূভঙ্গে 'থরথরি রক্ষনাথ কাঁপে লঙ্কাপুরে,' যাহার হস্তধৃত সুবর্ণভাণ্ডহরূপ বকাণ্ড-প্রত্যাশায় মহারাজ হইতে ভিক্ষুক পর্যন্ত বকপঙ্‌ক্তির ন্যায় বিনীতমস্তকে পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে, সেই বৈশ্যশক্তির বিকাশই পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়ার ফল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, বিদ্যা সকল বলের বল, 'আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে'—দিনকতক তাহাই হইল। ক্ষত্রিয় বলিলেন, 'আমার অস্ত্রবল না থাকিলে বিদ্যাবল-সহিত কোথায় লোপ পাইয়া যাও, আমিই শ্রেষ্ঠ। কোষমধ্যে অসি-ঝনৎকার হইল, সমাজ অবনতমস্তকে [উহা] গ্রহণ করিল। বিদ্যার উপাসকও সর্বাগ্রে রাজোপাসকে পরিণত হইলেন! বৈশ্য বলিতেছেন, ''উন্মাদ!

'অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং' তোমরা যাঁহাকে বল, তিনিই এই মুদ্রারূপী অনন্তশক্তিমান্ আমার হস্তে। দেখ, ইহার কৃপায় আমিও সর্বশক্তিমান্। হে ব্রাহ্মণ, তোমার তপ, জপ, বিদ্যাবুদ্ধি—ইঁহারই প্রসাদে আমি এখনই ক্রয় করিব। হে মহারাজ, তোমার অস্ত্রশস্ত্র, তেজবীর্য—ইঁহার কৃপায় আমার অভিমতসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইবে। এই যে অতিবিস্তৃত, অত্যুন্নত কারখানাসকল দেখিতেছ, ইহারা আমার মধুক্রম। ঐ দেখ, অসংখ্য মক্ষিকারূপী শূদ্রবর্গ তাহাতে অনবরত মধুসঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু সে মধু পান করিবে কে?—আমি। যথাকালে আমি পশ্চাদ্দেশ হইতে সমস্ত মধু নিষ্পীড়ন করিয়া লইতেছি।"

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াধিপত্যে যে প্রকার বিদ্যা ও সভ্যতার সঞ্চয়, বৈশ্যাধিকারে সেই প্রকার ধনের। যে টঙ্কঝঙ্কার চাতুর্বর্ণ্যের মনোহরণ করিতে সক্ষম, বৈশ্যের বল সেই ধন। সে ধন পাছে ব্রাহ্মণ ঠকায়, পাছে ক্ষত্রিয় বলাৎকার দ্বারা গ্রহণ করে, বৈশ্যের সদাই এই ভয়। আত্মরক্ষার্থ সেজন্য শ্রেষ্ঠিকুল একমতি। কুসীদ-কশাহস্ত বণক—সকলের হৃৎকম্প-উৎপাদক। অর্থবলে রাজশক্তিকে সংকীর্ণ করিতে বণিক সদাই ব্যস্ত। যাহাতে রাজশক্তি বৈশ্যবর্গের ধনধান্য-সঞ্চয়ের কোন বাধা না জন্মাইতে পারে, সে জন্য বণিক সদাই সচেষ্ট। কিন্তু শূদ্রকুলে সে শক্তি-সঞ্চার হয়—বণিকের এ ইচ্ছা আদৌ নাই।

শূদ্র-জাগরণ

আর যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য সম্ভব, তাহারা কোথায়? সমাজের যাহারা সর্বাঙ্গ হইয়াও সর্বদেশে সর্বকালে 'জঘন্যপ্রভবো হি সঃ' বলিয়া অভিহিত, তাহাদের কি বৃত্তান্ত? যাহাদের বিদ্যালাভেচ্ছারূপ গুরুতর অপরাধে ভারতে 'জিহ্বাচ্ছেদ শরীরভেদাদি' দয়াল দণ্ডসকল প্রচারিত ছিল, ভারতের সেই 'চলমান শ্মশান', ভারতের দেশের 'ভারবাহী পশু' সে-শূদ্রজাতির কি গতি?

এদেশের কথা কি বলিব? শূদ্রদের কথা দূরে থাকুক; ভারতের ব্রহ্মণ্য এক্ষণে অধ্যাপক গৌরাঙ্গে, ক্ষত্রিয়ত্ব রাজচক্রবর্তী ইংরেজে, বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়; ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব। দুর্ভেদ্য-তমসাবরণ এখন সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এখন চেষ্টায় তেজ নাই, উদ্যোগে সাহস নাই, মনে বল নাই, অপমানে ঘৃণা নাই, দাসত্বে অরুচি নাই, হৃদয়ে প্রীতি নাই, প্রাণে আশা নাই; আছে প্রবল ঈর্ষা, স্বজাতিদ্বেষ, আছে দুর্বলের 'যেন তেন প্রকারেণ' সর্বনাশসাধনে একান্ত ইচ্ছা, আর বলবানের কুক্কুরবৎ পদলেহনে। এখন তৃপ্তি ঐশ্বর্য-প্রদর্শনে, ভক্তি স্বার্থসাধনে, জ্ঞান অনিত্যবস্তুসংগ্রহে, যোগ পৈশাচিক আচারে, কর্ম পরের দাসত্বে, সভ্যতা বিজাতীয় অনুকরণে, বাগ্মিতা কটুভাষণে, ভাষার উৎকর্ষ ধনীদের অত্যদ্ভুত চাটুবাদে বা জঘন্য অশ্লীলতা-বিকিরণে; এ শূদ্রপূর্ণ দেশের শূদ্রদের কা কথা! ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল যেন কিঞ্চিৎ বিনিদ্র হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের বিদ্যা নাই, আর আছে শূদ্রসাধারণ স্বজাতিদ্বেষ। সংখ্যায় বহু হইলে কি হয়? যে একতাবলে দশ জনে লক্ষ জনের শক্তি সংগ্রহ করে, সে একতা শূদ্রে এখনও বহুদূর; শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।

কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইউরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছেক, নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রীস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য।

তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্[১] প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা। যুগযুগান্তরের পেষণের ফলে শূদ্রমাত্রেই হয় কুক্কুরবৎ পদলেহক, নতুবা হিংস্র-পশুবৎ নৃশংস। আবার চিরকালই তাহাদের বাসনা নিষ্ফল; এজন্য দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাহাদের একেবারেই নাই।

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি। ঐ গুণগত জাতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশেও প্রচার থাকিয়া শূদ্রকুলকে দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধারণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ অপর জাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনারাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্যসকল শূদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্বসমাজ-ত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি, মর্যাদা অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতিনির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বা বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার—প্রজাপুঞ্জ। যে নেতৃসম্প্রদায় যত পরিমাণে এই শক্ত্যাধার হইতে আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিবে, তত পরিমাণে তাহা দুর্বল। কিন্তু মায়ার এমনই বিচিত্র খেলা—যাহাদের নিকট হইতে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে ছল-বল-কৌশল বা প্রতিগ্রহের দ্বারা এই শক্তি পরিগৃহীত হয়, তাহারা অচিরেই নেতৃসম্প্রদায়ের গণনা হইতে বিদূরিত হয়। পৌরোহিত্যশক্তি কালক্রমে শক্ত্যাধার প্রজাপুঞ্জ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাৎকালিক প্রজাসহায় রাজশক্তির নিকট পরাভূত হইল; রাজশক্তিও আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বিচার

করিয়া, প্রজাকুল ও আপনার মধ্যে দুস্তর পরিখা খনন করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সাধারণ-প্রজাসহায় বৈশ্যকুলের হস্তে নিহত বা ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া গেল। এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।

সাধারণ প্রজা সমস্ত শক্তির আধার হইয়াও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া আপনাদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যতকাল এইভাবে থাকিবে ততকাল রহিবে। সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি—সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী[১] পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়।

একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরান-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, মুর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির এবং ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির (প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া) এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনওমতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব। এই স্বার্থরক্ষার্থ সহকারিত্ব সর্বদেশে সর্বজাতিতে বিদ্যমান। তবে স্বার্থের পরিধির তারতম্য আছে। প্রজোৎপাদন ও 'যেন তেন প্রকারেণ' উদরপূর্তির অবসর পাইলেই ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বার্থ-সিদ্ধি; আর উচ্চবর্ণের—ইহার উপর ধর্মের বাধা না হয়। এতদপেক্ষা বর্তমান ভারতে দুরাশা আর নাই; ইহাই ভারতজীবনের উচ্চতম সোপান।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ এই যে, পাটালিপুত্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত, এ প্রকার শক্তিমান ও সর্বব্যাপী শাসনযন্ত্র অস্মদ্দেশে পরিচালিত হয় নাই। বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্যদ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে দেশ-দেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগুলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর—এ দেশের যথার্থ কল্যাণনির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু গুণদোষরাশি ভেদ করিয়া সকল ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রবল লিঙ্গ[২] দেখা যাইতেছে যে, এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাবসংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য। বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ডও ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নরকুলেই। দন্তধাবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কর্ম, নিদ্রাভঙ্গ হইতে শয্যাশ্রয় পর্যন্ত সমস্ত চিন্তা—যদি অপরে আমাদের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্ধারিত করিয়া দেয় এবং রাজশক্তির পেষণে ঐ সকল নিয়মের বজ্রবন্ধনে আমাদের বেষ্টিত করে, তাহা হইলে আমাদের আর চিন্তা করিবার কি থাকে?

মননশীল বলিয়াই না আমরা মনুষ্য, মনীষী, মুনি? চিন্তাশীলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে তমোগুণের প্রাদুর্ভাব, জড়ত্বের আগমন। এখনও প্রত্যেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা সমাজের জন্য নিয়ম করিবার জন্য ব্যস্ত!!! দেশে কি নিয়মের অভাব? নিয়মের পেষণে যে সর্বনাশ উপস্থিত, কে বুঝে?

সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বিজিত জাতি বিশেষ ঘৃণার পাত্র হয় না। অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান অধিকার, অর্থাৎ কোন প্রজারই রাজশক্তির নিয়মনে কিছুমাত্র অধিকার নাই। সে স্থলে জাত্যাভিমানজনিত বিশেষাধিকার অল্পই থাকে। কিন্তু যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে, সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয়, এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিত জাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশ ভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়। প্রজাতন্ত্র রোমাপেক্ষা সম্রাড়ধিষ্ঠিত রোমকশাসনে বিজাতীয় প্রজাদের সুখ অধিক এজন্যই হইয়াছিল। এজন্যই বিজিত-য়াহুদীবংশসম্ভূত হইয়াও খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক পৌল (St. Paul) কেশরী (Cæser) সম্রাটের[১] সমক্ষে আপনার অপরাধ-বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা 'নেটিভ' অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের 'জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি' পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংঘর্ষ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষশক্তি-সংগ্রহরূপ-প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য-জ্যোতি, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিপ্রতিঘাতিপ্রভা; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহুমনীষি-উদ্ঘাটিত, যুগযুগান্তরের অপূর্ব বীর্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বকাহিনী। একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া ক্ষীণ অথচ মর্মভেদী স্বরে পূর্বদেবদিগের[২] আর্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল, নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গী অপূর্ব বাসনার উদয় করিতেছে; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া ব্রত-উপবাস, সীতা-সাবিত্রী, তপোবন-জটাবল্কল, কাষায়-কৌপীন, সমাধি-আত্মানুসন্ধান উপস্থিত হইতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্যে উদ্দেশ—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাষ্ট্রনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে, বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্মকল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্বনাশ করিতেছি; আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে ঃ 'ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ। কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥'[৩]

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?

একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। [শিখিবার] আছে, —কিন্তু ভয়ও আছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক, শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'বুঝি, কোনও ইংরেজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।'

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য-অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান আর বুদ্ধি বিচার শাস্ত্র [বা] বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল; পাশ্চাত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান; পাশ্চাত্য পুরুষ আমাদের বেশ-ভূষা অশন-বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ; পাশ্চাত্যেরা মূর্তিপূজা দোষাবহ বলে; মূর্তিপূজা দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেব-দেবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দাও। পাশ্চাত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিয়া জানে, অতএব সর্ব বর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব দোষের আকর বলে, অতএব তাহাও অতি মন্দ—নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহার বিচার করিতেছি না; তবে যদি পাশ্চাত্যদিগের অবজ্ঞাদৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতিনীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে; তাহাতে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত-সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের

স্ত্রীজাতির পবিত্রতারক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে, তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। পাশ্চাত্য দেশেও দেখিয়াছি, দুর্বল জাতির সন্তানেরা ইংলণ্ডে যদি জন্মিয়া থাকে, আপনাদিগকে স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগীজ, গ্রীক ইত্যাদি না বলিয়া, ইংরেজ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোন প্রকারে একটুও লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রহ্মণ্যগৌরবের নিকটে মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!

স্বদেশমন্ত্র

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

১৬.৫ 'বর্তমান ভারত'-এর আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচি

'বর্তমান ভারত' রচনা থেকে যে-নির্বাচিত অংশ পাঠ্য, তার বিষয়-বিন্যাস একঝলকে বোঝবার সুবিধের জন্য ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হল :

১. বৈদিক যুগের রাজনৈতিক বিন্যাসে পুরোহিত, রাজা ও প্রজার অবস্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এই ব্যবস্থার পুরোহিত-কেন্দ্রিকতা।

২. দৈবাদেশ ও ঋষিবাক্য বৈদিক ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ায় সমাজের একক হিসেবে প্রজার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারহীনতা এবং প্রজাশক্তির ক্রমশ অবনতি।

৩. প্রাচীন ভারতের স্বায়ত্তশাসনের অভাব পরবর্তী বৌদ্ধ যুগে কিছুটা পূর্ণ হওয়া এবং বৌদ্ধ যুগে পুরোহিত তন্ত্রের অপসারণ ও সাময়িকভাবে রাজশক্তির বিকাশ।

৪. মুসলমান শাসন পর্বে ক্ষুদ্র হিন্দু রাজশক্তি ও পৌরোহিত্য শক্তির পরস্পর-সহায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ। কিন্তু পৌরোহিত্য-শক্তির গভীর পরাজয়। রাজশক্তিরই বিকাশ।

৫. ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য বা ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষত্রিয় রাজশক্তির অবসান ও বৈশ্য শক্তির অভ্যুদয়।

৬. সমকালীন পৃথিবীর বৈশ্য প্রাধান্য বিষয়ে স্বামীজীর বিশ্লেষণ। ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধিকারভুক্ত সমাজের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের আলোচনা।

৭. সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিকাশের বিষয়ে স্বামীজীর প্রধান সূত্রঃ "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।"

৮. সমকালীন ভারতবর্ষ শূদ্রপ্রধান। প্রজাশক্তিও ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। স্বামীজী অনুমান করছেন, এমন এক সময় আসবে যখন শূদ্র—শূদ্র থেকেই সমাজে শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করবে।

৯. প্রজাশক্তি তথা শূদ্রসমাজের দুর্বলতা কারণ সমস্বার্থ বোধের অভাব। ঐক্য ভিন্ন শক্তির অন্য উৎস নেই।

১০. ভারতীয় প্রজাশক্তির পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষা নিতে হবে কিন্তু পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করলে চলবে না। বৃথা পাশ্চাত্যের অনুকরণ ত্যাগ না করলে ভারতবাসী কখনোই সবল হয়ে উঠতে পারবে না।

১৬.৬ সংক্ষিপ্তসার

এই একক থেকে মূলত জানা যাবে, বাংলা চিন্তামূলক গদ্যে ভারতবর্ষ সম্পর্কিত রচনার ধারায় 'বর্তমান ভারত'—এর গুরুত্ব এবং এর আলোচ্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। সঙ্গে রয়েছে এর প্রকাশনা বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য। উনিশ শতকে বাঙালির ভারত ইতিহাস চর্চার ধারায় 'বর্তমান ভারত' স্বতন্ত্র এই কারণেই যে, এই রচনাটি প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি ইতিহাস বইগুলির দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করেনি। ভারতীয় সমাজকে বিশ্লেষণ করে এই রচনায় সমকালীন ভারতবাসীর কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

'উদ্বোধন' পত্রিকায় পর্বে পর্বে প্রকাশিত বর্তমানে গ্রন্থবদ্ধ লেখাটি বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী ও সমকালীন বাঙালি চিন্তকদের থেকে অন্য পথে বাঙালিকে ইংরেজের অন্ধ অনুকরণের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিল।

১৬.৭ অনুশীলনী

ক. বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. উনিশ শতকের বাঙালির ভারতভাবনার প্রেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' রচনাটির মৌলিকতা ও গুরুত্ব বিচার করুন।

২. গদ্যরচয়িতা হিসেবে বিবেকানন্দের পরিচয় দিয়ে 'বর্তমান ভারত' রচনাটির আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. ভারতচেতনা বা ভারতভাবনা বলতে কী বোঝায়? প্রাক বিবেকানন্দ পর্বের কয়েকজন বাঙালি মনীষীর নাম করুন যাঁরা ভারতভাবনায় মৌলিকতা দেখিয়েছেন?

২. 'বর্তমান ভারত'—এর ধারাবাহিক প্রকাশ ও গ্রন্থাকারে মুদ্রণ বিষয়ে যা জানেন লিখুন।

গ. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. 'বর্তমান ভারত' কোন পত্রিকায় ধারাবাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল?

২. মোট ক'টি সংখ্যায় 'বর্তমান ভারত'-এর পত্রিকা পাঠ প্রকাশিত হয়?

৩. কত খ্রিস্টাব্দে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল?

৪. গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে কে 'বর্তমান ভারত'-এর ভূমিকা লেখেন?

৫. 'বর্তমান ভারত'-এ যে-ভারত ভাবনার বিস্তার বিবেকানন্দের কোন রচনায় তার সূচনা হয়েছিল?

একক-১৭ ❑ ‘বর্তমান ভারত’ : মূল পাঠের পর্যালোচনা

গঠন

১৭.১ উদ্দেশ্য

১৭.২ মূল পাঠ্যের সংক্ষিপ্তসার

১৭.৩ পরিভাষা পরিচিতি ও শব্দ-টীকা

১৭.৪ পাঠ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

১৭.৫ সংক্ষিপ্তসার

১৭.৬ অনুশীলনী

১৭.১ উদ্দেশ্য

আগের এককের চর্চায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, উনিশ শতকের পরাধীন বাঙালির ভারত-চিন্তায় নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের ‘বর্তমান ভারত’। এই রচনার প্রেক্ষাপট ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ ও গ্রন্থাকারে মুদ্রণ নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। রচনাটির আলোচ্য বিষয় নিয়েও সূত্রাকারে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল আগের এককে। এই এককে ‘বর্তমান ভারত’ রচনার নির্বাচিত পাঠ্যাংশ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হবে। মূল পাঠ্যটির অর্থ ও তাৎপর্যকে ভালো করে বোঝবার জন্য যে শব্দ ও ধারণাগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার সেগুলিও আলোচিত হবে এই এককে। ‘বর্তমান ভারত’ থেকে নির্বাচিত পাঠ্যাংশটিকে আয়ত্ত করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

১৭.২ মূল পাঠ্যাংশের সংক্ষিপ্তসার

বৈদিক যুগে প্রজা ও রাজা উভয়েই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। প্রজাকল্যাণ করে নয়, পুরোহিতকে তুষ্ট করেই সেকালের রাজারা পুরাণ-ইতিহাসে অমর হয়েছে। পুরোহিতের তুষ্টি বিধানের জন্য রাজন্যবর্গ প্রজাদের, বিশেষত বৈশ্যদের শোষণ করত। হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো পর্বেই রাজ্য চালনায় প্রজাদের মতামতের গুরুত্ব ছিল না। সে সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রজারা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অসচেতন ও সেই শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকাশ করার চেতনা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। বৈদিক যুগে শাসন ছিল দৈবাদেশের মুখাপেক্ষী ও শাস্ত্রগ্রন্থে আবদ্ধ এবং সেই কারণেই সম্পূর্ণ প্রজাবিচ্ছিন্ন। প্রজাশক্তির প্রকাশ ও চর্চা না হওয়ায় সে সময় থেকেই ভারতে এই শক্তি দুর্বল ও শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রাচীন ভারতে কখনো কখনো প্রজানির্ভর স্বায়ত্ত শাসনের বিকাশ যে দেখা যায়নি তা নয়। বৌদ্ধ ও নাগা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় বৃত্তে স্বায়ত্ত শাসনের কিছুটা চর্চা ছিল।

বৌদ্ধযুগে ধর্মীয় নেতৃত্ব শাসক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলায় ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়দের রাজশক্তি বিনা বাধায় বিকশিত হয়ে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করে। পরে আবার হিন্দুযুগের সূচনায় অখণ্ড ভারত শত বিভাজিত হয় ও ব্রাহ্মণ্যশক্তির আংশিক পুনরুত্থান সম্ভব হয়। এই পর্বে পুরোহিত শক্তি ও রাজশক্তি পরস্পরের সহায়করূপে কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের পূর্বতন মহিমার লোপ, মন্ত্রতন্ত্র অনুষ্ঠানসর্বস্বতা ও নানাবিধ দুর্বলতার সুযোগে মুসলমান বিজেতারা এদের পর্যুদস্ত করে। মুসলমান শাসনাধীন ভারতে পৌরোহিত্য শক্তিকে নবজীবন দানের লক্ষ্যে রাজপুতেরা রাজশক্তির পুনরুত্থানের চেষ্টা চালিয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে এই চেষ্টার কিছু প্রভাবও দেখা গেছিল।

ভারতবর্ষের হিন্দু রাজশক্তি মুসলমানে সঞ্চারিত হয়ে জীবিত ছিল। তাকে পরাভূত করল অমিত শক্তিধর বিদেশী ইংরেজের পৃথক এক শক্তি। এই শক্তি উৎস বণিক সম্প্রদায়। এইভাবে বৈশ্য শক্তির কাজে ক্ষত্রিয় শক্তির হার হয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই গুণানুসারী বর্ণচতুষ্টয় সভ্যতার ইতিহাসে ক্রমানুসারে আধিপত্যস্থাপন করে। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্বে বিশেষ একটি বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও প্রাকৃতিক নিয়মেই সেই বর্ণ অন্য তিনটি বর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য দেখা গেছে। তবে বৈশ্য বা বাণিজ্যজীবী সম্প্রদায়ের আধিপত্য সর্বপ্রথম দেখা যায় পাশ্চাত্য সমাজে। এই শক্তি তার পূর্ববর্তী ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তিকে ধূলিস্যাৎ করেছে, কোথাও পরিণত করেছে নেহাৎই হাতের পুতুলে। ইংলণ্ডের ভারতজয় আগাগোড়া একটি নতুন ব্যাপার কারণ এটি ভারতবর্ষে প্রথম বৈশ্যশক্তির কাছে রাজশক্তির পরাভব।

প্রতিটি বর্ণের শাসনতন্ত্রেরই কিছু ইতিবাচক ও কিছু নেতিবাচক দিক লক্ষণীয়। পুরোহিত প্রাধান্যের পর্বে বাহুবলের ওপর বুদ্ধিবল, বিদ্যা ও দার্শনিকতা জয়লাভ করেছে। ক্ষমতাশালী ক্ষত্রিয়ের শোষণ করার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পুরোহিতের অধ্যাত্ম উপদেশের দ্বারা। আবার অন্যদিকে, বাস্তববর্জিত, প্রহেলিকাময় মন্ত্রতন্ত্র এই পর্বেই বেশি প্রশ্রয় পায়। আধিপত্যের মোহ পুরোহিতকে তার তপস্যা, সংযম ও সত্য থেকেও ভ্রষ্ট করেছে কালক্রমে।

ক্ষত্রিয় শক্তির বিকাশের পর্বে তেমনি সার্বিকভাবে শক্তির স্ফুরণ হয় ও পার্থিব ভোগেচ্ছার প্রাবল্য দেখা দেয়। তাই বিদ্যার চর্চাতেও উন্নতি লক্ষ করা যায় এই সময়ে। কিন্তু এই পর্বে সমাজশরীরকে বাদ দিয়ে সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হয়েছে ক্ষত্রিয় শাসকবর্গের হাতে যা সমাজের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে প্রাধান বাধা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৌদ্ধপর্বে পৌরোহিত্য শক্তির অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা ও ক্ষত্রিয় শক্তির কুক্ষিগত ক্ষমতাতন্ত্র বৌদ্ধ বিপ্লবের ফলে কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল। ব্যষ্টির সীমাবদ্ধ সুখের পরিবর্তে সমষ্টির সুখই জগতের অনন্ত সত্য। যে বর্ণ যখন শক্তির কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করে সে বর্ণ তখন এই সত্য ভুলে যায়। প্রকৃতির

নিয়মানুসারে শক্তি পুঞ্জিত হওয়ার জন্য নয়, প্রবাহিত হওয়ার জন্য। রাজশক্তির অধঃপতনের প্রতিক্রিয়াতেই বৈশ্যশক্তির উত্থান। পূর্বতন পৌরোহিত্য শক্তি ও ক্ষত্রশক্তির ক্ষমতাকেন্দ্রকে ধনের শক্তিতে ক্রয় করে নেয় বৈশ্য শক্তি। বৈশ্য আধিপত্যের পর্বে সভ্যতার ধনের পুঞ্জীভবন ঘটে। বৈশ্যরা চায় এই ধনশক্তিকে কুক্ষিগত করে রাখতে ও অন্যান্য বর্ণে এর বিস্তার ও সঞ্চারকে রুদ্ধ করতে।

> **ভারত-ইতিহাসের সময় সারণী**
> স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলেও 'বর্তমান ভারত'-এ কোথাও সাল তারিখের কোনো হিসেব উল্লেখ করেননি। বোঝার সুবিধার জন্য তাঁর নির্ধারণ করা বিভাজনটি সময়ের নির্দিষ্ট হিসেব অনুসারে দেওয়া হলঃ
> বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য পর্ব (খ্রি. পূ. ৩০০০ থেকে খ্রি. পূ. ৬০০)
> বৌদ্ধ পর্ব (খ্রি. পূ. ৬০০ থেকে ৭৫০ খ্রি.)
> মুসলমান পর্ব (১২০৩ — ১৭৫৭)
> ব্রিটিশ শাসন পর্ব (১৭৬৫-১৯৪৭)
> এই প্রবন্ধ অবশ্য উনিশ শতকের শেষে রচিত। কাজেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান এই প্রবন্ধের আলোচ্য হওয়া সম্ভব নয়।

শূদ্রের শারীরিক শ্রমের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রাহ্মণত্বের মহিমা, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনসম্পদ, কিন্তু শূদ্ররাই সকল কালে সকল দেশে সব চাইতে উপেক্ষিত। ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে সব ভারতবাসীই গুণগত বিচারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই ভারতের যারা প্রকৃত শূদ্র তাদের অবস্থা আরোই অকল্পনীয়। বিশেষ করে এদের নিজেদের তীব্র স্বজাতিবিদ্বেষ ও একতার অভাব এদের প্রাকৃতিক নিয়মেই পরাধীন করে রেখেছে।

বর্তমান বিশ্বে উচ্চাধিকার প্রাপ্ত বর্ণসম্প্রদায় তার স্বাভাবিক উচ্চাসন থেকে নিচে এসে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এমন দিন আসা খুবই সম্ভব যেদিন শূদ্র তার শূদ্রত্ব নিয়েই সারা বিশ্ব একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করবে। পাশ্চাত্যের নানা আন্দোলনে এই সম্ভাবনার আভাস দেখা গেছে। বর্ণব্যবস্থা যদি প্রকোষ্ঠবদ্ধ হয়, যদি গুণ ও যোগ্যতার সঙ্গে এক বর্ণ থেকে আরেক বর্ণে উত্তরণ ও অবনমনের স্বাধীনতা না থাকে তবেই উন্নত শূদ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনের প্রভাবে তার বর্ণভুক্ত অন্যান্যরা ক্রমশ উন্নত হবে।

সমাজ সভ্যতার নেতৃত্ব যতই বিদ্যাবল, রাজবল বা ধনবলের দ্বারা অধিকৃত থাকুক না কেন, প্রজাই সমস্ত শক্তির আশ্রয়। নেতৃত্ব এই শক্তি সহায়তাতেই ক্ষমতার কেন্দ্রে আরূঢ় হয়। কিন্তু এরা প্রায়ই ক্ষমতা অর্জনের পর প্রজাশক্তিকে অবজ্ঞা করে থাকে। প্রজাশক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। একদা প্রজাশক্তির সহায়েই পুরোহিতেরা ক্ষমতার কেন্দ্রে আসীন হয়েছিল। পরে প্রজাশক্তির সাহায্যেই পুরোহিতদের ওপর ক্ষত্রিয়েরা ও ক্ষত্রিয়দের ওপর বৈশ্যরা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে। বর্তমান ভারতে প্রজার ব্যক্তিক স্বার্থান্ধতা প্রজাশক্তির বিস্তারের পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

পাশ্চাত্যের বৈশ্যশক্তির নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের ভাব ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষের এই বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ে ভারতবাসীর ঘুম ভাঙবার লক্ষণ দেখা গেছে। পরাধীন জাতি রাজতন্ত্রানুসারী ভিন্ন জাতির শাসকের অধীনে বরং সুখে থেকে, বিজাতীয় শাসন যদি প্রজাতান্ত্রিক হয় তবে শাসনশক্তি পরাধীন প্রজাকে তুষ্ট করার কাজেই বাজে খরচ হয়ে যায়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবসংঘর্ষে ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে স্বাধীনচিন্তার উন্মেষ, বিজ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, দেশীয় ঐতিহ্যচর্চার আগ্রহ ইত্যাদি নানা আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর ফলে নতুন ও প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের মধ্যেও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে। নব্যভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাকে অনুকরণ করার মোহ। নারী স্বাধীনতা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নানা সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজের প্রশ্নহীন অনুকরণকেই নব্যভারত তার লক্ষ্য মনে করেছে।

বর্তমান ভারতকে উচ্চাধিকার লাভ করতে হলে এই পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করে স্বদেশের উচ্চাদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত সুখ ও স্বার্থ ত্যাগ করে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে হবে। শূদ্রজনতাকে অন্তরের থেকে নিকটজন বলে কাছে টেনে নিতে হবে। সব নীচ কাপুরুষতাকে ত্যাগ করে দেশকে ও দেশবাসীকে উপাস্য করে তুলতে হবে।

১৭.৩ পরিভাষা পরিচিতি ও শব্দ-টীকা

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মূল ‘বর্তমান ভারত’ রচনায় অর্থবোধের সুবিধার জন্য কিছু পাদটীকা সংযোজন করেছিলেন। এখানে অতিরিক্ত আরও কিছু শব্দের অর্থ ও টীকা দেওয়া হল যা মূল পাঠ্যকে স্পষ্টতর করবে।

মহাসত্রানুষ্ঠায়ী = সত্র শব্দের অর্থ হল যজ্ঞ। বৃহৎ আকারের যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন যে-রাজা তিনি ‘মহাসত্রানুষ্ঠায়ী’।

পরীক্ষিত = পুরাণে ও মহাকাব্যে উল্লেখিত শাস্ত্রপ্রিয় রাজা। ইনি অভিমন্যুর পুত্র ও পাণ্ডবদের পরে ইনিই কুরুকুলের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

জনমেজয় = পরীক্ষিত ও মদ্রবতীর পুত্র। তাঁর রাজত্বকালে আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞের উৎসবে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভারত পাঠ করেন।

বারণাবত = মহাভারতে উল্লেখিত একটি নগর। এখানে জতুগৃহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

সমবায় = সমূহ বা সমষ্টি।

স্থিতিস্থাপকত্ব = পদার্থের ভৌতধর্ম। সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতাই স্থিতিস্থাপকত্ব। শব্দটি আলোচ্য পাঠ্যে ভৌতধর্ম হিসেবে উল্লিখিত হয়নি। কোনো ধারণার নমনীয়তা বোঝাতেই এই পরিভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন = পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের একটি ধারণা। প্রাতিভ শব্দের অর্থ হল নিজের প্রতিভা থেকে জেগে-ওঠা জ্ঞান যা অপরের কাছ থেকে লব্ধ নয়। সেই জ্ঞান থেকে যা উৎপন্ন হয় তা-ই প্রাতিভ-জ্ঞানোৎপন্ন।

যতি = সন্ন্যাসী, ত্যাগী সাধক।

ভাটচারণাদি = ভাট হল স্তুতিপাঠক চারণকবি, উচ্চ বংশের কীর্তিকাহিনি গান করে শোনানোই যাদের জীবিকা অর্জনের উপায়।

মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র = মনু প্রমুখ রচিত ধর্মশাস্ত্র। 'ধর্মশাস্ত্র' হল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতে লিখিত আচার ও ব্যবহারবিধি। এই গ্রন্থসমূহের ধারেই সেকালের ব্রাহ্মণ্য সমাজ শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হত।

সত্ত্বাদি গুণত্রয় = সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই তিনটি গুণ। এই ত্রিগুণের ধারণা মূলত সাংখ্য দর্শন থেকে বিস্তার লাভ করে। এই গুণসমূহের তারতম্যে মানব স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

ঈশামসি = যিশুখ্রিস্ট

উর্ণাকীট = মাকড়সা

ব্যষ্টি = পৃথক পৃথক ব্যক্তি।

প্রত্যবায় = বিপরীত আচরণ। পাপ বা অনিষ্ট। বিশেষ করে কর্তব্য না-করা জনিত যে পাপ তা-ই প্রত্যবায়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এই শব্দটিকে বাধা অর্থে ব্যবহার করেছেন এই রচনায়।

১৭.৪ পাঠ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

'বর্তমান ভারত' নিছক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক লেখাই নয়, ইতিহাসকে বোঝবার ও তার অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করবার একটা বিশিষ্ট কৌশলকেও এই রচনায় পরিবেশন করেছেন বিবেকানন্দ। প্রাচীনকাল থেকে তাঁর সমকাল অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সুসংবদ্ধ ধারাবাহিকতায় শুধু পর্যালোচনাই করেননি স্বামীজী, ইতিহাস থেকে কীভাবে বর্তমানের উপযোগী পাঠগ্রহণ করতে হয় তা-ও যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 'বর্তমান ভারত'-এর ভূমিকায় তাঁর সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দ যথার্থই লিখেছিলেন : "তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ দেখা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। স্থূলদৃষ্টি সাধারণ পাঠক ইহাতে দুই-চারিটা ধর্মবীর বা কর্মবীরের মূর্তি এবং দুই-একটি ধর্মবিপ্লব বা রাজ্যবিপ্লব অতি অসম্বন্ধভাবে গ্রথিত ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। গবেষণাশীল যশোলিপ্সু পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও প্রাচ্য জাতিসমূহের মানসিক গঠন, আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালী প্রভৃতির দ্বারা প্রতিহত হইয়া এখানে অনেক সময়ে সরল পথ ত্যাগ করে এবং কুজ্ঝটিকাবৃত কিম্ভূতকিমাকার মূর্তিসকলই দেখিয়া থাকে।" স্বামী বিবেকানন্দ সেই খণ্ড খণ্ড ইতিহাসের নিষ্প্রাণ তথ্যস্তূপের মত ভারত-ইতিহাসের একটি মৌলিক চালিকাশক্তি আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা ও তার রাজনৈতিক নেতৃত্বশক্তির রদবদলের আলোয় স্বামীজী বিশ্বের ইতিহাসকে একটি পরম্পরাবদ্ধ ধারাবাহিকতায় যৌক্তিক আকার দান করতে সক্ষম হয়েছেন।

ক. প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা ও স্বামী বিবেকানন্দ

'বর্তমান ভারত' রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বদলের ইতিহাসকে বর্ণ ব্যবস্থার দৃষ্টি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থায় আদর্শ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব ও অধিকার ক্ষত্রিয়ের ওপরেই ন্যস্ত। কিন্তু ইতিহাসের প্রকৃত গতির দিকে তাকালে দেখা যাবে, শাসক নিয়ন্ত্রকের চরিত্র যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। স্বামীজী এই শাসক পরিচিতি ও তার চরিত্র বদলকে দেখেছেন বর্ণ ধারণার প্রেক্ষাপটে।

ভারতীয় বর্ণ-ব্যবস্থা আদিতে ছিল গুণগত। বিশেষ গুণ, কর্ম ও চারিত্রিক বিশেষত্বের মাত্রা অনুসারে সামাজিক মানুষ বিশেষ বর্ণের বেষ্টনীভূক্ত হতেন। পরবর্তীকালে এই বর্ণ-পরিচিতি জন্মগত হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃতন্ত্রের বংশগতির ধারণা অনুসারে পিতার বর্ণ পুত্রে জন্মগত সূত্রেই বর্তায়। 'বর্তমান ভারত'-এ স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণব্যবস্থাকে মূলত গুণ বা চরিত্রগত বিভাজন হিসেবেই দেখেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য-তারতম্যে প্রসূত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সনাতন কাল হইতে সকল সভ্যসমাজে বিদ্যমান আছে। কাল প্রভাবে আবার দেশভেদে ঐ চতুর্বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যাধিক্য বা প্রতাপাধিক্য ঘটিতে থাকে।"

স্বামীজীর এই লেখা খুব তলিয়ে পড়লে বোঝা যায়, বর্ণগত বিভাজনকে তিনি খুবই সমসত্ত্ব বিভাজন বলে ধরে নিয়েছিলে, অর্থাৎ, একই বর্ণভুক্ত সকল মানুষ একই সাধারণ চারিত্রিক বিশেষত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী,-এরকমই একটা প্রত্যয় ছিল তাঁর। বর্ণ ব্যবস্থার একটি উর্ধাধঃ বিন্যাস আজকের সমাজেও কম বেশি সজীব আছে। এই কাঠামোর সবচেয়ে ওপরে আছে ব্রাহ্মণ, তার নিচে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের নিচে বৈশ্য ও সবার নিচে রয়েছে শূদ্ররা। প্রাক ইংরেজ বর্ণে বিশ্বাসী সমাজে সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করত এই স্তরগত অবস্থানের ওপরেই। বাণিজ্যজীবী ইংরেজরা আসবার পর ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটলে বর্ণগত কৌলিন্যের ধারণা ক্রমশ গুরুত্ব হারাতে থাকে, পরিবর্তে দেখা দেয় বিত্তকৌলিন্যের ধারণা। বর্ণ কাঠামোর ওপরে-থাকা ব্যক্তিও ধনী না হলে ধনতান্ত্রিক সমাজে তিনি মর্যাদার অধিকারী নন। ধনতন্ত্রের আবহে সামাজিক সম্মান বর্ণ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জন্মগত বর্ণব্যবস্থা একটি অপরিবর্তনীয় ও নিয়ন্ত্রণের অতীত ব্যাপার। কোনো ব্যক্তি তার জন্মগত বর্ণকে কোনোভাবেই পরিবর্তন করতে পারে না। অপর পক্ষে, সমাজে গুণের ভিত্তিতে বর্ণব্যবস্থা প্রচলিত থাকলে কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত গুণযোগ্যতার শক্তিতে বর্ণকাঠামোর নিচুস্তর থেকে ওপরে আরোহন করতে পারবে। ফলে গুণগত বর্ণব্যবস্থা একধরনের সামাজিক সচলতা থাকাই স্বাভাবিক। স্বামীজী গুণগত বর্ণব্যবস্থার দৃষ্টান্ত দিয়ে এই জাতীয় সামাজিক সচলতার বিপক্ষে কথা বলেছেন 'বর্তমান ভারত'-এ। নিম্নবর্ণের যোগ্যতাসম্পন্ন গুণিব্যক্তি যদি এই সচলতার সুযোগ নিয়ে নিম্নবর্গের সমাজ ত্যাগ করে উচ্চবর্গের সমাজের সদস্যপদ অর্জন করে তবে তার গুণ ও সাধনা তার একদা সমসম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের অপরাপর জনতার কোনো কাজেই আসে না। তাই বিবেকানন্দ জন্মগত বর্ণব্যবস্থার পক্ষে, যাতে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শূদ্র বিদ্যায় বা শৌর্যে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় তুল্য হলেও তাকে নিজ সমাজেই থেকে

যেতে হয় আর তার সান্নিধ্য ও প্রেরণা বা আর্থিক উচ্চাবস্থার সুফল সেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভোগ করতে পারে। তাঁর ভাষায় : "আধুনিক ভারতে শূদ্রকুলোৎপন্ন মহাপণ্ডিতের বা কোটীশ্বরের স্ব-সমাজত্যাগের অধিকার নাই। কাজেই তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির ও ধনের প্রভাব স্বজাতিগত হইয়া স্বীয় মণ্ডলীর উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে। এই প্রকার ভারতের জন্মগত জাতি মর্যাদা-অতিক্রমে অসমর্থ হইয়া বৃত্তমধ্যগত লোকসকলের ধীরে ধীরে উন্নতিবিধান করিতেছে। যতক্ষণ ভারতে জাতি-নির্বিশেষে দণ্ডপুরস্কার-সঞ্চারকারী রাজা থাকিবেন, ততক্ষণ এই প্রকার নীচ জাতির উন্নতি হইতে থাকিবে।"

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন প্রাচীন ভারতবর্ষ চালিত হত 'গুণগত জাতি' ভাবনার দ্বারা। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি বেদ, মহাভারত, পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন। একালের ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাসকে সমর্থন না-ও করতে পারেন। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নৃপতির দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে অলভ্য নয়।

ঊর্ধাধঃ সমাজস্তরের বিভাজন সম্পর্কে বিভাজন সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাকফরাসি বিপ্লব দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। স্বামীজী ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের গুণগ্রাহী ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে তিনি সমাজের নানাস্তরের মধ্যে জৈবিক ঐক্য বিষয়ে যে মতামতে বিশ্বাসী তা এডমণ্ড বার্ক প্রমুখ ফরাসি বিপ্লব বিরোধী তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনীয়। বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ সমাজের বর্ণবিভাজিত নান স্তরের প্রয়োজনীয়তা ও পারস্পরিক জৈবিক নির্ভরতা বিষয়ে আস্থার কথা প্রকাশ করে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। স্বামীজীও সমাজের সঙ্গে মানব শরীরের তুলনা করেছেন এবং বর্ণবিভাজনের পেছনে সমর্থনযোগ্য যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। সেই কারণেই তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের অগ্রগতিকে ব্যাখ্যা করেছেন বর্ণব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করেই।

খ. 'বর্তমান ভারত'-এ ইতিহাসের অগ্রগতির সূত্র :

স্বামী বিবেকানন্দ গুণগত বর্ণবিভাজনকে কেন্দ্রে রেখে ভারতবর্ষের অতীত ও মধ্যযুগের রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্রের বিবর্তনকে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি লক্ষ করেন, সমাজের সমস্ত শক্তির আধার হল সাধারণ প্রজা। স্বামীজীর আলোচনা থেকে মনে হয় তিনি প্রজা ও শূদ্র এই দুটি পরিচিতিকেই অভিন্ন মনে করতেন। প্রাচীন ভারতে এই বিপুল সংখ্যক শূদ্র প্রজাবর্গ রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ অসচেতন—"প্রজাদের কোন বিষয়ে উচ্চবাচ্য নাই। প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে শক্তির অস্তিত্বে প্রজাবর্গের এখনো জ্ঞান হয় নাই। তাহাতে সমবায়ের উদ্যোগ বা ইচ্ছাও নাই"।

'বর্তমান ভারত'-এ বিবেকানন্দের অবলোকন অনুসারে, এই প্রজাশক্তির সম্যক জাগরণই বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্ভাব্য পরিণতি। প্রজাশক্তি বা শূদ্র-জাগরণের বিকাশের পেছনে তিনি লক্ষ করেন রাষ্ট্রশক্তির বর্ণগত আশ্রয় পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধারা। ইতিহাসের ধারায় এই শক্তিকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হয়ে বৈশ্যের মধ্যে বিকশিত হতে দেখেছেন স্বামীজী ক্রমান্বয়ে। প্রত্যেক পর্বেই কিন্তু প্রজা বা শূদ্রই শক্তির মূল আধার। বিশেষ একটি বর্ণ এই প্রজাচক্র ব্যবহার করেই বিশেষ কালপর্বে ক্ষমতাসীন হয়। প্রত্যেক বর্ণগত শাসনেরই কিছু দোষ ও কিছু গুণ রয়েছে। দোষের আধিক্যে সেই বর্ণশাসনের অবসান ঘটে ও

বর্ণস্তরের পরবর্তী পর্যায়ের বর্ণগোষ্ঠী রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দখল করে। 'বর্তমান ভারত'-এর নানা স্থানে স্বামীজী এই সমাজ বিবর্তনের বিশেষ ক্রমকে সূত্রবদ্ধ করেছেন :

১. "পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"

২. "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে।"

স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাসের যে বিশেষ কালখণ্ডে 'বর্তমান ভারত' রচনা করেছেন, সেই পর্বে বিশ্বব্যাপী বণিক সম্প্রদায় বা বৈশ্য শক্তির আধিপত্য। কিন্তু স্বামীজী এই রচনাতেই পরবর্তী শূদ্র শাসনের আগমনী রচনা করে গেছেন। তাঁর নিবিষ্ট সমাজবীক্ষায় ধরা পড়েছে, শূদ্র সমাজের দীর্ঘ নিদ্রা অবসানের ইঙ্গিত চারদিকে স্পষ্ট।

'বর্তমান' ভারতের শূদ্রকুলের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 'জন্মগত জাতি' বা পিতৃপিতামহ থেকে বংশধারায় বাহিত শূদ্রত্বের কথা বলেন। আধুনিক ভারতে এই জন্মগত বর্ণ-পরিচিতির উন্নয়নমূলক প্রভাব সম্পর্কেও সংক্ষেপে মন্তব্য করেন তিনি। স্বামীজী গুণ ও কর্মগত জাতিবর্ণ ব্যবস্থার কথা বিস্তারসহ আলোচনা করলেও তিনি মনে করেন ওই ব্যবস্থা "শূদ্র জাতির অভ্যুত্থানের একটি বিশেষ প্রত্যবায়"। অথচ প্রাচীন ভারতে এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল সে কথাও তিনি জানান।

'বর্তমান ভারত'-এ স্বামীজীর বর্ণ সম্পর্কে ধারণা ও তাঁর প্রস্তাবিত সমাজ-বিবর্তনের সূত্র—এই দু'টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে দু'একটি প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রাচীন গুণগত বর্ণ-বিভাজন ব্যবস্থা করে কীভাবে কোন সমাজ-রাষ্ট্রীয় শক্তির চাপে তাপে জন্মগত বর্ণ-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তা এই রচনায় কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। অন্য দিকে, ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় হয়ে বৈশ্যে যে ব্যবস্থার আগমন ঘটেছে—তা স্বামীজী দেখান গুণগত ব্যবস্থার ভিত্তিতেই হয়েছে। গুণগত ব্যবস্থার কারণে স্বামীজীর লেখায় এই তিনটি শাসনপর্বে নির্দিষ্ট বর্ণবদ্ধ সম্প্রদায়গুলি একই ধরনের বৈশিষ্ট্য ও মানসিকতার অধিকারী। তিনি এও দেখান যে আধুনিক ভারতে এই ব্যবস্থা অচল। সেখানে ক্রিয়াশীল রয়েছে বর্ণ ব্যবস্থার জন্মগত ধারা। অথচ এই 'গুণগত জাতি' থেকে 'জন্মগত জাতি'তে রূপান্তরিত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে 'গুণগত জাতি'-ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো পরিবর্তনের সূত্র কীভাবে অবিকৃত অবস্থায় কার্যকরী হওয়া সম্ভব, তা বিবেকানন্দের রচনা থেকে জানতে পারা যায় না।

বিবেকানন্দের জন্মের মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় হুতোম ছদ্মনামের আড়ালে, কালীপ্রসন্ন সিংহ যথার্থই দেখিয়ে ছিলেন ভারতে তথা বাংলায় ব্রিটিশ বণিকশক্তির উত্থান ও ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর্ব থেকে বর্ণগত বংশ পরিচিতির সঙ্গে সামাজিক সম্মান লাভের সম্পর্ক ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে। যারা অর্থবিত্তের অধিকারী তারা বর্ণ কাঠামোর একেবারে নিচের স্তরে অবস্থান করলেও নতুন ব্যবস্থায় তারাই সমাজের নিয়ন্তা হয়ে উঠতে থাকে। বর্ণগত উচ্চতা অনুসারে সামাজিক গ্রাহ্যতা পাওয়ার পুরোনো তত্ত্বকে একরকম খারিজই করে দিতে থাকে ধনতন্ত্র। অর্থনৈতিক সচলতা সামাজিক সচলতাকে

নিশ্চিত করায়, জন্মগত বর্ণ পরিচিতি কার্যত তার শক্তি হারাতে শুরু করে এই সময় থেকে। অথচ উনিশ শতকের একেবারে শেষ পর্বে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ জন্মগত বর্ণ বিভাজনের কঠোর রূপটির অস্তিত্বের ভিত্তিতেই তাঁর প্রস্তাবিত রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজ বিবর্তনের নতুন সূত্র প্রণয়ন করতে চেয়েছেন।

শূদ্রদের স্বামীজী নির্বিচারে বলেছেন 'শ্রমজীবী'। আর্থিক বা পেশাগত এই পরিচিতিকে তিনি বর্ণগত পরিচিতির সঙ্গে অভিন্ন বলেই দেখাচ্ছেন। 'গুণগত জাতি' ব্যবস্থা কায়েম থাকলে সেই অবস্থায় শূদ্রমাত্রকেই শ্রমজীবী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। অথচ 'বর্তমান ভারত'-এর রচয়িতা নিজেই জানিয়েছেন এ সময়ের ভারতে গুণগত জাতি ব্যবস্থার কোনো কার্যকরি অস্তিত্ব নেই। ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে স্তরে দাঁড়িয়ে স্বামীজী বর্ণগত 'শূদ্র' ও শ্রমজীবীকে অভিন্ন বর্গ বলে ঘোষণা করেন, তার আগে থেকেই কায়িক শ্রমের কাজে তথাকথিত উচ্চবর্গীয় মানুষ যুক্ত হতে শুরু করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতেই পারে শশিপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা যিনি জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং একই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের নেতাও ছিলেন। স্বামীজী ধনতান্ত্রিক সমাজের বিত্তগত বিভাজনকে জন্মগত বর্ণ পরিচিতির সঙ্গে এইভাবে অভিন্ন করে দেখানোয় কিছু যৌক্তিক সমস্যা তৈরি হয়ে যায়।

> **সামাজিক সচলতা :** সামাজিক সচলতা বলতে বোঝায় সমাজের একস্তরের মানুষের অন্যস্তরে স্থানান্তরিত হওয়ার ঘটনাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তি নিজের যোগ্যতার শক্তিতে অর্থ উপার্জন করে সমাজের অপেক্ষাকৃত নিচু তলা থেকে সমাজের সম্মানজনক উচ্চবর্গে উপনীত হলে সেটা সামাজিক সচলতার দৃষ্টান্ত।

গ. 'বর্তমান ভারত'-এ ইংরেজ শাসন পর্বঃ 'শূদ্র জাগরণ'-এর প্রেক্ষাপট

তাৎপর্যের দিক দিয়ে দেখলে, ভারতবর্ষে ইংরেজের অধিকার লাভ ও তার প্রতিক্রিয়া 'বর্তমান ভারত'-এ স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান আলোচ্য। উনিশ শতকের মোটামুটি তৃতীয় পাদ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজদের আগমন ও সাম্রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে সাধারণভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মনে একরকমের উত্তরণের তত্ত্ব কাজ করত। তাঁদের বড় অংশের বিশ্বাস ছিল, পৌরব্যবস্থাহীন এবং সামাজিক ও সামরিক সুরক্ষা-বর্জিত ভারতবর্ষের অদৃষ্টে ইংরেজদের সংস্পর্শে আসাটাই আশীর্বাদের মতো। স্বামী বিবেকানন্দ যখন 'বর্তমান ভারত' রচনা করছিলেন তখন ইংরেজ শাসনের আইনশৃঙ্খলা ও পৌরব্যবস্থা নিয়ে বাঙালি তথা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মুগ্ধতার কাল শেষ হয়েছে। কিন্তু ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শ যে ভারতবর্ষের পক্ষে নানা দিক থেহে চেতনাসঞ্চারকারী সে বিশ্বাস অনেকেই পোষণ করতেন। যেমন ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেও সেই বিশ্বাসের কথা লিখে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর'-এ।

'বর্তমান ভারত' খুঁটিয়ে পড়লে বোঝা যায় স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতিকে একটি শক্তি মনে করতেন। সেই শাসন শক্তি বা 'ক্ষত্র শক্তি' 'ভিন্নধর্মাবলম্বী রাজন্যবর্গের' দ্বারা ভারতবর্ষে বিপুল সময় ধরে চর্চিত হয়েছিল। কিন্তু স্বামীজীর বক্তব্য অনুসারে মনে হয়, নিছক ধর্মীয় পরিচিতির ভিন্নতা দিয়ে ইংরেজ শাসনের অভিনবত্ব ব্যাখ্যা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। তাঁর ভাষায়, "এ শক্তি এত নুতন, ইহার জন্ম-কর্ম ভারতবাসীর পক্ষে এমন অভাবনীয়, ইহার প্রভাব এমনই দুর্ধর্ষ যে, এখনো অপ্রতিহতদণ্ডধারী হইলেও মুষ্টিমেয় মাত্র। ভারতবাসী বুঝিতেছে, এ শক্তিটি কি—আমরা ইংলণ্ডের ভারতাধিকারের কথা বলিতেছি।"

বিশ্বব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিস্তার প্রকৃতপক্ষে এমন একটি ঘটনা যা পূর্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বৈশ্য সম্প্রদায় এই প্রথম বুদ্ধি ও অর্থবলে নিজেদের হাতে রাজশক্তির রাশ তুলে নিতে সমর্থ হল বিশ্বের ইতিহাসে। তাই ইংলণ্ডের ভারত-বিজয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি হিসেবেই অভিনব। স্বামীজী লিখছেন, "ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান মোগলাদি সম্রাটগণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিনীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তুরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর—এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিম্নি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী—স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।" ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী হিসেবে স্বামীজী ভিক্টোরিয়ার কথা উল্লেখ করলেন না এখানে। তিনি যথার্থই নির্দেশ করেছিলেন 'সুবর্ণাঙ্গী শ্রী' অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা বা টাকাই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীয় শক্তি। এই ধনতন্ত্রই বৈশ্য রাজত্বকে একটি অভূতপূর্ব গড়ন দিয়েছিল যা সভ্যতার ইতিহাসকে গভীর রূপান্তরের মুখে এনে হাজির করে।

> **কোম্পানির শাসন ও ব্রিটিশ শাসন :**
> ১৭৬৫ খিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের নির্বাচিত ভূখণ্ডে কর আদায় ও সীমিত রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক সংস্থা, মূল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সেটি অঙ্গ নয়। বরং অনেক সময় ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে এই সংস্থার বিরোধও লক্ষ করা গেছে। ভারতে সরাসরি ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত হয় ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১ নভেম্বর মহারানির সনদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এই সময় থেকেই ভারত রাজনৈতিক অর্থে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্র উভয় পর্বেই প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

বিজাতীয় বৈশ্য-বিজয় স্বামী বিবেকানন্দের কাছে একটি অসাধারণ যুগপরিবর্তনকারী ঘটনা। তিনি বলেন : "এ নুতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নুতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতে কি গুকীগ্ন পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।" সমস্ত 'বর্তমান ভারত' রচনার সিংহভাগ জুড়ে যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা কার্যত এই বিপুল ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ভারত চেতনায় যে-বিপ্লব অনিবার্য তাকে গভীরভাবে বুঝতে চাওয়ার জন্যই। বৈশ্য সম্প্রদায় নিজেরা বিদ্যাচর্চায় যুক্ত নয়, কিন্তু বাণিজ্যের কারণে তারা এক দেশের বিদ্যা-কলা-কৌশল-সংস্কৃতিকে অপর দেশে বহন করে নিয়ে যায়, ছড়িয়েও দেয়। ভারতের সর্বত্র এই বৈশ্য ইংরেজের প্রভাবেই ছড়িয়ে পড়েছে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিদ্যা-কলাকৌশল ও রীতিনীতির চর্চা।

ইংরেজ-অধিকারে বাহ্যিক নানা ব্যাপারে ভারতবর্ষের সমুন্নতি লক্ষ করা গেলেও প্রজার কল্যাণ সব দিক থেকে অর্জিত হতে পারেনি। স্বামীজী মূল ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে ভারতীয় প্রজার অধিকার ও মর্যাদাগত পার্থক্যের ব্যাপারটি গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন, প্রবল পরাক্রান্ত রাজার শাসনাধীন হলে প্রজাদের মধ্যে ব্যবধান বিশেষ কার্যকরি হয় না। কারণ প্রজা যে জাতিরই হোক রাষ্ট্রক্ষমতায় তাদের সামান্যতম অধিকার থাকে না। কিন্তু ব্রিটিশ মূল শাসন কাঠামোর প্রজাতান্ত্রিক গড়ন ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর মধ্যে ব্যবধান তৈরির রাষ্ট্রনৈতিক কারণ হিসেবে কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

কারণ, "যেখানে প্রজানিয়মিত রাজা বা প্রজাতন্ত্র বিজিত জাতির শাসন করে সে স্থানে বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ ব্যবধান নির্মিত হয় এবং যে শক্তি বিজিতদিগের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিযুক্ত হইলে অত্যল্পকালে বিজিতজাতির বহুকল্যাণসাধনে সমর্থ, সে শক্তির অধিকাংশভাগই বিজিত জাতিকে স্ববশে রাখিবার চেষ্টায় ও আয়োজনে প্রযুক্ত হইয়া বৃথা ব্যয়িত হয়।" ইংরেজদের এই ভারত তোষণের চেষ্টা কীভাবে ভারতবাসীর চেতনার বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কথাও সবিস্তার আলোচনা করেছেন বিবেকানন্দ।

ঘ. 'বর্তমান' ভারতবাসী ও পরানুকরণঃ ভাব-সংঘর্ষ ও সমাধান

বৈশ্য সভ্যতার স্বাভাবিক প্রচারধর্মিতায় উনিশ শতকে ভারত জুড়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে পাশ্চাত্যের ভাব—'বৈশ্যাধিকারের যে চেষ্টায় এক প্রান্তের পণ্য দ্রব্য অন্য প্রান্তে উপনীত হইতেছে, সেই চেষ্টারই ফলে, দেশদেশান্তরের ভাবরাশি বলপূর্বক ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে। এই সকল ভাবের মধ্যে কতকগুলি অতি কল্যাণকর, কতকগলি অমঙ্গলস্বরূপ, আর কতকগুলি পরদেশবাসীর এ দেশের যথার্থ কল্যাণ-নির্ধারণে অজ্ঞতার পরিচায়ক।" ইংরেজের পাঠশালায় শিক্ষিত সে সময়ের 'নব্যভারত'-বাসী পশ্চিমি সভ্যতার হঠাৎ আলোর ঝলসানিতে মুগ্ধ, বিভ্রান্ত। তাদের চেতনায় উভমুখী আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। একদিকে, যা-কিছু পাশ্চাত্যের তার প্রতি অন্ধ প্রণতি ও সমর্থন, আরেক দিকে, উনিশ শতকের শেষ পর্বে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণের দিনগুলিতে স্বামীজী দেখেছেন প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি আপামর ভারতবাসীর ভক্তি ও আকর্ষণ।

ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠার একেবারে আদিলগ্ন থেকেই শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে ভারতবাসীর মনে 'সভ্য' ইংরেজের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিষয়ে একরকমের দৃঢ় ধারণা কাজ করতে শুরু করে। তখন মধ্যযুগের মূলধারার সাহিত্য চর্চার অবসান হয়েছে, অথচ ইংরেজি সাহিত্য-প্রভাবিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়নি। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সেই সময় জুড়ে বাঙালির ছড়া-পাঁচালি-কবিগানেই উঠে এসেছিল ইংরেজের জগৎশাসন করার শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি সবিস্ময় মুগ্ধতা। ইংরেজি শিক্ষার সার্বিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নব্য-ইংরেজি শিক্ষিত ভারতবাসীর সংস্কারে ক্রমশ এক অপ্রতিরোধ্য বিশ্বাস তৈরি হয়ে যেতে থাকে যে—"পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য-সম্পন্ন হইব"। এই ধারণা যে কত বিভ্রান্তিকর, অগভীর এবং বৈনাশিক—তা উনিশ শতক জুড়ে তৎকালীন বাঙালি মনীষীরা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে দেখিয়েছেন। একসময় এই অনুকরণমুখী বাঙালির আচার-আচরণই সেকালের রঙ্গব্যঙ্গমূলক সাহিত্যধারার জন্ম দিয়েছিল। স্বামীজী যখন 'বর্তমান ভারত' প্রণয়ন করেন, তখন সেই রঙ্গব্যঙ্গের ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। সেই জায়গায় এসেছে সিরিয়াস বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা। 'বর্তমান ভারত'-এ সংক্ষেপে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, সেকালীন শিক্ষিত বাঙালির 'পরানুকরণ' ব্যাধির প্রতিষেধক রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় জীবনদৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যে।

পাশ্চাত্যের অনুকরণের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের সমান উন্নত হওয়ার তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করে, স্বামীজী দেখিয়েছেন, তাদের বিবেচনা-বুদ্ধি মোহগ্রস্ত। তাদের কোনো সিদ্ধান্তই 'ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না'। এই বিভ্রান্তি কীভাবে ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত করে, দু'টি দৃষ্টান্ত দিয়ে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন স্বামীজী—১. নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কিত সমকালের ভারতীয় নব্যপ্রজন্মের ধারণা, ও ২. ধর্মাচরণ সম্পর্কে সমকালীন মূল্যায়ন। বিবেকানন্দ মনে করেন, উল্লিখিত উভয়ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্বদেশীয় অতীত ও স্বদেশীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট ভুলে গেলে চলবে না। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওপর ওপর দেখে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করলে আমাদের দেশীয় সমাজে নিষ্ফল হতে বাধ্য।

'পরানুকরণ স্পৃহা'র সমাধানে স্বামী বিবেকানন্দ সদ্যজাত ভারতীয় জাতীয়তাকে প্রয়োগ করতে চান। তিনি যখন লেখেন, "বলবানের দিকে সকলে যায়; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজেদের গাত্রে কোন প্রকারে একটু লাগে—দুর্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইওরোপী-বেশভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দশশত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্সী এক্ষণে আর 'নেটিভ' নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন ব্রাহ্মণেরও বংশমর্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্য জাতি!! উহারা আর আমাদের নহে!!!"—তখন বোঝা যায়, দেশপ্রেম ও জাতিগত সৌভ্রাতৃত্বের আবেগের চর্চায় পরানুকরণমুখী বিদ্বান ভারতীয়ের স্বসমাজত্যাগের নেশাকে দূর করা সম্ভব বলেই স্বামীজী মনে করতেন। 'স্বদেশ মন্ত্র'-এর বার্তাও তা-ই, এর বীজবাক্যই হল—হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, "যে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"—কর্তব্যকর্মের এই স্পষ্ট নির্দেশিকাই পরানুকরণ দূরীকরণে বিবেকানন্দ-প্রস্তাবিত সমাধান সূত্রের কাছে পৌঁছনোর চাবিকাঠি।

---

১ সোমলতা—বেদে উহা 'রাজা সোম' নামে উক্ত।

২ অগ্নিবর্ণ—সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ। ইনি প্রজাগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া দিবারাত্র অন্তঃপুরে কাটাইতেন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরতাদোষে যক্ষ্মারোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৩ ধর্মাশোক—ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট অশোক। ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্যের দ্বারা সিংহাসন লাভ করাতে ইনি পূর্বে চণ্ডাশোক নামে খ্যাত ছিলেন। কথিত আছে, সিংহাসনলাভের প্রায় নয় বৎসর পরে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়—ভারত ও ভারতেতর দেশে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচার তাঁহার দ্বারাই সাধিত হয়। ভারত, কাবুল, পারস্য ও পালেস্তাইন প্রভৃতি দেশে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত স্তূপ, স্তম্ভ এবং পর্বতগাত্রে খোদিত শাসনাদি ঐ বিষয়ে ভূরি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই প্রকার ধর্মানুরাগ এবং প্রজারঞ্জনের জন্যই ইনি পরে 'দেবানাং পিয়ো পিয়দশি' (দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শন) ধর্মাশোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

১ গ্রীক
২ প্রজা
৩ মন্ত্র বা অস্ত্র দ্বারা
৪ উৎসাদন
১ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য
২ খল্‌দিয়ার আদিম নিবাসী, Sumerians
৩ প্রাচীন বাবিলন-নিবাসী, Babylonians
৪ খল্‌দিয়া-নিবাসী, Chaldeans
৫ প্রাচীন পারস্য-নিবাসী, Iranians
১ পুনরায় স্থাপন
১ অভিপ্রায়
১ ক্ষাত্র ও মন্ত্রশক্তি সহায় যাহার
২ প্রযোজ্য
৩ চিহ্ন
৪ বিশেষ অধিকারভোগী

* বেণ—ভাগবতোক্ত রাজা-বিশেষ। কথিত আছে, ইনি আপনাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আদি দেবগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলিয়া প্রচার করিতেন। ঋষিগণ তাঁহার এ অহঙ্কার দূর করিবার জন্য কোন সময়ে সদুপদেশ দিতে আসিলে তিনি তাঁহাদের তিরস্কার করেন এবং আপনাকেই পূজা করিতে বলায় তাঁহাদের কোপানলে নিহত হন। ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য মহারাজ পৃথু এই বেণ রাজার বাহুমন্থনে উৎপন্ন।

১ সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাজ্যবাদ, নাস্তিবাদ
১ পশু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে যে।
২ চিহ্ন
১ রোমক সম্রাট সীজার
২ প্রাচীন দেবগণের
৩ 'মোহমুদ্গার', শঙ্করাচার্য

১৭.৫ সংক্ষিপ্তসার

এই এককে এসে 'বর্তমান ভারত'—এর মূল পাঠ্যাংশ সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছতা পেয়েছে। শব্দ ও ধারণাগত জটিলতাগুলিও যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্যের বিষয়বস্তু কীভাবে মূল রচনায় পরিবেশিত হয়েছে তা সংক্ষেপে বিবৃত করে দেখানো হয়েছে এই রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমান বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন ভারতীয়দের আশুকর্তব্য দেশকে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও ব্যষ্টিস্বার্থের ওপর স্থান দেওয়া। ভারতবাসীকে পাশ্চাত্যের শিক্ষণীয় বাণী অনুধাবন করতে হবে, কিন্তু নিছক হীনম্মন্যতা থেকে ইংরেজকে অনুসরণ করলে তার মুক্তি নেই। এই সিদ্ধান্ত নিছক আবেগকে আশ্রয় করেই গ্রহণ করেননি বিবেকানন্দ। এই পর্বে পাঠ্যের সংক্ষিপ্তসার অংশে যে-যুক্তির পরম্পরা মেনে স্বামীজী তাঁর সমকালীন 'বর্তমান' ভারতবাসীকে জেগে উঠবার আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই যুক্তিগুলিকে ধাপে ধাপে সংক্ষেপে পরিবেশন করা হয়েছে।

১৭.৬ অনুশীলনী

ক. বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে। প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।"—এই বক্তব্য অনুসরণ করে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটিতে স্বামী বিবেকানন্দের মূলভাবনা নিজের ভাষায় উপস্থাপিত করুন।

২. 'বর্তমান ভারত' রচনা অবলম্বনে স্বামী বিবেকানন্দের ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিন।

৩. প্রাচীন ভারতবর্ষের বর্ণব্যবস্থা ও বর্ণগত ক্ষমতা অর্জন বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতামত 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৪. ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ও তার তাৎপর্য বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লিখুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. বৌদ্ধ ও মুসলিম ভারতে রাজনৈতিক শক্তির নতুনত্ব বিষয়ে 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে আলোচনা করুন।

২. পৌরোহিত্য শক্তির শাসন ও ক্ষত্রিয় শক্তির শাসনের গুণ ও দোষগুলি কী কী?

৩. ইংরেজের বৈশ্য শাসনের বিশেষত্বগুলি স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে সংক্ষপে আলোচনা করুন।

৪. ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসীর সমস্যাসমূহ স্বামী বিবেকানন্দের অনুসরণে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৫. 'পরানুরকণ' বলতে স্বামীজী কী বুঝিয়েছেন? ভারতীয়দের পরানুকরণের কারণ কী?

৬. নারী স্বাধীনতা বিষয়ে সমকালীন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির মত বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৬. 'স্বদেশ মন্ত্র'-এর মূল বার্তা সংক্ষেপে লিখুন।

৭. "বৈশ্যত্বও ইংরেজের অস্থিমজ্জায়"—স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি নিজের ভাষায় লিখুন।

গ. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. স্বামী বিবেকানন্দের মতানুসারে শূদ্র সমাজের অভ্যন্তরে অনৈক্যের কারণ কী?

২. কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিজাতীয় প্রজাদের অপেক্ষাকৃত কম ঘৃণার পাত্র হতে হয়?

৩. "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি"—কার উক্তি?

৪. পরীক্ষিত ও জনমেজয় ধর্মাশোকের চেয়ে বিখ্যাত কেন?

৫. মুসলমান শাসন পর্বে ধর্মশাস্ত্রের স্থান দখল করেছিল কোনশাস্ত্র?

একক-১৮ ❑ গঠনশৈলী ও ভাষারীতি

গঠন

১৮.১ উদ্দেশ্য

১৮.২ গঠনশৈলী ও ভাষারীতি

১৮.৩ নামকরণ

১৮.৪ সংক্ষিপ্তসার

১৮.৫ অনুশীলনী

১৮.৬ সহায়ক গ্রন্থসূচী

১৮.৭ অতিরিক্ত পাঠনির্দেশ

১৮.১ উদ্দেশ্য

আগের দু'টি এককে, 'বর্তমান ভারত' রচনাটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য ও এই রচনার অন্তর্বস্তু বিশ্লেষণের পর, এই এককের আলোচনায় স্পষ্ট হবে এই রচনা কী কৌশলে ও কোন ভাষারীতি অবলম্বনে লেখা হয়েছে। রচনাটির বিশাল আলোচনার পরিসর থাকা সত্ত্বেও কেন এর নামকরণ 'বর্তমান ভারত' রাখা হল, তার সম্ভাব্য কারণগুলিও অনুসন্ধান করা হবে এখানে। 'বর্তমান ভারত' সম্পর্কে অনুসন্ধান একরকম সম্পূর্ণতা পাবে এই এককে।

১৮.২ গঠনশৈলী ও ভাষারীতি

গঠনশৈলী-স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যগ্রন্থের প্রতিটিতে মিশে আছে তাঁর প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব ও সজাগ কণ্ঠস্বর। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-ই হোক, কিংবা 'ভাববার কথা' সর্বত্রই নির্দ্বিধায় বিবেকানন্দ বলে চলেন তাঁর পর্যবেক্ষণের কথা, তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্বকে আড়াল করেন না কোথাও। 'বর্তমান ভারত'—এর বিষয় ও বক্তব্য বিন্যাস এই দিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী। রচয়িতা বিবেকানন্দের ভঙ্গি এখানে অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক গবেষকের মতো। মূলত তিনটি স্তরে তিনটি পৃথক স্বরে 'বর্তমান ভারত' উপস্থাপিত হয়েছে—ক. নৈর্ব্যক্তিক রচয়িতার স্বর, খ. ব্যক্তি বিবেকানন্দের স্বর, ও গ. উপদেশক ও প্রবক্তা বিবেকানন্দের স্বর।

'বর্তমান ভারত' শুরু হচ্ছে রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিক তথ্য-উপস্থাপন ও তথ্য-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের মধ্য দিয়ে। খুব সামান্য একটি বাক্যাংশে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতার কথা

"বর্তমান লেখকের পাশ্চাত্য সমাজের কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে"। 'বর্তমান ভারত' শেষ হচ্ছে উপদেশক প্রবক্তা বাগ্মী বিবেকানন্দের 'স্বদেশ মন্ত্র' উচ্চারণে। সমস্ত রচনাটিই ব্যক্তিনিরপেক্ষ তথ্য উপস্থাপন, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তের বিন্যাসে আঁটোসাটো। রচনাটির প্রায় সমস্তটাই বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বা Objective Essay-এর ধাঁচে লেখা। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের গদ্য বিষয়ক তাঁর একটি লেখায় অল্প কথার আঁচড়ে প্রবন্ধের সংজ্ঞা দিয়ে লেখেন, "প্রবন্ধ : যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়—অন্তত সেই রকমই ধারণা করি আমরা"। প্রাথমিকভাবে, 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের আদর্শ উদাহরণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রাণিত কলমের স্পর্শ প্রবন্ধের বিধিবদ্ধ ব্যাকরণের মধ্যে এই রচনাকে বেঁধে রাখতে পারেনি।

'বর্তমান ভারত'-এর সূচনায় কোনো ভূমিকা না করেই লেখক সরাসরি তথ্য ও বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেছেন। তথ্যগুলি এমন সংক্ষেপে পরিপাটি করে পরিবেশিত যাতে বক্তব্যের পরের স্তরে উপনীত হওয়ার অনুকূল সিদ্ধান্ত বা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। রচনা শুরু হয়েছে বৈদিক সমাজে পুরোহিতের প্রতিপত্তি থেকে। এই অনুচ্ছেদের শেষে পুরোহিততন্ত্র অনুমোদিত রাজন্য সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে বলেই অনায়াসে বর্ণকাঠামোর ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ-শক্তির বিন্যাস নিয়ে বক্তব্য সাজানো রচয়িতার পক্ষে সঙ্গত ও সহজ হয়েছে। পাঠকের পক্ষেও আলোচনার অভিমুখ অনুসরণ করার কোনো অসুবিধা থাকেনি। 'বর্তমান ভারত' আগাগোড়া এভাবেই তথ্য, তার বিশ্লেষণ ও পরবর্তী বক্তব্য যাওয়ার উপযোগী সিদ্ধান্তে একটু একটু করে গেঁথে তোলা। বিবেকানন্দের মূলত আবেগধর্মী তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ-প্রধান রচনার সম্ভারে একারণেই শৈলীগত দিক থেকে এই রচনাটি অভিনব।

'বর্তমান ভারত'-এর বক্তব্যের বিন্যাসে কোনো প্রসঙ্গই দীর্ঘ নয়। সে জন্যই এই রচনাটি অনুচ্ছেদ-বহুল। কখনো কখনো একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পরিবেশনের জন্য একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ "শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকিরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষে বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককেয়ালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পায়, সে-সমাজ শরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।"এই প্রতিপাদ্যটি এই রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যার ওপর রচনাটির মূল যুক্তির কাঠামো গভীরভাবে নির্ভরশীল। একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে এই বক্তব্যটি উপস্থিত করে বিবেকানন্দ এগিয়ে গেছেন তাঁর পরবর্তী প্রতিপাদ্যে। 'বর্তমান ভারত' সেকালের বাংলা প্রবন্ধ-গদ্যের মতো উপমাবহুল। কিন্তু রচয়িতার উত্তাল ক্ষিপ্র কর্মজীবনের স্পর্শই যেন লেগেছে এই রচনার শরীরে। নতুন ভারত গড়ার মহৌষধি সন্ধানের তীব্র এষণাই যেন তাঁকে যুক্তি ও তথ্যের বিপুল সম্ভারের মধ্য দিয়ে বেগে উপসংহারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী আলোচনার পর যেখানে স্বামীজী সমকালীন ভারতবর্ষের স্খলন ও বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন সেখান থেকে 'বর্তমান ভারত' এর গঠনরীতিতে এক মৌলিক

পরিবর্তন দেখা যায়। গদ্য-প্রবন্ধের সাধারণ রূপরীতির পরিবর্তে সেখানে এসে যুক্ত হয় বক্তৃতার সেকালীন ভঙ্গি। অন্তত দু'ক্ষেত্রে "হে ভারত" সম্বোধন পাঠককে বিবেকানন্দের পরিচিত দৃপ্ত শৌর্যমণ্ডিত আলেখ্যের কথা মনে করায়। স্বদেশ মন্ত্রের আগের পাঁচটি ছোট অনুচ্ছেদ আগে থেকেই এই ওজস্বিতা ক্রমশ ঘনীভূত হতে শুরু করে। স্বদেশ মন্ত্রে আবেগ ও তার প্রকাশ এক মন্ত্রাবিষ্ট উত্তুঙ্গতা লাভ করেছে। ফলে 'বর্তমান ভারত' শেষ পর্যন্ত নিছক বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ মাত্র নয়, এর সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে এর বিষয়গত নির্দিষ্টতা ভেদ করে এসে মিশেছে ঋষিকণ্ঠের মন্ত্রধ্বনি।

ভাষারীতি : বাংলা গদ্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক কৃতিত্ব বাংলা চলিত গদ্যের শক্তির ওপর আস্থা স্থাপনে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' ও চলিত গদ্য আন্দোলনের পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চলিত ভাষাকে সাহিত্যে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতো চলিত গদ্যের সাহিত্যিক সম্ভাবনার কথা সম্ভবত তাঁরা ভাবেননি। তাঁদের লেখায় চলিত গদ্য কিছুটা বিষয়ের প্রয়োজনেই এসেছিল। কিন্তু স্বামীজী প্রবন্ধের মতো ভাব ও তত্ত্বপূর্ণ সাহিত্যরূপের ক্ষেত্রেও চলিত গদ্যের প্রকাশ ক্ষমতার ব্যাপারে নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' শুধু সাধু গদ্যেই লেখা তা নয়, এর বাক্যনির্মিতি ও বাচনরীতিও চলিত গদ্যের শৈলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কাজেই বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে বিবেকানন্দের মূল্যায়নের প্রচলিত ধারা মেনে 'বর্তমান ভারত' এর রচয়িতা বিবেকানন্দের ভাষাশৈলীকে অনুধাবন করা যাবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভাষায় লেখায় ও কথোপকথনে দক্ষ ছিলেন। তাঁর সেই ভাষা দক্ষতার ছাপ 'বর্তমান ভারত'—এর প্রবন্ধের ওপর পড়েছে। এই রচনাটি উনিশ শতকের ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ গদ্যের মতোই সংস্কৃত শব্দে—সন্ধি ও সমাসবহুল পদে পরিপূর্ণ। শব্দ ও সমাস নির্মাণে কখনো কখনো এতই মৌলিক যে-আপাত সরল ছোটো বাক্যের অর্থ বুঝতে সাধারণ পাঠকের একটু আলাদা প্রযত্নের দরকার হয়, যেমন—"কখনো বিভীষিকাসঙ্কুল আদেশ, কখনো সহৃদয় মন্ত্রণা, কখনো কৌশলময় নীতিজাল-বিস্তার রাজশক্তিকে অনেক সময়েই পুরোহিতকুলের নির্দেশবর্তী করিয়াছে"—এই বাক্যে 'নির্দেশবর্তী' শব্দটির অর্থটিই পাঠকের পক্ষে সব চাইতে প্রয়োজনীয়, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে শব্দটি পরিচিতও নয়, বাংলা গদ্যে বিশেষ ব্যবহৃতও নয়। সংস্কৃত শব্দের ওই বাধাটুকুর কথা একারণেই উল্লেখ্য যে, স্বামীজী এই লেখায় শেষ পর্যন্ত যে বিপুল 'শূদ্র' সাধারণের জাগরণের আশা করেছেন, যে ভারতকে আত্মোদ্বোধনে উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন—এই ভাষা সেই স্তরের মানুষের বোঝার পথে বাধা তৈরি করেছে। এছাড়া 'বর্তমান ভারত' এর সংস্কৃতানুসারী শব্দচয়ন ও অন্বয় বা বাক্যমধ্যস্থ পদবিন্যাস এই রচনার চারপাশে তৈরি করেছে অনুপ্রেরণার এক অতুলনীয় আবহ, সাধারণ চলিত শব্দের প্রয়োগে হয়তো সেই বৈভব, সেই উদ্দীপনাময় সমারোহ সৃষ্টি হতে পারত না।

১৮.৩ নামকরণ

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা রচনাগুলি মূলত রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরে এগুলিই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত রূপ পায়। আলোচ্য রচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে

ও গ্রন্থরূপ পাবার সময়, দু'ক্ষেত্রেই 'বর্তমান ভারত' শিরোনামেই চিহ্নিত হয়েছিল।

যে-কোনো ধরনের রচনার ক্ষেত্রেই রচনার শিরোনাম রচনাটির উদ্দেশ্যের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা। রচনাটির লক্ষ্য সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে দিতে সক্ষম বলেই যে-কোনো রচনার ক্ষেত্রেই যথাযথ নামকরণ-রচয়িতার বা সম্পাদকের একটা সুচিন্তিত কর্তব্যের অংশ। সে কারণেই পাঠক যে-দৃষ্টিভঙ্গিতেই পড়ুন না কেন, রচয়িতার রচনার উদ্দেশ্য বুঝতে গেলে নামকরণের তাৎপর্যের দিকে নজর দিতেই হবে। সে দিক দিয়ে দেখলে 'বর্তমান ভারত' নামকরণটি পাঠকের বিশেষ আগ্রহ জাগাতে সক্ষম। এই রচনার শেষ প্রান্তের সামান্য অংশ বাদ দিলে সমস্ত লেখাটিই প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতি ও প্রাচীন থেকে মধ্যযুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিবর্তনের ব্যাখ্যা হাজির করেছে। যে সময়ে বসে বিবেকানন্দ এই রচনাটি প্রস্তুত করছেন, সে সময়ের কথা ও তথ্য এই রচনায় নিতান্তই সামান্য। কাজেই এহেন পুরোনো কালের ভারতবর্ষকে নিয়ে যে গদ্যরচনা সবিস্তার আলোচনা করে তার শিরোনাম 'বর্তমান ভারত' হলে পাঠকের এই ব্যাপারে চিন্তা উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক।

'বর্তমান ভারত'-এর আলোচনার গতিপথ লক্ষ করে দেখলে বোঝা যাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আলোচনা করা এখানে বিবেকানন্দর লক্ষ্য নয়। বর্ণ-বিভাজিত সমাজে রাষ্ট্রশক্তি বা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কীভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্য বিন্যস্ত হয়েছে বা হয়নি এবং এই বিন্যাসের প্রভাবকে স্বামীজী অনুধাবন করেছেন। এই অন্বেষণের লক্ষ্য হল ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের রহস্যকে বোঝা। কারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন, "পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে।" এমনকি পাশ্চাত্যের সমাজ অগ্রগতির ধারণার সূত্র মিলিয়ে ভারতীয় সমাজকে নির্মাণও করা যাবে না, এর ভবিষ্যৎ গতিপথও বোঝা যাবে না। স্বামীজী সমকালের ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে ভাবিকালের ভারতবর্ষের মুক্তির মন্ত্র আবিষ্কার করার জন্য ফিরে তাকিয়ে ছিলেন অতীত ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-সামাজিক বিবর্তনের ধারার দিকে। এই চর্চার ভিত্তিতে ছিল এক উদার প্রত্যয়ঃ "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।" এই বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে ও সামাজিক স্তরে বর্ণব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকার দিকে তাকিয়ে বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজবিবর্তনের একটি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবীভোগ করে।"

এই সূত্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি দেখিয়েছেন, 'বর্তমান' (অর্থাৎ তাঁর সমকালীন) ভারতবর্ষে চলেছে বৈশ্য প্রাধান্যের পর্ব। এই ভারতবর্ষ শূদ্রপূর্ণও বটে। 'শক্ত্যাধার' শূদ্র শ্রমজীবী মানুষের সম্ভাবনাময় সমুত্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন বিবেকানন্দ। গঠন করতে চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য নামক অন্ধতা থেকে মুক্ত স্বতন্ত্র এক

ভারতবর্ষ। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন, কোনো বর্ণের বিশ্ব-শাসনই ত্রুটিহীন নয়। তাই এক ত্রুটিমুক্তির সাধনপথ তিনি দেখিয়ে যেতে চেয়েছেন এবং তা শেখাতে চেয়েছেন অবশ্যই 'বর্তমান' ভারতকেই।

'বর্তমান ভারত' রচনাটি প্রথম থেকেই লক্ষ্যমুখী। ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি বিশ্লেষণ করে রচয়িতা পূর্বোক্ত যে সমাজ-বিবর্তন সূত্র আবিষ্কার করেছেন তার আলোয় তিনি তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের দোষত্রুটিকে বুঝে নিতে চান। যুক্তিপূর্ণভাবে এই বিশ্লেষণের পথে তিনি ভারতবাসীকে অগ্রগতির পথ দেখান, যা পরাধীন জাতির চিত্তগ্লানি থেকে ভারতবাসীকে মুক্তি দিতে সক্ষম। এই রচনাটি শুধু বুদ্ধিবৃত্তির বিলাস মাত্র নয়। এই রচনার সমস্ত ইতিহাসচর্চার লক্ষ্য একটিই, বর্তমান ভারতকে উৎকর্ষের পথে, অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে দেওয়া। সে দিক থেকে দেখতে গেলে, এই রচনার শিরোনামটি পাঠকমনে রচনাটির উদ্দেশ্যকে সার্থকভাবে সবসময় উজ্জ্বল করে রাখে।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকের পর থেকে বাংলা লেখালেখির শিরোনামে 'ভারত' শব্দের ব্যবহারের আতিশয্য চোখে পড়ার মতো। এই আতিশয্যের কারণ, পাঠকের তাৎক্ষণিক আবেগ জাগাতে এই শব্দের জুড়ি মেলা ভার। কাজেই 'ভারত' শব্দের প্রয়োগ এই সময়ে অনেকটা ফ্যাশনেও পরিণত হয়। তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ ভাষায় এই অর্থহীন লঘু ফ্যাশনকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন : "সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগো, ভীষ্ম, দ্রোণ, প্রভৃতি শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ও-সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চিৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে!" এই রচনা প্রকাশিত হয় ১২৮৩ বঙ্গাব্দে, 'বর্তমান ভারত' ধারাবাহিক প্রকাশের প্রায় দু'দশক আগে। এই উচ্ছ্বাস কোলাহলের মাঝে স্বামীজীর রচনার স্বর ও সত্য খুব সহজেই পৃথক হয়ে যায়। সমস্ত রচনাটির পেছনে আবেগসিক্ত এক দেশভাবুকের উপস্থিতি বোঝা যায় কিন্তু নিছক আবেগ জাগিয়ে আসর মাত করা যে এই রচনার উদ্দেশ্য নয় তা এর পাঠকমাত্রই অনুধাবন করতে পারেন। যে মন্ত্রতুল্য 'স্বদেশমন্ত্র' দিয়ে 'বর্তমান ভারত' শেষ হয়, আবেগপূর্ণ সেই অনুচ্ছেদটিও নিছক আস্ফালনেই শেষ হয় না। এর মধ্যে মিশে থাকে বিপথগামী দেশবাসীর প্রতি ভর্ৎসনা এবং তাদের সুপথে আনবার তীব্র আর্তি। 'বর্তমান ভারত' এর ভারত শব্দটি তাই নিছক একটি মানচিত্র হয়েই থাকে না, ভারত হয়ে ওঠে জীবন্ত মানুষের আবহমান প্রবাহ, যাকে তার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বোঝা যায় না। অতীত ভারত নানাভাবেই মিশে থাকে বর্তমান ভারতে। তাই অনেক নামের ভিড়ে হারিয়ে যায় না 'বর্তমান ভারত'-এর নাম।

১৮.৪ সংক্ষিপ্তসার

স্বামী বিবেকানন্দ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ও পরে গ্রন্থাকারে পরিবেশিত 'বর্তমান ভারত' রচনাটির ক্ষেত্রে সেকালের গবেষণাধর্মী 'বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ'-এর ধারা অনুসরণ করলেও এই রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও

বাগ্মীতার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই রচনার ভাষা খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাধু বাংলা গদ্যের ভাষা কিন্তু কোথাও অযথা গতিহীন বা জড়তাপ্রাপ্ত নয়। এই রচনার 'বর্তমান ভারত' নামটি এর ইতিহাসগত বিষয় নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, রচনাটি কার্যত সমকালীন তথা 'বর্তমান' ভারতকেই বুঝতে চেয়েছে ইতিহাসের বিরাট প্রেক্ষাপটে রেখে।

১৮.৫ অনুশীলনী

ক. বিস্তৃত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. 'বর্তমান ভারত' রচনাটির বক্তব্য বিন্যাসরীতির ওপর আলোকপাত করে রচনাটির ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২. স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' রচনাটির নামকরণের সার্থকতা বিশ্লেষণ করুন।

৩. শূদ্রের সামগ্রিক উত্থান ও তার প্রেক্ষাপট বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী 'বর্তমান ভারত' রচনা অবলম্বনে বিশদে বুঝিয়ে বলুন।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১. প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা ও প্রজার সম্পর্ক 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে সূত্রাকারে আলোচনা করুন।

২. 'বর্তমান ভারত' রচনাটির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখকরুন।

৩. সমাজে পুরোহিত-প্রাধান্যের দোষগুলি নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৪. ইংলণ্ডের বৈশ্যপ্রধান সমাজ বিষয়ে স্বামীজীর মতামত আলোচনা করুন।

৫. "ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনপ্রণালীতে কতকগুলি দোষ বিদ্যমান, কতকগুলি প্রবল গুণও আছে"— এই দোষ ও গুণগুলি নিজের ভাষায় পর্যালোচনা করুন।

৬. "পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের এতই পার্থক্য যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায়মাত্রই এদেশে নিষ্ফল হইবে"—'নব্যভারত'-এর পাশ্চাত্য অনুকরণ ও তার ব্যর্থতা বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মত বিশ্লেষণ করুন।

৭. 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে সমাজে 'শক্তির বিকিরণ' বিষয়ে স্বামীজীর মতামত আলোচনা করুন।

৮. পৌরোহিত্য শক্তির সঙ্গে যথাক্রমে বৌদ্ধ ও মুসলমান শাসনের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৯. প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজার আদর্শ ও ভাবমূর্তি বিষয়ে 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১০. "পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষাবিস্তার সত্ত্বেও শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের একটি বিষম প্রত্যবায় আছে, সেটি গুণগত জাতি"—'গুণগত জাতি' বলতে কী বোঝায়? উন্নতির পথে এটি বিঘ্ন কেন, আলোচনা করুন।

গ. অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১. পুরোহিতের উপাস্য কে?

২. বিবেকানন্দের মতানুসারে প্রাচীন রাজারা প্রজাবর্গকে শোষণ করতেন কেন?

৩. অগ্নিবর্ণ কে ছিলেন?

৪. "প্রকৃতির দ্বারা অনুমোদিত শাসন পদ্ধতির বীজ"—এই বাক্যাংশে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ কী?

৫. স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্মাশোকের চেয়ে পরীক্ষিত ও জন্মেজয়ের অধিক জনপ্রিয়তার কারণ কী?

৬. "পুরোহিতের শক্তিক্ষয় ও রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ" কবে থেকে সূচিত হয়েছিল?

৭. "ভারতবাসী বুঝিতেছে,-এ শক্তিটি কি"—এখানে কোনশক্তির কথা বলা হয়েছে?

৮. ইংলণ্ডের সিংহাসন কোনশক্তির অভ্যুত্থানের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

৯. "এই জাল ছিঁড়িলে আর পুরোহিতের পৌরোহিত্য থাকে না"—এখানে কোন জালের কথা বলা হয়েছে?

১০. স্বামী বিবেকানন্দ 'শূদ্র' বলতে কাদের বুঝিয়েছেন?

১১. "এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি"—এখানে কোন সত্যের কথা বলা হয়েছে?

১২. "আমি সেই বিদ্যা-উপজীবী, সমাজ আমার শাসনে চলিবে"—এখানে 'আমি' কে?

১৩. সমাজে বৈশ্য শাসনে কিসের বৃদ্ধি?

১৪. "সোস্যালিজম এনার্কিজম নিহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা"—এখানে কোন বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে?

১৫. স্বামী বিবেকানন্দের মতে সমাজে সমস্ত শক্তির আধার কারা?

১৮.৬ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, শংকর (সম্পাদিত), *বিশ্ববিবেক*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বাক সাহিত্য, ১৯৬৬

প্রণবরঞ্জন ঘোষ, *বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ সন

বিশ্বনাথ কাজী (সম্পাদিত), *সত্যপ্রজ্ঞার ধ্রুবতারাঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ স্মারক সংকলন*, রেডিয়্যান্স, কলকাতা, ২০১২

ড. পূর্বা সেনগুপ্ত, *স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, কলকাতা, ২০১১

১৮.৭ অতিরিক্ত পাঠনির্দেশ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৭১ সন

শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড)*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা